ইরাবতী

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

—সাড়ে চার টাকা—

দ্বিতীয় সংস্করণ—মাঘ, ১৩৬১

মিত্র ও ঘোষ ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কালকাতা-১২ হইতে শ্রীভানু রায় কর্তৃক
প্রকাশিত ও কালিকা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস ২৮, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
হইতে শ্রীবিজয়কুমার মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত।

সহপাঠী শহীদ
আউঙ্ শানের পবিত্র
স্মৃতির উদ্দেশে

এই লেখকের ঃ

উপকূল

আরাকান

সুরবাহার

নারী ও নগরী

সপ্তকন্যার কাহিনী

হন্ হন্ করে জেটি পার হয়ে আসে সীমাচলম। ঠিক গেটের মুখে টিকেটটা দিয়ে সদর রাস্তার ওপরে এসে দাঁড়ায়। এতটা পর্যন্ত সমস্ত যেন মুখস্থ ছিলো। ঝোলানো সিঁড়ি বেয়ে ভিড়ের পিছন পিছন জাহাজে এসে ওঠা, তারপর চারদিন অকূল সমুদ্রের ওপর ভেসে যাওয়া জীবন, কোন তটরেখা নেই কোনদিকে, চারদিক ঘিরে শুধু অথৈ জল—কখনো সবুজ, কখনো কালো, কখনো গাঢ় নীল। খুব ভালো লেগেছিলো সীমাচলমের। পৃথিবীর সামান্যতম স্পর্শটুকুও নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলেছিলো এই নীল জলের রাশি। তার নিজের ফেলে আসা জীবনও সমস্ত তিক্ততা নিয়ে মুছে গিয়েছিলো। শুধু মাঝে মাঝে ওপরের ডেকে পায়চারী করতে করতে মনে পড়েছিলো শুভলক্ষ্মীর কথা, সঙ্গে সঙ্গে তীব্র একটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠেছিলো তার বুক। চক্রবালের দিকে চেয়ে ভেবেছিলো—কতোদূরে সরে যাচ্ছে শুভলক্ষ্মী! মাদ্রাজের তাল-নারিকেল ছাওয়া ছোট এক গ্রাম সমস্ত স্মৃতি নিয়ে ক্রমেই সরে যাচ্ছে। পুঞ্জীভূত ফেনা আর সমুদ্রের প্রচণ্ড গর্জন—তার মধ্যে ওর সমস্ত অতীত ভেঙে যেন চুরমার হয়ে যাচ্ছে। রেলিংয়ের ধার থেকে সে আস্তে আস্তে সরে গিয়েছিল।

রেলিংয়ের পাশে জাহাজ বাঁধবার যে উঁচু লোহার ঢিপিগুলো থাকে, তারই একটার ওপরে চুপচাপ বসেছিলো সীমাচলম। সকাল থেকে জাহাজটা একটু একটু দুলছিলো। পেটের মধ্যেটা মোচড দিয়ে উঠছিলো। চোখ দুটো কুঁচকে একটু কুঁজো হয়ে মাঝে মাচে বমির বেগটা সামলে নিয়েছিলো সীমাচলম। মাথাটা ঘুরে উঠেছিলো—অসহ্য উত্তাপ দু'টি কানের পাশে।

ঠিক এমনি অবস্থা হয়েছিলো আর একদিন। সেদিনের কথাটা জীবনেও ভুলবে না সীমাচলম।

মিস্টার আয়েঙ্গার যে এত তাড়াতাড়ি কোর্ট থেকে ফিরে আসবেন তা সে ভাবতেই পারেনি, এমন কি শুভলক্ষ্মীও পারেনি ভাবতে। রোজকার মতই তারা হাত ধরাধরি করে বেড়াতে বেরিয়েছিল কাছের পাহাড়তলীতে। বসন্তের ছোঁয়ায় অপূর্ব হয়ে উঠেছিল প্রত্যেকটি গাছ আর লতা। দু'হাতে প্রচুর ফুল কুড়িয়েছিল সীমাচলম। শুভলক্ষ্মীর কালো চুলের রাশ আর সারা দেহ ফুলের স্তবকে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। তারপর তাল আর শিরীষ ঢাকা নির্জন পথ ধরে ফিরে এসেছিল তারা। শুভলক্ষ্মী অনেকদিন আগে ইস্কুলে শেখা আধুনিক ঢংয়ের একটা গান গাইছিলো আর সুর মিলিয়ে অক্লান্তভাবে শিস দিয়ে চলেছিল সীমাচলম। প্রায় বাড়ির ফটকের কাছে এসে জ্ঞান হলো তাদের,—কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে। ঠিক ফটকের সামনে উত্তেজিতভাবে পায়চারী করছিলেন মিঃ আয়েঙ্গার। ওদের দেখে জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে এলেন একেবারে সামনে—তারপর ফেটে পড়লেন সগর্জনে।

'সীমাচলম, তোমার স্পর্ধা ক্রমেই বেড়ে উঠেছে। কুকুরকে কোলে ওঠালেই সে মাথায় উঠতে চায়। তোমাকে না আমি বারবার বারণ করেছি লক্ষ্মীর সঙ্গে মেলামেশা করতে। কি সাহসে তুমি মেলামেশা করো তার সঙ্গে! তুমি কি আশা করো তোমার হাতে আমার মেয়েকে কোনদিন আমি সঁপে দেবো। তোমার মত ভ্যাগাবণ্ডের হাতে মেয়ে দেওয়ার চেয়ে ওকে নটরাজনের মন্দিরে সারাজীবন দেবদাসী করে রাখবো আমি। কেউটের বাচ্ছা কেউটে তো হবেই।'

আরও অনেক কথা বলেছিলেন মিঃ আয়েঙ্গার—কিন্তু একটি কথারও উত্তর দিতে পারেনি সীমাচলম। একবার কি একটা বলতে গিয়ে চেষ্টা

তুলতেই দেখতে পেয়েছিল শুভলক্ষ্মীর গাল বেয়ে জলের ধারা নেমে এসেছে। অনেক অনুনয় আর মিনতি দুটি চোখে। সীমাচলমের চোখের আগুন নিভে গিয়েছিল সে জলে। সে মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে ফিরে গিয়েছিল। তারপর বহুদিন যায়নি ওদিকে। শুধু শুভলক্ষ্মীর বিয়ের রাতে চুপি চুপি একবার ফটকের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল—তাও সদর রাস্তার ওপরে নয়, রাস্তা থেকে দূরে একটা ঝোপের আড়ালে। সেখান থেকেও কিন্তু উৎসবের প্রতিটি অঙ্গ বেশ ভালভাবেই দেখতে পেয়েছিল। সারাটা রাত চুপ করে বসেছিল—শুধু খুব ভোরের দিকে শুভলক্ষ্মী যখন খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল তখন নাম ধরে চীৎকার করে ডেকে উঠেছিল সীমাচলম। ফল কিন্তু ভাল হয়নি; ভয় পেয়ে আরও জোরে চীৎকার করে উঠেছিল শুভলক্ষ্মী। চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে লোক বাগানের দিকে আসতে থাকায় সীমাচলম তালবনের মধ্যে দিয়ে আগাছার জঙ্গল ভেঙে পালাতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু তার পরেও সে খবর পেয়েছিল শুভলক্ষ্মীর। কুন্নুরে বিয়ে হয়েছিল তার। স্বামী বুঝি মস্ত বড় ডাক্তার—জমাট পশার আর ধনদৌলতের পরিসীমা নেই।

পাহাড়তলীর পথ ধরে ফিরতে ফিরতে নিজের মনে বলেছিল সীমাচলম—আমার শুভলক্ষ্মী মরে গেছে। যে আছে, সে কুন্নুরের বিখ্যাত ডাক্তারের স্ত্রী। আভিজাত্যই যার একমাত্র সম্পদ। তবু নিজের মনকে সে বোঝাতে পারেনি। বার বার মনে হয়েছে হয়ত একদিন শুভলক্ষ্মী ঠিক তেমনি করে আগের মত ফুলের গহনায় সেজে দাঁড়াবে। ওর সামনে এসে বলবে—তুমি এতো ভীরু কেন? তুমি আমাকে নাও। চোখের সামনে তোমার জিনিস অন্য লোকে ছিনিয়ে নিয়ে উপভোগ করবে, আর কাপুরুষ তুমি শুধু নিষ্পলক চোখে দেখবে চেয়ে?

সাহস হয়নি সীমাচলমের। অনেক চিন্তার পরে ও চলে গিয়েছিল

মাদ্রাজ শহরে দূর-সম্পর্কের এক নিঃসন্তান খুড়োর কাছে। প্রকাণ্ড কারবার খুড়োর—বিরাট এক লোন কোম্পানীর খুড়ো সর্বেসর্বা। ইদানীং বংস একটু বেশী হওয়ায় খুড়োর খুবই অসুবিধা হচ্ছিল, সীমাচলমকে পেয়ে হাতের কাছে তিনি চাঁদের সামিল কোন জিনিসই যেন পেলেন। সীমাচলমকে কাছে ডেকে অনেকক্ষণ বোঝালেন, তাঁর অবর্তমানে সমস্ত কারবারের মালিক যে সীমাচলমই হবে—সে কথাও আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন ভাল করে। আজকাল শহরে কতকগুলি ব্যাঙ্ক হওয়ায় লোন কোম্পানীর কাজ একটু ঢিলে হয়েছে বটে, কিন্তু যা আছে, তাই যথেষ্ট। এটাই সীমাচলম সমঝে চালাতে পারলে তুপুরুষ বসে খেতে পারবে পায়ের ওপর পা দিয়ে। মুখে কোন কথা বলেনি সীমাচলম, কিন্তু ভারি মনোযোগ দিয়ে সে কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছিল। ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত স্নান-আহারেরই সময় পায় না। খেটে-খুটে পুরানো খাতাপত্তর সব কিছু পড়ে ফেল্লে, এমন কি লোন কোম্পানীর ভবিষ্যৎ নিয়ে রীতিমত তর্কও শুরু করে দিলে একদিন খুড়োর সঙ্গে।

কিন্তু সমস্ত কিছু উদ্যমের শেষ হয়ে এলো একদিন। বিকেলের দিকে হাতের কাজ সেরে সমুদ্রের ধার-ঘেঁষা রাস্তা দিয়ে বাড়ির দিকে ফিরছিল সীমাচলম। কিছুটা গিয়েই সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ঠিক যেখানে সমুদ্র অশ্রান্ত গর্জনে আছড়ে পড়ছিল কালো কালো পাথরগুলোর ওপরে তারই কোল ঘেঁষে শুভলক্ষ্মী দাঁড়িয়েছিল ডুবন্ত সূর্যের দিকে চেয়ে। একলা নয় শুভলক্ষ্মী, তার পাশে ইংরেজি পোশাক পরা দৈত্যাকার এক ভদ্রলোক—আন্দাজ করলো সীমাচলম—এ সেই কুমুরের বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ ছাড়া আর কেউ নয়। রাস্তা থেকে একপাশে সরে দাঁড়িয়েছিল সীমাচলম, কারণ শুভলক্ষ্মী আর তার স্বামী ওর দিকেই আসতে শুরু করেছিল। কাছে আসতেই কানে গেল ভৎর্সনার স্বর। শুভলক্ষ্মীকেই

তীব্রভাবে কি বলে চলেছেন ভদ্রলোকটি। আরো কাছে আসতে স্পষ্টতর হলো ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর—'তোমার মত স্বল্পবুদ্ধি মেয়েছেলের দুনিয়ায় থাকার কোন মানে হয় না। মেয়ে অনেকেরই মারা যায়, কিন্তু তাই বলে সংসার-ধর্ম ছাড়ে না কেউ। তুমি শুধু নিজের জীবন নয়, আমার জীবনটাও নষ্ট করে দিয়েছ। তোমার মত সোহাগী পরিবারকে নিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘন ঘন হাওয়া বদলিয়ে বেড়াবার মত উৎসাহ আমার নেই। যত সব আপদ জোটে কি না আমারই ঘাড়ে।'—অনেকক্ষণ ধরে গজ গজ করেছিলেন ভদ্রলোকটি। উত্তরে কিন্তু একটি কথাও বলেনি শুভলক্ষ্মী। তবু দেখতে পেয়েছিল সীমাচলম ম্লান গ্যাসের আলোয় চক চক করে উঠেছিল তার চোখ দুটি, আর কেমন উদাস দৃষ্টি সে চোখে। অনেক কৃশ হয়ে গিয়েছে। লাবণ্যহীন পাণ্ডুর দুটি গাল, সারা মুখে অবসাদের একটা ম্লানিমা।

চেয়ে চেয়ে ভারি কষ্ট হয়েছিল সীমাচলমের। ওরা চলে যাবার পর চুপ করে সেইখানে বসেছিল, আর হারানো টুকরো ঘটনাগুলোকে জোড়া দিয়ে দিয়ে অদ্ভুত স্বপ্ন রচনা করেছিল। অনেকক্ষণ পরে উঠে দাঁড়িয়েছিল সীমাচলম; কিন্তু বাড়ির দিকে আর পা বাড়ায়নি। টলতে টলতে লোন কোম্পানীর অফিসের দিকেই ফিরে গিয়েছিল।

পরের দিন ভোরে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিল খুড়ো। সীমাচলম নিখোঁজ—আর তার সঙ্গে নিখোঁজ বেশ মোটা কয়েক গোছা নোটের তাড়া আর দামী জড়োয়া গহনার বাক্সটা।

অন্য কোন কথা আর মনে আসেনি সীমাচলমের। শুধু তার মনে হয়েছিল সরে যেতে হবে মাদ্রাজ থেকে—আশেপাশের কোন শহরতলীতে নয়,—মাদ্রাজ থেকে বহু দূরে,—যেখানের মাটিতে শুভলক্ষ্মীর ছায়া পড়বে না—যেখানের বাতাসে শুভলক্ষ্মীর চুলের সৌরভ বহন করে আনবে না—

পাহাড় পর্বত পার হয়ে এদেশ থেকে অনেকদূরে। তাই প্রথম পাওয়া ষ্টীমারেই উঠে পড়েছিল রেঙ্গুনের টিকেট কিনে।

সদর রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ভাবে সীমাচলম। অজানা দেশ, কাছাকাছি স্বদেশবাসী কারও চিহ্ন নেই—পথঘাট সমস্তই নতুন। পকেট অবশ্য এখনও যথেষ্ট ভারী, কিন্তু তবু খুব সংযতভাবে চলাফেরা করতে হবে—কতদিন কাটবে এইভাবে তার কোনই স্থিরতা নেই। এই প্রথম মনে হয়—হঠাৎ দেশ ছেড়ে যেন মস্ত বড়ো ভুলই করেছে। সুটকেশটা হাতে নিয়ে রাস্তাটা পার হয়ে চলন্ত একটা ট্যাক্সিকে ইশারায় দাঁড় করায়, তারপর ড্রাইভারের কাছে এসে বলে, 'এখানে হোটেল আছে কোন? খুব বড় নয়, এই মাঝামাঝি রকমের কোন একটা হোটেল?'

চওড়া, মাঝারি, সরু, নানা রাস্তা দিয়ে ছোটখাট একটা বাড়ির সামনে এসে থামে মোটর।

চীনা হোটেল। এদেশে সচরাচর এ ধরনের হোটেল যে রকম হয়ে থাকে। বাইরে থেকে কিছু বোঝবার উপায় নেই। লোক ঢোকে আর শান্তমুখে বেরিয়ে যায়। কিন্তু সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন রূপ খোলে হোটেলের। বড় বড় মোটর এসে দাঁড়ায়। শহরের ধনীদের সমাগমে হৈ হুল্লোড়ে গম গম করতে থাকে হোটেলের হল-ঘরটা। চৈনিক জুয়ার আসরে পাশার দানের সঙ্গে ভাগ্য বিপর্যয় হতে থাকে লোকের। এ ছাড়াও চণ্ডু কোকেন আর চরসের সুপ্রচুর বন্দোবস্ত। যার যা সখ।

হোটেলের মালিক বৃদ্ধ চীনা ভদ্রলোকটি একটু সন্দেহের চোখে দেখে সীমাচলমকে। তাকে মুখের ওপরই বলে—জায়গা নেই হোটেলে। স্থানান্তরে চেষ্টা করুক। কিন্তু বিপদ থেকে সীমাচলমকে বাঁচায় মালিকের

সঙ্গিনী বর্মী স্ত্রীলোকটি। অনেকখানি বয়েসের তফাৎ মালিকের সঙ্গে, কিন্তু তাদের সম্পর্কটা যে নৈকট্যের এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল না।

বৃদ্ধের হাতের উপরে শরীরটা এলিয়ে দিয়ে বলে মেয়েটি, 'আঃ আলিম্, এতটা বয়স হলো এখনো কাক আর পায়রা চিনলে না তুমি! দেখছো না চিজটি একেবারে আনকোরা—কেমন চেয়ে আছে ফ্যালফ্যাল করে। যা দেখছে সবই যেন নতুন লাগছে চোখে। ডিমের খোলা ঠুকরে কবুতরের বাচ্ছা বেরিয়েছে যেন। দেখাই যাক না পরখ করে! দু-চারদিন থাকুক না! এই সব লোক দিয়ে অনেক সময় কাজ হয়—বুঝলে হাঁদারাম।'

থেকে যায় সীমাচলম। ছোট্ট কাঠের এক কামরা, জরাজীর্ণ খাট আর কাঠের একটা আলনা। খাওয়ার সময় কান্না পায়। নতুন আস্বাদ প্রত্যেকটি তরকারীতে, নুন আর তেলের অদ্ভুত পরিমাপে উপাদেয় প্রত্যেকটি ব্যঞ্জন। দিন চারেকের মধ্যেই হাঁপিয়ে ওঠে। আহারের ব্যাপারটা যাও বা কিছুটা সইয়ে আনে, কিন্তু মা পানের উপদ্রবে ক্রমেই অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। সময় পেলেই ঘরে টোকা মেরে ঢুকে পড়ে মেয়েটি। আধা হিন্দি আধা ইংরেজীতে আলাপ শুরু করে। তার অবশ্য ধারণা ইংরেজীতে অসাধারণ তার দখল এবং পাছে বিস্মিত হয়ে ওঠে সীমাচলম তাই তার ইংরেজী জ্ঞানের উৎস সম্বন্ধেও সচেতন করে দেয় তাকে। অনেকদিন নাকি এক খাঁটি ইংরেজ পুলিশ ইন্সপেক্টরের বাড়িতে ছিলো—সেই সময় ইংরেজী ছাড়া সে বলতোই না কিছু। মাতৃভাষা প্রায় ভুলে যাবারই যোগাড়। শুভক্ষণে মারা গেলেন ইংরেজ সন্তান, তাই মাতৃভাষা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হবার আগেই উদ্ধার পেলো মেয়েটি। খুব ভালো ছিলো ইন্সপেক্টার সাহেবটি; দোঁ-আসলা ট্যাঁশ নয়, আসল ইংরেজের বাচ্ছা, আহা বেঘোরে প্রাণটা দিলো বেচারা।

'কি রকম?' উৎসুক হয়ে ওঠে সীমাচলম, 'চোরের হাতে প্রাণ দিলেন বুঝি?'

'চোর!' অবজ্ঞায় কুঞ্চিত হয়ে আসে মা পানের নাক। ছিঁচকে চোরের সাধ্য কি যে ছোঁয় তাকে? থারাওয়াডির গোলমালের কথা শুনেছে সে? বিরাট গোলমাল—যা সারা বর্মার গ্রামে গ্রামে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিলো?

মাথা নাড়ে সীমাচলম।

হেসে ওঠে মেয়েটি। 'ও হ্যাঁ, তোমার তো জানবার কথাই নয়। তুমি তো সেদিন মাত্র এসেছো দেশ থেকে। কিবা জানো তুমি বর্মার! শেয়া শান ছিলেন এই গোলমালের সর্দার,'—নামটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু মুড়ে মাটিতে তিনবার মাথা ছোঁয়ায় মা পান। আর বলে, 'মানুষ নয় শেয়া শান,—দেবতা দেবতা। তার রক্ত সমস্ত বর্মায় ছড়ানো রয়েছে। সেই রক্ত জমাট হবে একদিন আর লক্ষ লক্ষ শেয়া শান দা হাতে জেগে উঠবে। সেদিন আর নিস্তার নেই ইংরেজের। এই শেয়া শানকে ধরতে পাঠানো হয়েছিলো "বোজী"কে মানে সেই ইংরেজ ইন্সপেক্টরটিকে—'

'তারপর?' আগ্রহে ফেটে পড়ে সীমাচলম।

'তারপর প্রকাণ্ড একটা কোকোপিন গাছে ঝুলতে দেখা গিয়েছিলো তাকে—সব আছে শুধু মুণ্ডটা নেই আর সারা গায়ের ছালটা ছাড়ানো।' গলায় কেমন যেন একটা গাম্ভীর্যের আমেজ আনে মা পান।

চমকে ওঠে সীমাচলম। 'সর্বনাশ, এ সমস্ত হয় নাকি এদেশে? আর তুমি এত সব জানলেই বা কি করে?'

খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে মা পান, 'বা রে আমি জানবো না এ সব? আমার ভগ্নীপতি বা শিনও যে ছিলো এই দলে। লক্ষ্মীছাড়া বা শিন, বুড়ো বয়সে ভীমরতি হয়েছিলো আর কি! কোকেনের কারবারে বেশ দু পয়সা

কামাচ্ছিল, হঠাৎ কি এক খেয়াল হলো দেশ স্বাধীন করবার—ব্যস তাতেই মলো শেষকালে। পুলিশের গুলি এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে ফেলেছিলো বুকের পাঁজর।'

'তাই নাকি ?' বেশ একটু বিচলিত হয়ে পড়ে সীমাচলম, 'তোমার বোনের তো খুব কষ্ট তা হলে !'

'আমার বোনের ?' আবার হেসে ওঠে মা পান। হাসির দমকে ওর প্রকাণ্ড চুলের গোছা সারা পিঠে ছড়িয়ে পড়ে। যৌবন হিল্লোলিত সতেজ দেহ প্রাণের আবেগে পূর্ণ। একটু আনমনা হয়ে পড়ে সীমাচলম। আরো একজনের এমনি ভরাট যৌবন, এমনি প্রাণের উচ্ছলতা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে তিলে তিলে। সংসারের সহস্র প্রয়োজনে চূর্ণিত হয়ে যাচ্ছে তার সমস্ত আবেগ। শুভলক্ষ্মীর কঙ্কাল—যৌবনের শীর্ণ কাঠামোটাই আজ অবশিষ্ট শুধু।

চমক ভাঙে সীমাচলমের মা পানের কথায়।

'তুমি আবার ভাবতে শুরু করলে কি ? ও সব তোমার দ্বারা হবে না। কালারা ভয়ানক ভীতু, তারা ওসব পারবে না। তারা জানে শুধু আমাদের খেত-খামার কিনে নিয়ে ফসল ঘরে তুলতে আর আমাদের নিকে-সাদী করে একপাল জেরবাদী বংশধরদের সৃষ্টি করতে। অবশ্য প্রয়োজন বুঝলে, ঠিক সময় মত টুপ করে খসেও পড়তে পারে তারা। কিন্তু বর্মীদের হাতে হাত মিলিয়ে তাদের দেশের জন্য কিছু করা—ও সব তাদের ধাতে সয় না।' কথাটার মোড় ঘোরাবার চেষ্টা করে সীমাচলম—মা পানের বোনের কি হলো ? বা শিনের মৃত্যুতে সে বেশ একটু মুষড়েই পড়েছে বোধ হয় ? গলায় একটু আন্তরিকতার সুর আনে সীমাচলম।

'আমার বোনের তো আর ঘুম হচ্ছে না বা শিনের জন্য। বুড়ো বর তার মনেই ধরেনি। সে তো বহুদিন আগে ইসমাইল সাহেবের সঙ্গে

ঘর ছেড়েছে। ভারি চালাক মেয়ে আমার বোন। ইসমাইল সাহেবের মস্ত বড়ো মসলাপাতির ব্যবসা। আমার বোন মা পোয়া আজকাল মোটর ছাড়া তো বেরোয়ই না কোথাও। আমার এখানে আসে মাঝে মাঝে ঃ জুয়াতে ভারি সখ—আর বরাতও তেমনি ভালো। যেদিনই আসে বেশ কিছু কামিয়ে নিয়ে যায়।'

বিস্মিত হয় সীমাচলম। কোন সঙ্কোচ নেই, কোন দ্বিধা নেই—একটু জড়তা নেই কোথাও। স্বামীকে ছেড়ে বোন অন্য এক পুরুষকে আশ্রয় করেছে। স্বামীর চেয়ে ধনী—হয়ত বা সুপুরুষও। কিন্তু সমাজ চোখ রাঙায়নি তাকে, একঘরেও করেনি, আত্মীয়স্বজনের দরজা আজো খোলা রয়েছে তার জন্যে। আর একটা কথা মনে পড়তেই বুকটা খচ করে ওঠে সীমাচলমের। তার মাও এমনি ঘর ছেড়েছিলেন আর একজনের সঙ্গে, তার বাপের মৃত্যুর পর। লোকটিকে আবছা মনে পড়ে সীমাচলমের। কলম্বোর মস্ত বড়ো ব্যবসায়ী—নারকেলের চোবড়া চালান দিয়ে বেশ দুপয়সা রোজগার করেছিলো। তার দু-হাতের আঙুলে দামী আটটা আংটির কথা আজো বেশ মনে আছে সীমাচলমের। ওই আটটা আংটি বিক্রী করলে নাকি ওদের আধখানা গাঁ কেনা চলতো সেই টাকায়—কথাটা অবশ্য সেই লোকটাই রহস্যচ্ছলে বলেছিলো একদিন। সেই থেকে তার ওপর ভক্তি হয়েছিলো সীমাচলমের। তাকে দেখলেই মনে হতো—এই একটা লোক, যে আধখানা গাঁ হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে বেড়াচ্ছে। লোকটি প্রথম প্রথম আসতো তার বাপের কাছে—ঠিকুজী কোষ্ঠি গণনা করতে। এই বিষয়ে খুব নাম ছিলো ওর বাপের। বাপের চেহারাটা ভালো মনে পড়ে না সীমাচলমের—তবু তার কথা মনে হলেই ধূপধুনায় ঘেরা ফোঁটা চন্দন কাটা শান্ত সমাহিত গম্ভীর একটা চেহারার কথা মনে আসে। সামনে প্রচুর পুঁথিপত্তর—আর যখনই বাপকে দেখেছে সীমাচলম,

সব সময়ই প্রকাণ্ড একটা পালকের কলমে খস খস করে কি যেন লিখে চলেছেন তিনি। গাঁয়ের লোকেরা বলতো সুব্রামনিয়ামের মত পণ্ডিত আশে-পাশে দশখানা গাঁয়ের মধ্যে নাকি ছিলো না।

সীমাচলম তখন খুব ছোটো, তবু ওর বাপ মারা যাবার দিনের কথাটা বেশ মনে আছে। সকাল থেকে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছিল—আর সঙ্গে কি ঝড়ের দাপট! ওদের পুরোনো বাড়ির কপাটগুলো মনে হচ্ছিল খুলেই পড়ে যাবে বুঝি বা। পিছনের দালানের ওপরে প্রকাণ্ড অশ্বথ গাছটা পড়ে গিয়ে দেয়ালের অনেকখানি ভেঙে গিয়েছিলো। বাড়ির সবাই জানতো মারা যাবে সীমাচলমের বাপ। এ রোগে কেউ নাকি বাঁচে না! গাঁয়ের কবিরাজ মশাই আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। যতদিন তাঁর হাতে ছিলো রোগী, তিনি এসেছিলেন। এখন রোগী নাকি ভগবানের হাতে—শুধু তিনি যদি কৃপা করেন, তবেই রক্ষা পেতে পারে। বাড়ি ভর্তি লোকজন—খুড়ো, দূর সম্পর্কের জ্যেঠা, তিন মামা সবাই এসেছে খবর পেয়ে। পাশের ঘরে সীমাচলমকে নিয়ে শুয়েছিলেন তার এক খুড়ীমা। হঠাৎ মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলো সীমাচলমের। ঝড়ের ঝাপটার ফাঁকে ফাঁকে কিসের যেন গোঙানি। গা-টা ছম্ ছম্ করে উঠলো—অনেকবার খুড়ীর গায়ে ঠেলা দিয়ে জাগাবার চেষ্টা করলো তাঁকে। কিন্তু সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছেন তিনি। তখন আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো সীমাচলম। ঘরের চৌকাঠে পা দিয়েই পাথরের মত নিস্পন্দ হয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়লো। পাশের ঘরে পিদ্দিমটার মৃদু আলোয় ঘরের অন্ধকার যেন আরো জমাট হয়ে উঠেছে। প্রায় সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে ঠেসাঠেসি করে—তাদের কালো কালো ছায়াগুলো অদ্ভুত দেখাচ্ছে ঘরের চুনবালি খসা বিবর্ণ দেয়ালে। এক কোণে ওর বাপের দীর্ঘ দেহটা শক্ত হয়ে পড়ে আছে। বিস্ফারিত দুটি চোখ—

চোখের কোণ বেয়ে অশ্রুর শীর্ণ রেখা, আর শক বেয়ে টাটকা রক্তের ধারা। সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠেছিলো সীমাচলমের। ঠিক বাপের পায়ের কাছেই বসে তার মা। এক দৃষ্টে বাপের মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখের দিকে চেয়ে আছেন। দুটি চোখে যেন অনেকদিনের সঞ্চিত জ্বালা আর উত্তাপ।

হাত লেগে দেয়ালের চুনবালি একটু খসে পড়তেই সেই আওয়াজে চমকে মুখ ফেরালেন তার মা। মুখোসের মত সাদা মুখ—এলোমেলো চুলের রাশ—ঋজু হয়ে বসে থাকার ভঙ্গীটি আজও চোখের সামনে ভাসছে সীমাচলমের। ছেলের দিকে চেয়ে শুকনো গলায় বল্লেন, 'তোমার বাবা এইমাত্র মারা গেলেন, তাঁকে শেষ প্রণাম করে নাও।' যন্ত্রচালিতের মত এগিয়ে গিয়ে বাপের পায়ে মাথা ঠেকাল সীমাচলম। ওর বুকের ভেতরটা গুড় গুড করে উঠেছিলো—মাকে যেন কেমন মনে হচ্ছিল। ঘুমন্ত পুরীতে প্রাণহীন দেহ আঁকড়ে বসে থাকার মতন সাহস আর শক্তি কোথা থেকে আসলো তাঁর। একটু উচ্ছ্বাস নেই—জীবনের সবচেয়ে প্রিয়বস্তুকে হারানোর আক্ষেপ নেই—নিষ্ঠুর একটা কর্তব্য করে চলেছেন—ওর মার মুখ দেখে এই কথাটাই শুধু মনে হয়েছিলো সীমাচলমের।

বাপ মারা যাওয়ার পরে অনেকবার এসেছিলো কলম্বোর সেই ব্যবসায়ীটি। যখনই সে আসতো, প্রচুর ফুল আনতো সঙ্গে। ওর বাবা যে জায়গাটায় বসে অধ্যয়ন করতেন সেখানটায় ফুলের স্তূপ রেখে চুপচাপ অনেকক্ষণ বসে থাকতো। মাঝে মাঝে তার মাও বসে থাকতেন তার পাশে। এ নিয়ে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কথাও উঠেছিলো অনেকবার—কিন্তু ব্যাপারটা জমাট বাঁধবার আগেই এক রাতে সীমাচলমের মা নিখোঁজ হলেন। কোন চিঠিপত্র নয়, কোন ফেলে যাওয়া চিহ্ন নয়, কোন নির্দেশ নয় ভবিষ্যৎ পথের, কেবল সীমাচলমের আবছা মনে পড়ে, গভীর

রাত্রে তার কপালে কে যেন তপ্ত চুম্বন এঁকে দিয়েছিলো—ঘুমের মধ্যেও সে চুম্বনের স্পর্শ অনুভব করতে পেরেছিলো। ও ঠিক জানে ওর মা-ই আস্তে নিচু হয়ে চুমো খেয়েছিলেন ওর কপালে আর তাঁর নিচু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তপ্ত দু'ফোঁটা জল সীমাচলমের গালের ওপর পড়েছিলো। তাইতেই বোধ হয় একটু জেগে উঠেছিলো। কিন্তু এ কথাটি সে কাউকে বলেনি কোনদিন—এমন কি শুভলক্ষ্মীকেও নয়। ওর বয়স যদিও তখন খুব কম—তবু কেন জানি ওর মনে হয়েছিলো ওর মায়ের এই চুপিচুপি পালিয়ে যাওয়া ঠিক যেন সহজ সরল সরে যাওয়া নয়—কোথায় যেন প্রকাণ্ড একটা বাধা আর নিষেধের প্রাচীর। সেই প্রাচীর তার মাকে ডিঙিয়ে যেতে হয়েছিলো আর সঙ্গে সঙ্গে বুঝি ফিরে আসার পথও চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো।

ওর খুড়ী অবশ্য ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্যভাবে বলেছিলেন প্রতিবেশীদের কাছে। শ্রীনিবাসদের পুকুরে গলায় কলসী বেঁধে ডুবে মরেছেন সীমাচলমের মা। আহা, এ শোক সামলাতে পারবে কেন, দুটিতে বড্ড ভাব ছিলো যে! কথার সঙ্গে সঙ্গে আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ দুটো মুছে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন খুড়ীমা, তারপর গলাটা আরও কাঁপিয়ে বলেছিলেন, 'আহা, সতীসাধ্বী, বেশ গেছে। শুধু কচি ছেলেটার জন্যই আমার ভাবনা।' খুড়ীর কথাটার মধ্যে বিরাট ফাঁক ছিলো একটা—ডুবেই যদি মরেছে সীমাচলমের মা তবে লাস কই তার? পুকুরে তো লাস ভেসে উঠতো নিশ্চয়। মাছে অত বড় শরীরটা খেয়ে ফেলবে নাকি? গোলমালটা আরও স্থূল রূপ নিলো পিল্লেদের চাকর রাম্মুর কথায়। প্রায় সন্ধ্যে থেকে বাবুদের হারানো গরুটা খোঁজাখুঁজি করেছে সে, মাঝরাত্তির নাগাদ তালবনের ভিতরে সন্ধান পেয়েছিলো গরুটার। সেই দামাল গরুটাকে গলায় দড়ি পরিয়ে কায়দা করে বাড়ি

ফিরিয়ে আনতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিলো। ওই থানার সামনে কাঠের পুলটার কাছে আনতেই পায়ের আওয়াজ শুনে গরুটিকে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো, তারপর স্পষ্ট দেখেছিলো সীমাচলমের মা আর সেই লম্বা মতন মস্ত বড়োলোক বাবুটি হন হন করে শহরের দিকে এগিয়ে চলেছেন। নিজের চোখকে অবিশ্বাস করবে নাকি? যে-কোনো বড়ো রকমের দিব্যি করতেও সে রাজি আছে।

যে সন্দেহটা মানুষের মনের আনাচে কানাচে উঁকি ঝুঁকি মারছিলো, রাম্মুর কথায় সেটাই স্পষ্ট রূপ নিলো এইবার। পিল্লেদের মেজ বৌ তো স্পষ্টই বলে গেলো খুড়ীমার মুখের ওপর—'শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার আর মিছে চেষ্টা বাছা! সীমাচলমের মার কীর্তি গাঁয়ের আর কারুর জানতে বাকী নেই। চোখের সামনে কি ঢলাঢলিটাই দেখেছি। খোঁজ করো গিয়ে, দেখবে এখন কলম্বো শহরে কুলবধূদের সংখ্যা বাড়িয়েছে এতদিনে। ছি ছি ছি—গলায় দড়ি।' মেয়েছেলেরা রসনার সাহায্য নিলো, কিন্তু পুরুষরা নিলো পঞ্চায়েতের স্মরণ। ফলে মাসখানেকের মধ্যেই ভিটে মাটি বিক্রি করে শহরের কাছেই অন্য গাঁয়ে গিয়ে উঠতে হয়েছিলো সীমাচলমদের। সে আজ অনেকদিনের কথা।

মা পোয়ার সমাজ তাকে ত্যাগ করেনি, আত্মীয়স্বজন একঘরে করেনি তাকে। আজও সে সমাজের বুকের ওপরেই বাস করে, স্বজাতিদের সঙ্গে নির্ভয়ে মেলামেশা করে। সব দেশের সমাজ এক নয়—যা এখানে সম্ভব সাগর পারের দেশ ভারতবর্ষে হয়ত তা সম্ভব নয়। তা যদি সম্ভব হতো তবে সীমাচলমের মা নিশ্চয় ফিরে আসতেন, অন্তত: সীমাচলমকে একবার দেখতেও আসতেন নিশ্চয়।

আজো মনে হয় সীমাচলমের, তার মা একটুও অন্যায় করেননি। সত্যই যদি তিনি গিয়ে থাকেন কলম্বোয়, তবে সেই যাওয়ার হয়ত তাঁর প্রয়োজন

ছিলো—অন্তত মনের দিক দিয়ে। মা পোয়াকে ভাল করে জানে না। সীমাচলম—কেন সে ঘর ছেড়ে অন্য কোথাও ঘর বেঁধেছিলো তাও সে জানে না। তবে তার কেবলই মনে হয় বাড়ীর বউ যখন এক আশ্রয় ছেড়ে অন্য আশ্রয়ে গিয়ে ওঠে নিশ্চয় তার কোন কারণ থাকে। এমন কোন কারণ যা হয়ত সমাজ মানবে না, দেশাচার মানবে না, আত্মীয় পরিজন মানবে না, তবুও এদেরও উর্ধ্বে যারা—তাদের কাছে এ কারণের সমাদর হবেই। মিথ্যা মোহ আর ভালোবাসার ভান করে পলে পলে নিজেকে বঞ্চনা করার চেয়ে ঢের ভালো অন্য কোথাও ঘর বাঁধা—যেখানে আর যাই হোক ভালবাসার অপমান হবে না, স্বাধীন সত্তার মর্যাদা রক্ষা হবে। শুভলক্ষ্মীর কথা আবার মনে পড়ে যায় সীমাচলমের। অনায়াসেই সে ফিরে আসতে পারে তার কাছে, কুন্নুরের বিখ্যাত ডাক্তারের অবমাননাকর আশ্রয় ছেড়ে। এ প্রেমের প্রহসনের পরিসমাপ্তি হওয়াই প্রয়োজন এবং অবিলম্বে।

যখন চমক ভাঙে সীমাচলমের, তখন মা পান উঠে গিয়েছে। অন্ধকার নেমেছে সারা ঘরটায়। উঠে বাতি জ্বালতে ইচ্ছা করে না। একটা মানসিক অবসাদ আর ক্লান্তি নামে শরীরের প্রতি গ্রন্থিতে। চেয়ারটা টেনে নিয়ে জানলার ধারে গিয়ে বসে সীমাচলম।

হোটেলের সামনে দু-একখানা গাড়ি এসে জুটছে। নিচে জুয়ার আড্ডা বসবে পুরোদমে। হাজারো রকমের লোক আসবে শহরের বিভিন্ন দিক থেকে। হৈ হুল্লোড়ে সরগরম হয়ে উঠবে সারা হোটেল। এই স্রোতে অনায়াসে গা ঢেলে দিতে পারে সীমাচলম। অতীত ওর কাছে মৃত, ভবিষ্যৎ অর্থহীন। কিন্তু কোথায় যেন বাধছে ওর ঠিক এমনি করে ছেড়ে দিতে নিজেকে।

সামনে অপরিসর রাস্তার ওপাশে শ্রমণ-নিবাস। শহরের কোলাহল ভেদ করে তার ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসে। আরো দূরে সোয়ে ডাগন

প্যাগোডার প্রকাণ্ড সোনালী চূড়োটা অন্ধকারেও ঝলমল করে ওঠে। এ কদিনে শহরের দু একটা জিনিস দেখে এসেছে সীমাচলম। সোয়ে ডাগন প্যাগোডার বিরাট বুদ্ধ মূর্তির সামনে বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছে অনেকক্ষণ ধরে। নটরাজনের রুদ্র মূর্তি নয়, ধ্বংসের করাল প্রতীক নয়, শান্ত সমাহিত তপঃক্লিষ্ট প্রশান্ত মূর্তি অপার করুণা নিমীলিত দুটি চোখে, অধরে বরাভয়ের আভাস। সঙ্গের ফুঙ্গিটি (পুরোহিত) বলেছিলো সীমাচলমকে, 'জাগ্রত দেবতা ইনি। যা আপনার মনের কামনা নির্বিচারে এঁকে জানান। 'সিকো' (প্রণাম) করুন প্রাণের কাকুতি জানিয়ে।' নতজানু হয়ে সিকো করেছিলো সীমাচলম। যে জিনিস ও কোনদিন পারে না, যা চাওয়া হয়ত উচিত নয়—বুদ্ধের পদপ্রান্তে মাথা ছুঁইয়ে তাই চেয়েছিলো সে। বারবার বলেছিলো, দাও ঠাকুর, আমার জিনিস আমাকে দাও। অবজ্ঞায় অনাদরে সংসারে আবর্জনার মধ্যে বর্ণহীন হবে সেই কুসুম স্তবক সুষমা আর সুগন্ধ হারাবে, সে আমি কি করে সহ্য করবো ঠাকুর? তুমি দাও তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে।

কথাটা শুনে প্রথমটা বেশ একটু চমকে যায় সীমাচলম। মা পানের দিকে হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে।

মা পান তীব্র ভ্রূকুটি করে ওর মুখের দিকে চেয়ে, 'ওঃ, এই নাকি মুরোদ বাবুর! আগেই জানতুম আমি কালাদের দিয়ে কোন কাজ হবার যো নেই। এদেশের ছোট্ট একটা ছেলেও এ কাজ করতে পারে নির্ভয়ে। কাজটা আর এমন কি শক্ত! কোকেনের প্যাকেটটা ঘিয়ের টিনের মধ্যে প্যাক করা থাকবে। এখান থেকে ইনশিন মাইল আটেকের পথ, তাও তো আর হেঁটে যেতে হবে না। রেলে চাপলে আধ ঘণ্টার ব্যাপার।

তারপর স্টেশনের সামনেই দোতলা বাংলো মজিদ সাহেবের। তার হাতে প্যাকেটটা কেবল দিয়ে আসা।'

ব্যাপারটা অবশ্য শক্ত কিছুই নয়, একটা জিনিস আট মাইল দূরে এক ভদ্রলোকের হাতে পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু তবু বেশ কিছুক্ষণ আমতা আমতা করে সীমাচলম। অচেনা জায়গা, নতুন মানুষ—কি হতে শেষকালে কি হ'য়ে পড়বে। মা পানের পীড়াপীড়িতে অবশেষে রাজী হয়। ইনশিন যাওয়ার পথে কোন অসুবিধা হয় না, কিন্তু স্টেশনে নেমে মহামুস্কিলে প'ড়ে যায়। সামনেই অবশ্য দোতলা বাংলো রয়েছে, তবে একটা নয় গোটা সাতেক। সবগুলোরই হুবহু এক প্যাটার্ণ। এক ধরণের জানলা আর সিঁড়ির সারি—এমন কি সামনের বাগানগুলো পর্যন্ত এক মাপের। ঘেমে ওঠে সীমাচলম। কাকে জিজ্ঞাসা করা যায় মজিদ সাহেবের কথা! সহজ সরল জিজ্ঞাসা হ'লে ভয়ের অবশ্য কিছুই ছিলো না, কিন্তু হাতের কোকেনের প্যাকেটটাই যতো নষ্টের মূল। চোরাই কোকেন কেনেন মজিদ সাহেব, সুতরাং লোক যে সুবিধের নয় তা বেশ বুঝতে পারে সীমাচলম। ব্যাপার খারাপ দেখলে হয়ত বেমালুম গা ঢাকা দিয়েই বসবেন তিনি, নয়ত নিজেই পুলিশে খবর দিয়ে সীমাচলমকে চালান করে দেবেন থানায়। অনেকবার ফিরে যেতে ইচ্ছা হয় সীমাচলমের, কিন্তু মা পানের ঠোঁট উল্টানো হাসি আর আলিমের কঠিন মুখের কথা মনে হ'তেই দমে যায়। জলে বাস করে বিবাদ করা কুমীরের সঙ্গে কতদিনই বা চলতে পারে? মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে সীমাচলম, আর নয়, হোটেল সে এবার বদলাবেই।

রাস্তার সামনে একটা বেয়ারাকে দেখে সাহস করে এগিয়ে যায় সীমাচলম।

'মজিদ সাহেবের কুঠি কোথায় বলতে পারো?'

'ওই তো তিন নম্বর বাড়ী, বাঁ দিকে।'

নির্দেশমত এগিয়ে যায় সীমাচলম। গেটের পাশেই ছোট্ট একটু বাগান। কাঠের একটা বেঞ্চিতে বৃদ্ধা একজন ব'সে ব'সে কার্পেটের আসন বুনছিলো। এদিক ওদিক চাইতে চাইতে একেবারে তাঁর সামনে গিয়েই দাঁড়ায় সীমাচলম।

'মজিদ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

বৃদ্ধা মুখ তোলেনা কার্পেট থেকে, 'মজিদ সাহেব বাইরে গিয়েছেন হপ্তাখানেকের জন্য।'

মুস্কিলে পড়ে যায় সীমাচলম। মজিদ সাহেব বাড়িতে না থাকলে কি করতে হবে সে সম্বন্ধে নির্দেশ দেয়নি মা পান। অগত্যা ফিরেই আসছিলো, হঠাৎ বৃদ্ধার গলার আওয়াজে আবার ফিরে দাঁড়ায়, 'ওহে ছোকরা, শোন একটু।'

মুখটা তুলে চশমার ভিতর দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে নিরীক্ষণ করে বৃদ্ধা সীমাচলমের আপাদমস্তক। তারপর ভুরু দুটো তুলে গম্ভীর গলায় বলে, 'তুমি কি মজিদ সাহেবের জন্য ঘি এনেছো দেশ থেকে?'

সীমাচলমের মাথাটা পরিষ্কার হয়ে যায়। সে একটু নিচু হ'য়ে বিনীত ভঙ্গিতে বলে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, বহুকষ্টে পুরানো ঘি যোগাড় করে এনেছি মজিদ সাহেবের জন্য। তাঁর বাতের এবার নিশ্চয় উপকার হবে। আমার ঠাকুমার আমলের জমানো ঘি—প্রায় একশ বছরের পুরানো।'

বৃদ্ধার ঠোঁট দুটো একটু কুঁচকে ওঠে হাসির আবেগে, তারপর বাড়ির দিকে মুখ ফিরিয়ে ডাকে, 'হামিদা, বাগানে একটু এসো তো!'

ঠিক করবী ঝোপের পাশ থেকেই তন্বী তরুণী একটি বেরিয়ে এসে দাঁড়ায় বৃদ্ধার গা ঘেঁষে। অপরূপ লাবণ্যময়ী তরুণী। সীমাচলম সমস্ত কিছু ভুলে বেশ কিছুক্ষণ চেয়েই থাকে শুধু। কাঁচা সোনার মত গায়ের

রং। গুবকে গুবকে কালো চুলের গোছা নেমে এসেছে সুডৌল পিঠের ওপরে। টানা তুটি চোখে অশেষ জিজ্ঞাসা। হাসির ভঙ্গিতে গড়া রক্তিম অধর।

'এই ছেলেটি তোমার বাবার জন্য পুরানো ঘি এনেছে কোথা থেকে। এবার নিশ্চয় তোমার বাপের বাতের কষ্ট অনেকটা কম্‌বে! কি হে ছোকরা, বাতের কথাই তো বল্‌লে তুমি ?'

ঘাড় নাড়া ছাড়া উপায়ন্তর থাকে না সীমাচলমের।

মেয়েটি ফিক করে একটু হেসে বলে, 'আসুন আমার সঙ্গে। ঘিয়ের টিনটা দিন না আমার হাতে।'

একতলায় বসবার ঘরে ঢুকেই হাসিতে ভেঙে পড়ে মেয়েটি। সোফার ওপর আছড়ে পড়ে খিল খিল করে হাসতে থাকে, 'ও, আচ্ছা লোক তো আপনি। এতগুলো টাটকা মিথ্যে কথা বলতে আপনার বাধলো না একটু। সাতপুরুষে আমার বাপের বাত নেই।' হাসিতে আবার লুটিয়ে পড়ে মেয়েটি।

সীমাচলম ওঠবার চেষ্টা করে এইবার। 'আমায় বিদায় দিন তাহলে; আর মা পানকে গিয়ে কি বলতে হ'বে বলে দিন।' অনেকটা সামলে নিয়েছে হামিদা, 'হ্যাঁ, বলবেন যে আরো পুরানো ঘি যদি মজুদ থাকে, তবে এই শনিবারের মধ্যেই যেন পাঠিয়ে দেন।'

ঘাড় নেড়ে উঠে পড়ে সীমাচলম। সিঁড়ির কাছ অবধি এসে অনুভব করে মেয়েটিও আসছে পিছনে পিছনে। গেট পার হবার সময় মেয়েটি জোর পায়ে একেবারে তার পাশে এসে দাঁড়ায়।

মুচকি হেসে বলে, 'সামনের শনিবার আপনিই আসবেন তো ঘি নিয়ে ?'

সমস্ত সংকল্প ভেসে যায় সীমাচলমের। মেয়েটির চোখে কিসের যেন যাতু মাখানো, সব কিছু ভুলিয়ে দেয়, পুরানো ব্যথা আর বেদনা। ঘাড় নেড়ে গেট পার হয়ে আসে সীমাচলম।

একেবারে হোটেলের দরজায় দেখা হ'য়ে যায় মা পানের সঙ্গে। একটু যেন উৎকণ্ঠিতা মনে হয় মা পানকে, 'কি ব্যাপার, এতো দেরি যে? জিনিসটা দিয়ে এসেছো তো ঠিক জায়গায়?'

ভারিক্কি চালে ঘাড়টা কাত করে সীমাচলম, 'কালাদের অতটা অকেজো ভেবো না। সাত সমুদ্দুর পার হ'য়ে এদেশে আসতে পারে যারা, তারা সব কিছুই করতে পারে।'

'তাই নাকি? আজ যে খুব বোল ফুটেছে দেখছি। হামিদা বিবির সঙ্গে মোলাকাত হয়েছে বুঝি? বেশ, বেশ, আলাপটা এগুলো কদ্দুর?'

একটু মুস্কিলে পড়ে যায় সীমাচলম। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও মুখটা লাল হয়ে ওঠে আর কানের পাশে উত্তপ্ত একটা অনুভূতি। কোন রকমে পাশ কাটিয়ে উঠে আসে।

ওর চলে যাওয়ার পথের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে মা পান। তারপর চোখ দুটো ঘুরিয়ে মুখটা বেঁকিয়ে অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করে আর বলে, 'ফায়া, ফায়া, কতই দেখলুম এ বয়সে। রুই কাতলা ঠাঁই পায় না, চাঁদা মাছের নাচন।'

অনেক রাত্রি পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছট্‌ফট্‌ করে সীমাচলম। এ কি হলো তার! শুভলক্ষ্মী ক্রমেই যেন সরে যাচ্ছে দূরে, অস্পষ্ট হয়ে আসছে তার যৌবন-উজ্জ্বল মূর্তি। প্রকাণ্ড একটা সমুদ্রের ব্যবধান, প্রকাণ্ড একটা সমাজের নিষেধ।

শেষরাত্রে একটু তন্দ্রার ভাব আসার সঙ্গে সঙ্গেই অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে। নটরাজনের মন্দিরে দেবদাসীর সাজে অপূর্ব লাস্যে আর ভঙ্গিতে নেচে চলেছে শুভলক্ষ্মী। এক হাতে তার পঞ্চপ্রদীপ আর এক হাতে চন্দ্রমল্লিকার মালা। ব্রোঞ্জের নটরাজনের মূর্তির প্রশস্ত কপালে প্রবালের টিপ। মন্দিরের পাথরের দেয়ালে দেবদাসীর নৃত্য-ছন্দায়িত দেহের চঞ্চল ছায়ামূর্তি। হঠাৎ

অনেক দূর থেকে যেন ফিরে এলো সীমাচলম। মন্দিরের সোপানে গিয়ে দাঁড়াতেই নাচ থামিয়ে তাকে প্রণাম করলো শুভলক্ষ্মী। হাতের মালাটি সাদরে তার গলায় পরিয়ে দিলো। তারপরে আস্তে আস্তে মুখ তুলতেই পঞ্চপ্রদীপের আলোয় তার মুখের দিকে চেয়েই চমকে উঠলো সীমাচলম। এ কি! শুভলক্ষ্মী তো নয়, এ যে হামিদা। টানা দুটি চোখ অপরূপ মমতায় উজ্জ্বল, তন্বী দেহলতায় অপার্থিব ছন্দ। আচমকা ঘুম ভেঙে যায়। কাঁচের জানলা দিয়ে ভোরের রোদ তেরচাভাবে বিছানার ওপর এসে পড়েছে। অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে।

সকালে খাবার টেবিলে ভিড় বিশেষ হয় না। আলিম, মা পান আর সীমাচলম এই তিনজনেই পাশাপাশি খেতে বসে। পরিবেষণ করে হোটেলের ছোকরা চাকর বা ছিট্।

খেতে খেতে বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যায় সীমাচলম। ব্যাপারটা মা পানের চোখ এড়ায় না। একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে বলে, 'মান্দ্রাজী-কালা কিন্তু খুব কাজের লোক। ঘিয়ের টিনটা নির্বিবাদে মজিদ সাহেবের কুঠিতে পৌঁছে দিয়ে এসেছে কাল।'

মুখ না তুলেই উত্তর দেয় আলিম, 'তাই নাকি! ছোকরা চটপটে বলেই মনে হচ্ছে। দেখো, সাবধান, কালারা আবার অতি চালাক হয় প্রায়ই।'

স্যুপের বাটিতে চামচ ডোবাতে ডোবাতে সীমাচলম বলে, 'সামনের শনিবার কিন্তু অন্য লোক দেবে। আমার যাওয়া সম্ভব হবে না।'

'তাই নাকি?' ভুরু দুটো তুলে হেসে ফেলে মা পান। 'ব্যবসাদারী চাল এর মধ্যেই শিখে ফেলেছো দেখছি। তবু যদি আসল মাল নিয়ে যেতে। ফুকো মাল বয়েই এত গুমোর!'

'তার মানে ?'

'মানে আর কি। ঘিয়ের টিনই বয়ে নিয়ে গেছো তুমি। তবে টাটকা বা পুরানো ঘি নয়। তাজা শুয়োরের চর্বির ঘি। মজিদ সাহেবের অবশ্য কোনই কাজে লাগবে না জিনিসটা।'

'তাই নাকি।' খাওয়া ছেড়ে প্রায় উঠে পড়ে সীমাচলম। 'কোকেন তাহলে ছিলো না মোটেই ?'

'না গো না, ভালো করে জানাশোনাই হলো না তোমার সঙ্গে, এরই মধ্যে কোকেন চালান দিতে পারি নাকি তোমার হাতে ? তারপর পুলিশের আস্তানায় গিয়ে ওঠো সোজা আর আমাদের হাতে পড়ুক দড়ি !' বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে সীমাচলম। মা পানের কাছে নিজেকে যেন অপরিণতবুদ্ধি শিশু বলে মনে হয়। এরা সব পারে, ভাব-ভঙ্গিতে ধরা-ছোঁয়ার যো নেই, কিন্তু পেটে পেটে কি ওস্তাদী বুদ্ধি !

'কিন্তু এই শনিবারেও তাহলে আমায় ফাঁকা মাল বয়ে নিয়ে যেতে হবে না কি ?' হতাশ হয়ে পড়ে সীমাচলম।

'না, পরীক্ষায় পাশ করেছো তুমি। এবার তোমার হাতে আসল মালই পাঠানো হবে।'

ইতিমধ্যে খাওয়া সেরে তোয়ালেতে মুখ মুছতে শুরু করেছে আলিম্। অবান্তর কথা ওর মোটেই ভালো লাগে না। কম কথা আর বেশী কাজ— ব্যস। এই সব ব্যবসায় কথা যত কম বলা যায় ততই মঙ্গল। সারা বর্মা জুড়ে ফলাও হয়ে উঠেছে ওর চণ্ডু, কোকেন আর চরসের কারবার। প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে চর আছে, যারা আইন আর পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে দিব্যি কারবার করে চলেছে দিনের পর দিন, তাদের অনেককে কখনও চোখেও দেখেনি আলিম, চিঠিপত্রের পাট তো নেই-ই। শুধু কাজ, ব্যস্। কাজেই অন্য কাউকে বেশী কথা বলতে দেখলেই যেন মাথা গরম হয়ে ওঠে।

আর মা পান বড্ড বেশী কথা কয়, নিছক বাজে কথা। কিন্তু মা পানের সামনে দাঁড়িয়ে এ কথা বলবার সাহস আজো হয়নি আলিমের। মা পানকে সে চেনে। একশোটা আলিমকে সে এঞ্জির (জামার) ফাঁকে পুরে রাখতে পারে। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে ওপরে উঠে যায় আলিম। চরসের নল মুখে দিয়ে একটু দিবানিদ্রা। এ না হলে শরীরটা যে ভেঙে পড়বে দুদিনে, অনেক রাত অবধি জাগতে হয় কি না !

মা পানেরও খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিলো, তবুও তরকারীর বাটিতে চামচ নাড়াতে নাড়াতে অপাঙ্গে সীমাচলমের দিকে চেয়ে মুচকি হাসে মা পান, 'খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি ?'

'কেন ?' একটু চমকে ওঠে সীমাচলম।

'এই হামিদা বান্নুর জন্য।'

'হামিদা বান্নু ?' শক্ত হয়ে ওঠে সীমাচলম। ব্যাপারটা আর গড়াতে দেওয়া উচিত নয়। এইখানেই শেষ হওয়া প্রয়োজন। কঠিন গলায় বলে, 'মেয়ে দেখলেই তার ধ্যান করা কালাদের স্বভাব নয়। তাদের সমাজ তাদের আরও জোরালো করেই গড়েছে।'

কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই হো হো করে হেসে ওঠে মা পান। বেশ জোর হাসি। বাছিট পর্যন্ত চমকে ওঠে সেই হাসির আওয়াজে। বহু কষ্টে কাঁচের বাসনগুলো সামলে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যায়।

'সত্যি কালারা কিন্তু ভারি শক্ত এসব বিষয়ে। থারাওয়াডির গোলমালে বোজী মারা যাবার পরে আমি মনের দুঃখে আমার জন্মস্থান বেসিনে ফিরে যাই। বেসিনে আমার মা ছিলো, বছর দুয়েক হলো মারা গেছে বুড়ি। একে বয়সও হয়েছিল তার ওপর আবার চোখেও দেখতে পেতো না সে। নিত্য নানান রোগ, ডাক্তার আনতে আনতে আমার প্রাণান্ত। তখন আমার বয়সও কম ছিলো, আর চেহারাও বেশ খাপসুরৎই ছিলো। অবশ্য

'এখনও যে একেবারে বেস্থরৎ হয়ে গেছি তাও নয়, এখনও অনেক জোয়ান মদ্দর মাথা ঘুরে যায়, কি বলো ?' এইখানে আচমকা থেমে যায় মা পান। বাঁ চোখ মটকে কেমনভাবে চায় সীমাচলমের দিকে, তারপর আবার হেসে ওঠে খিল খিল করে, 'হুঁ, যা বলছিলুম। ডাঃ মাজামদার আমাদের বাড়ীর কাছেই থাকতো। অল্পবয়সী ছোকরা, সবে পাশ করে প্র্যাকটিশ শুরু করেছে, রোগের চেয়ে রোগিণীর উপরই নজর বেশী। কাজেই মার রোগের চিকিৎসা করতে এসে আমার সেবায় মনোযোগ দিলো ভদ্রলোক বেশী করে। মার অসুখের অবস্থা বোঝাবার ছল করে নিভৃতে আমায় ডেকে নিয়ে গিয়ে ভদ্রলোকের কথা আর শেষ হয় না। ব্যাপারটা নিয়ে পাড়াতেও বেশ একটু কানাঘুষা শুরু হলো। একদিন হাটের রাস্তায় ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। সাইকেলে আসছিলো, আমাকে দেখেই লাফিয়ে নেমে পড়লো বাহন থেকে। তারপর অনেক রকম কথা। আমার বুড়ি মার বাঁচবার সম্ভাবনা খুবই কম, আর বড়োজোর হপ্তাখানেক, তারপরে আমার সব ভার ডাক্তার মাজামদার নিতে মোটেই দ্বিধা করবে না। প্রথম আমাকে দেখে অবধি নাকি ডাক্তার সাহেবের কলিজায় ব্যথা উঠেছে। এসব কথা শুনতে আমার আজো ভারি ভালো লাগে। কচি কচি ছোকরাদের ধড়ফড়ানি—পারলে বুঝি প্রাণটাই দিয়ে ফেলে তখুনি। ডাক্তার সাহেবের এ ব্যায়রামের ওষুধ আমার জানা ছিলো। তাড়াতাড়ি পা থেকে পুঁতি-বসানো ফানাটা (চটি) খুলে ডাক্তার সাহেবের দিকে চেয়ে বল্লুম—এই ফানাজোড়ার দাম বারো টাকা আর মাণ্ডেলের সিল্কের লুংগি যেটা আমার পরনে রয়েছে তার দাম শ আড়াইয়ের কম নয়। এই লুঙ্গি আর ফানা আমি প্রত্যেক সপ্তাহে বদলাই। তোমার ডাক্তারীর মাসে আয় কত ডাক্তার সাহেব ? এর কম হলে তো আমায় পুষতে অসুবিধে হবে তোমার। পশার একটু জমিয়ে নিয়ে তারপর না হয় একবার দেখা করো আমার সঙ্গে, কেমন ?

'মাজামদার সাহেব সাইকেলে উঠে হাটের দিকেই ফিরে গেলো আবার। তারপর আর দেখা হয়নি তার সঙ্গে। কোন হাসপাতালে চাকরি নিয়ে বুঝি অন্য কোথাও চলে গেছে। আহা, বেচারী, যৌবনের টানটা ঠিক সামলে উঠতে পারেনি। কালাদের কথা আর বলো না। তোমাদের সমাজে দরজা বন্ধ করে দেয় বলেই জানলার ফুটো খোঁজো তোমরা। আমাদের সামাজের বালাই নেই, কাজেই মনও ঠুনকো নয় তোমাদের মত।'

চুপ করে শোনে সীমাচলম। তর্ক করার আর প্রবৃত্তি হয় না। জীবনকে কতটুকুই বা জেনেছে সে? এরা কিন্তু ঘাটে আঘাটায় কত জায়গাতেই না ডিঙি বেঁধেছে! চুপ চাপ সে নিজের ঘরে ফিরে আসে।

গভীর রাত্রে আচমকা কড়া নাড়ার শব্দে বিছানায় উঠে বসে সীমাচলম। বিকেল থেকে আলোর সুইচটায় গোলমাল চলছে, তাই হাতড়াতে হাতড়াতে বিছানার তলা থেকে মোমবাতি আর দেশলাই বের করে। কড়ার শব্দ স্পষ্টতর। খুব সন্তর্পণে কে যেন শিকলটা তোলে আর নামায়। মোমবাতিটি জ্বেলে আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগিয়ে যায় সীমাচলম। অন্ধকারে কেমন একটু ভয় ভয় করে। বিদেশ বিভুঁই, কিছু একটা না হওয়াই বিচিত্র। এদেশে দা চালাতে একটু ইতস্ততঃ করে না লোকেরা। সামান্য ঝগড়াঝাঁটিতে বাঁকানো ছোরা তলপেটে ঢুকিয়ে দিয়ে তারই কাপড়ে ছোরার রক্তটা মুছে নিয়ে নির্বিকারভাবে জুয়া খেলতে বসে। আর এ হোটেলটাও যেন কেমন। যে ধরনের লোকরা দিনের পর দিন যাওয়া আসা করে, তাদের সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণা না থাকলেও এইটুকু বোঝে সীমাচলম—তাদের অসাধ্য কিছু নেই। টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে এরা, প্রয়োজন হলে মানুষের প্রাণ নিয়েও ছিনিমিনি খেলতে দ্বিধা করবে না মোটেই।

এ ছাড়াও আর একটা ভাবনা মনে আসে সীমাচলমের। এ কথাটা অবশ্য কদিন ধরেই তার মনের আনাচে কানাচে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছিলো। কেমন যেন মনে হয় মা পানকে। নিরালায় সিঁড়ির পাশে কিংবা বারান্দায় সীমাচলমকে একলা পেলেই নিচের ঠোঁটটা কুঁচকে হাসে—আর জ্বলে জ্বলে ওঠে ওর খুদে খুদে চোখ দুটি। এ হাসি ভালো লাগে না সীমাচলমের। ওই চোখের উজ্জ্বল দীপ্তির সামনে ও কুঁচকে যেন ছোট হয়ে যায়।

দরজাটা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই ছিটকে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে মা পান। মা পানের এ চেহারার সঙ্গে কোনদিন পরিচয় ছিল না সীমাচলমের। খুব সন্ত্রস্ত আর উদ্বিগ্ন মনে হয় তাকে। "সাড়ো" (খোঁপা) খুলে ছড়িয়ে পড়েছে সারা পিঠের ওপরে, সামনের চুলের স্তরে বড়ো কাঠের একটা চিরুনি গোঁজা, উত্তেজনায় বুকটা ওঠানামা করছে আর কেঁপে কেঁপে উঠছে হাতের আঙুলগুলো।

পিছিয়ে আসে সীমাচলম, 'কী ব্যাপার? এত রাত্রে?'

'সর্বনাশ হয়েছে।' সর্বনাশের আভাস পাওয়া যায় মা পানের গলার আওয়াজে, 'শীগগির তৈরী হয়ে নাও—এখুনি বেরিয়ে পড়তে হবে আমাদের।'

রীতিমত চমকে ওঠে সীমাচলম। কম্পিত হাত থেকে মোমবাতিটা ছিটকে পড়ে, চৌকাটে লেগে নিভে যায়। ঘন অন্ধকার, কিন্তু সেই অন্ধকারেও ঝক্‌ঝক্ করে জ্বলে ওঠে মা পানের কানের পাথর দুটো আর তার গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ অন্ধকারকে একটা ভয়াবহ রূপ দেয় শুধু। সীমাচলমের একটা হাত জড়িয়ে ধরে মা পান। সীমাচলমের মনে হয় একটা সাপই বুঝিবা পাক দিয়ে ধরেছে তার হাত। একটা অশরীরী শিহরণ সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে দেয়।

'কিন্তু কি ব্যাপারটা না জানলে একটি পাও নড়বো না আমি।' সীমাচলম যেন অনেক দূরে থেকে কথা বলছে।

'লক্ষ্মীটি, এভাবে আর দেরী করো না। পুলিশের লোক হয়ত এখনি ঘিরে ফেলবে সারা হোটেল। তার আগেই আমাদের সটকাতে হবে এখান থেকে।'

'পুলিশের লোক? সে কি, কি আবার হাঙ্গামা বাধালে তোমরা? না, না, এসব ব্যাপারে আমি নেই কিন্তু।' সীমাচলম দৃঢ়তা আনার চেষ্টা করে কণ্ঠস্বরে।

আরো এগিয়ে আসে মা পান। কানের পাথরের সংগে সংগে চোখ দুটোও জ্বলে ওঠে। হাতটা আরও শক্ত হয়ে বসে সীমাচলমের কব্জিতে। দাঁতে দাঁতে ঘষার একটা শব্দও পাওয়া যায়, 'কালা! নিজের মরণ নিজে ডেকে আনছো তুমি। এখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করার অবসর নেই। এসো আমার সংগে, সব কিছুই তুমি সময়ে জানতে পারবে।'

যন্ত্রচালিতের মত মা পানের পিছু পিছু অন্ধকারে হাতড়ে বেরিয়ে আসে সীমাচলম। অজানা শঙ্কায় কাঁপছে ওর পা দুটো আর দ্রুত রক্তের স্রোত বইছে শিরায়। পিছনের দরজা দিয়ে কাঠের ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে একতলায় নেমে আসে দুজনে।

জমাট অন্ধকার। এদিকটায় রাস্তায় আলো নেই মোটেই—ছোট্ট অপরিসর এক গলি। গলি পার হয়ে রাস্তায় এসে পৌঁছেই দাঁড়িয়ে পড়ে মা পান। সঙ্গে সঙ্গে সীমাচলমও দাঁড়ায়। মৃদু একটা গর্জন; তারপরেই তাদের গা ঘেঁষে দাঁড়ায় জীর্ণ একটা মোটর। মাল পত্তরে বোঝাই, ড্রাইভারকেও দেখবার উপায় নেই। দরজাটা খুলে কোনরকমে উঠে বসে মা পান, তারপর ইঙ্গিতে সীমাচলমকেও উঠতে বলে। মালের বোঝাগুলো দুহাতে কোনরকমে ঠেকিয়ে আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকে পড়ে সীমাচলম। ভালো করে বসবার উপায় নেই—কোনরকমে সীটের ওপরে পা মুড়ে বসা। উঠে বসবামাত্র বিরাট একটা গর্জন করে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে চলতে শুরু

করে মোটরটা। টাল সামলাতে না পেরে একেবারে মা পানের গায়ের ওপর গিয়ে পড়ে সীমাচলম। হাত দুটো দিয়ে মা পানের দেহটা কোন-রকমে আঁকড়ে ধরে। মাথাটা মা পানের বুকের ওপর গুঁজড়ে যায়। অবিচলিত মা পান একটা হাত দিয়ে আস্তে তাকে সরিয়ে দেয় একপাশে, তারপর মৃদু গলায় বলে, 'এত তাড়াতাড়ি নয়, এসবের এখনও ঢের সময় আছে।'

স্তম্ভিত হয়ে যায় সীমাচলম। ব্যাপারটা যে ইচ্ছাকৃত নয়, সেকথা কি বুঝতে পারেনি মা পান? আচমকা ধাক্কায় তার গায়ের ওপর গিয়ে পড়েছিলো, এছাড়া আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে তার। কিন্তু এ নিয়ে আর কথা কাটাকাটি করতে ইচ্ছা হয় না সীমাচলমের। এখনি ঘোলাটে হয়ে উঠবে জল। পাঁক আর শেওলায় আচ্ছন্ন হয়ে যাবে তার সর্বাঙ্গ। তার চেয়ে চুপচাপ থাকাই ভালো।

কিন্তু চুপচাপ কি থাকা যায়? অপরিসর জায়গার মধ্যে কেবলি গায়ে গায়ে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যায় দুজনের। অসমতল পথ দিয়েই বুঝি গাড়ি চলেছে। আশে পাশে বিরাট সমস্ত পৌটলা-পুঁটলি থাকায় বাইরের দিকে, চোখ মেলে দেখবার কোন সুযোগই নেই। আন্দাজে শুধু বুঝতে পারে সীমাচলম শহরের এলাকা পার হয়ে দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছে গাড়ি। মিটমিটে গ্যাসের আলো মাঝে মাঝে। লোকজনের বসতি ক্রমেই বিরল হয়ে আসছে।

আচমকা একটা স্পর্শে সে শিউরে ওঠে। তার কাঁধের ওপরে আলতো একটা হাত রেখেছে মা পান। চোখ ফিরিয়ে দেখে অস্পষ্ট মা পানের মুখ, কিন্তু একটু যেন মুচকি হাসির রেখা দেখা যায়, 'কী ভয় করছে না কি?'

এবারে চেতনা ফিরে আসে সীমাচলমের। কোথায় চলেছে সে এই

বিদেশী মহিলার সংগে ? সাজানো হোটেল আর মালিক আলিমকে পিছনে রেখে নির্জন রাতে এমনি করে কাকে নিয়ে ঘর ছেড়ে চলেছে সে ? আর কোথায়ই বা চলেছে ?

'কোথায় চলেছি আমরা ?' অস্পষ্ট গলায় বলে সীমাচলম। 'আর, হোটেল থেকে পালাবার মানে ?'

'না পালালে হাজত বাস করতে হতো যে। এতক্ষণে লাল পাগড়ীতে ঘেরাও করে ফেলেছে হোটেল। আলিম বুড়ো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পুলিশ সাহেবদের দেখাচ্ছে সমস্ত কামরা। কোকেন চরস আর চণ্ডুর চিহ্ন পর্যন্ত নেই কোথাও। খুব বোকা বনবে ইন্সপেক্টর সাহেব।'

ব্যাপারটা দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে আসে সীমাচলমের কাছে। হোটেল ঘেরাও করেছে পুলিশে, তাই পালাচ্ছে মা পান চরস, চণ্ডু আর কোকেনের বোঝা নিয়ে ; আর সংগে চলেছে সীমাচলম। কিন্তু আলিম, আলিমকে কেন সংগে নিলো না মা পান ? বাঘের মুখে তাকে রেখে নিজে এমনি করে পালাচ্ছে ?

কথাটা বলেই ফেলে সীমাচলম। 'কিন্তু আলিমকে ফেলে এলে যে এমন করে ?'

অদ্ভুতভাবে হেসে ওঠে মা পান। 'খুব বুদ্ধি তোমার যা হোক, পুলিশে চাকরী নাও, উন্নতি হবে।'

'তার মানে ?'

'মানে আর কি। সবশুদ্ধ হোটেল ছেড়ে এলে পুলিশের সন্দেহ যে বেড়েই যেতো আরো। তার চেয়ে বুড়ো আলিম রইলো হোটেলে, মালপত্তর নিয়ে আমরা সরে পড়লুম, এই তো বেশ। আবার ব্যাপারটা মিটে গেলে ফিরে এসে জোর কারবার শুরু করবো।'

পুলের ওপর দিয়ে চলেছে গাড়ি, লোহালক্কড়ের আওয়াজের তালে

তালে মোটরের ইঞ্জিনের শব্দ মিলে একটা ঐক্যতানের শুরু হয়। পুলের নিচে শীর্ণকায়া নদী। দুপাশে বালুচর। শহরের সীমানা ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। ঘুমন্ত শহরের মাঝখান দিয়ে অনির্দেশ যাত্রা। বাতাসে ভিজে মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ। অনেক দূরে কোথায় যেন বৃষ্টি হয়েছে। বর্মার মৌসুমী বৃষ্টি—বছরের আট মাস আকাশ কালো হয়ে থাকে মেঘের ভারে। মোটর আর একটু এগিয়ে যেতেই ঝমঝম্ করে নামে বৃষ্টি। পিচের রাস্তা ছাড়িয়ে লাল কাঁকরের পথ। খুব সাবধানে চলতে শুরু করে মোটর, পথের বাঁক ঘুরে পাহাড়ী রাস্তায় সাবধানে না চালালে যে কোন মুহূর্তেই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বৃষ্টির ঝাপটা থেকে বাঁচবার জন্য জড়সড় হ'য়ে বসে সীমাচলম। একটু যেন শীত শীত করছে তার। পাতলা একটা সার্ট আর সিল্কের লুঙ্গি পরনে, শীত তো লাগবারই কথা। মা পানও সরে বসে একটু। মানুষের গায়ের গরমে মন্দ লাগে না সীমাচলমের। অন্ধকার পাতলা হয়ে আসছে—এইবার ভোর হবে বোধ হয়। গাছ-পালার আড়াল থেকে একটু যেন আলোর আভাসও দেখা যায়। একটা হাত মা পানের পিছনে লম্বালম্বিভাবে রাখে সীমাচলম। আরো এগিয়ে আসে মা পান। মাথাটা এলিয়ে দেয় সীমাচলমের বুকে, তার উত্তপ্ত নিঃশ্বাসের ছন্দে আর কালবৈশাখীর অকাল বর্ষণের সঙ্গে কোথায় যেন একটা মিল রয়েছে। আরো নিবিড় করে মা পানকে জড়িয়ে ধরে সীমাচলম।

গ্রামে আর শহরে মেশানো এই শানচাউঙ বন্দর। খালের মুখে বড়ো বড়ো বজরা সর্বদাই ভিড় করে থাকে। তিন জায়গা থেকে তারা নিয়ে আসে ধান আর জ্বালানি কাঠ, আর এখান থেকে নিয়ে যায় সিল্কের পুঁতি-বসানো লুঙ্গি আর হরেক রকমের কাঁচ-বসানো গালার চুড়ি। খালের ধার ঘেঁষে কাঠের কতকগুলো বড়ো বড়ো বাড়ি। তলায় গুদাম আর ওপরে ব্যবসায়ীদের গদি। সকল সময়েই কারণে অকারণে সরগরম হয়ে থাকে জায়গাটা। লাল কাঁকরের রাস্তাটা এই অবধি এসে হঠাৎ যেন থেমে গেছে। তারপরেই কাঁচা রাস্তা মোষের গাড়ির অত্যাচারে এবড়ো-খেবড়ো হয়ে গেছে, অন্য কোন যানবাহনের যাবার উপায়ই নেই।

মোটরটা থামতেই মেয়ে কুলিদের ভিড় শুরু হয়ে যায়। যে যেখান থেকে পারে মালের বোঝা তুলে নেয় মাথায়। সীমাচলম বেশ একটু বিব্রত হয়ে পড়ে। মা পান শুধু গলা বাড়িয়ে দেখে কিছুক্ষণ, তারপর চিৎকার করে কাকে যেন ডাকে, 'আকো, আকো!'

মাঝারি গোছের একটা বজরার ওপরে প্রৌঢ় ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। সাজসজ্জায় চূড়ান্ত বিলাসিতা, হাতের শিঙের লাঠিটা ধরার কায়দাতেই মালুম হয়। মা পানের ডাকে চমকে ফিরে চেয়ে থাকেন কিছুক্ষণ মোটরের দিকে, তারপর খুব সাবধানে কাদা আর জল থেকে দামী জুতো বাঁচিয়ে এগিয়ে আসেন।

নাতিদীর্ঘ চেহারা, তীক্ষ্ণ দুটি চোখ আর কড়া একজোড়া গোঁফ। মুখের অন্যান্য অঙ্গ চট করে নজরে পড়ে না। গোঁফজোড়াটি অতি সযত্নে তিনি লালিত করেন তা বোঝা যায় সে দুটির মোম লাগানো প্রান্তভাগ দেখে।

কাছে এসে দাঁড়ান কিছুক্ষণ, তারপর কৌতূহলে যেন ফেটে পড়েন

তিনি, 'মা পান না? হ্যাঁ, তাইতো। তারপর, খাস শহরের মেয়ে এ জঙ্গলে যে হঠাৎ?'

মুচকি হাসে মা পান, 'শহুরে লোকের তাড়া খেয়ে। বলবো'খন সব, আগে তোমার কুলিদের হাত থেকে রক্ষা করো আমার জিনিসপত্তর।'

হাতের ছড়িটা তুলে হুঙ্কার দেন ভদ্রলোক। এক হুঙ্কারেই বেশ কাজ হয়। মেয়ে কুলিরা মোট-ঘাঠ রেখে দাঁড়ায় তাঁকে ঘিরে। তিনি তিনটি কুলিকে নির্দেশ করে বলেন, 'ব্যস, তিনজনই যথেষ্ট! তোরা নিয়ে যা সব মালপত্তর একটা একটা করে।'

সীমাচলম এতক্ষণ শুধু আপাদমস্তক দেখে ভদ্রলোকটির। বেশে বেশ একটা পারিপাট্য, চাল-চলনে গ্রাম্য আভিজাত্য। এখানকার পড়ন্ত জমিদার বংশের শেষ প্রদীপ নাকি?

'ইনি কে?' প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির গলার আওয়াজে চমক ভাঙে সীমাচলমের, 'এঁর কি ব্যবস্থা হবে?'

লাঠি তুলে যেভাবে মাল গুণছিলেন সেইভাবেই তার দিকে লাঠির সঙ্কেত করেন। ও যেন একটা বাড়তি মালবিশেষ। ওকেও চড়াবে নাকি কোন মেয়ে কুলির পিঠে?

আবার হাসে মা পান, 'এটি! এটি আমার নতুন ম্যানেজার।' হাসে আর আড়চোখে চেয়ে থাকে সীমাচলমের দিকে, 'অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই কিন্তু কাজটা বেশ বুঝে নিয়েছে।'

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি আরো এগিয়ে আসেন। সীমাচলমের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। তারপর বলেন, 'কালা খুব অল্পবয়সী বলেই মনে হচ্ছে।'

হ্যাঁ, ভারতবর্ষের গন্ধ এখনও পাওয়া যাবে গা শুঁকলে। কিন্তু অল্পবয়সেই বেশ ধুরন্ধর।'

একটু ভয় পায় সীমাচলম। প্রথম আলাপেই সব ফাঁস করে দেবে নাকি মা পান। কিন্তু কি-ই বা জানে মা পান! হামিদা বানুর সম্বন্ধে অস্পষ্ট আভাস একটা আর তার নিজের সম্বন্ধে ওই একটু। চলন্ত গাড়ির ভিতরে কয়েকটি দুর্বল মুহূর্ত।

কিন্তু বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন না লোকটি। লাঠিটা ঠুকে ঠুকে বলেন, 'বেশ বেশ। চলো, এগোও তোমরা! আমি এই জল কাদায় কাঁচা রাস্তা দিয়ে আর যাবো না, খালের পাশ দিয়ে দিয়েই যাই।'

কাঁচা রাস্তা ধরে এগিয়ে চলে মা পান। সীমাচলম ইচ্ছা করেই একটু পিছিয়ে পড়ে।

রাস্তার দুধারে বিস্তীর্ণ মাঠ। হোগলার মত লম্বা লম্বা গাছের ঝোপ। দূরে দূরে বড়ো গাছের সার। তারও পিছনে আবছা দেখা যায় কতকগুলো পাহাড়ের শ্রেণী। বিশেষ উঁচু নয়, কিন্তু সারি সারি চলেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে, একটার পর একটা। পাহাড়ের গায়ে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া ঘন গাছের ঝোপ। কুয়াশায় ভালো করে দেখা যায় না সবটা। কালো মৌসুমী মেঘে তখনও আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে আকাশ।

'কিগো, পুরুষমানুষ হয়ে পিছিয়ে থাকবে নাকি?' অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে মা পান।

জল আর কাদা সামলাতে বেশ বেগ পেতে হয় সীমাচলমের। জুতোটা খুলে হাতে নিয়ে খুব সাবধানে পা ফেলছে। মা পানের কথাটায় মনোযোগ দেবার সময় নয় এখন।

কিছুটা এগিয়েই ও দাঁড়িয়ে পড়ে, 'কি ব্যাপার বসলে যে?' মস্ত বড় একটা গাছ উপড়ে পড়ে আছে রাস্তার এক পাশে। হয়ত কাল রাত্রের ঝড়েই এই অবস্থা গাছটার। তার ওপরেই বসে আছে মা পান।

'শোনো, কাকার বাড়ি ঢোকবার আগে কতকগুলো কথা তোমার জানা দরকার।'

মা পানের পাশেই বসে পড়ে সীমাচলম। একবার বসলে সত্যিই উঠতে যেন আর ইচ্ছাই করে না। কাল রাত থেকে একটানা চলেছে শরীরের ওপর অত্যাচার। গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে তীব্র একটা বেদনা।

'আমার কাকা এখানকার ডাক্তার, বুঝলে?' মা পান সরে বসে একটু।

'তাই নাকি?' সত্যিই আশ্চর্য হয় সীমাচলম। 'তোমার কাকাকে দেখে আমি কিন্তু এখানকার জমিদার বলেই মনে করেছিলাম। বুড়ো বয়সেও শরীরটি বেশ তোয়াজে রেখেছেন।'

কথাগুলোয় বিশেষ আমল দেয় না মা পান। 'কাকার কাছে নানা রকমের রোগী আসবে কিন্তু, তাদের সম্বন্ধে কোনদিন কোন রকম কথা জানতে চেয়ো না। চুপচাপ শুধু দেখে যাবে। আমরা এখানে চিরকালের জন্য থাকতে আসিনি, এইটে মনে রেখো। ওদিকের ব্যাপার একটু নরম হলেই, এই এঁদো জঙ্গল ছেড়ে পালাবো আমরা।'

'আমার দায় পড়েছে তোমার কাকার রোগীদের বংশপরিচয় জানবার জন্য।' মুখে কথাটা বললেও মনে কিন্তু অজস্র কৌতূহল উঁকি মারে সীমাচলমের। কোথা থেকে কোথায় চলেছে সে ভেসে? শুধু এক দেশ থেকে দেশান্তরে নয়, এক জাতি থেকে অন্য জাতির মধ্যে, এক সংস্কার থেকে অন্য সংস্কারে, বোধ হয় এক বিস্ময় থেকে নতুনতরো কোন বিস্ময়ে।

কাঠের দোতলা বাড়ি। আশে পাশে মাইল খানেকের মধ্যে জনমানবের বসতি আছে বলে মনে হয় না। বড়ো বড়ো পুকুর আর জারুলের সারি—সমস্ত দিন ঝিঁ ঝিঁ আর তক্ষকের ডাকে কান পাতা যায় না।

এমন নিরালা জায়গায় বাড়ি করে না কি মানুষ! গেট খুলে এগুতেই বৃদ্ধা একটি মহিলা নেমে আসে। একরাশ পাকা চুল চুড়ো করে মাথার ওপরে বাঁধা, মুখের দু'পাশের চামড়া কুঁচকে ঝুলে পড়েছে, আর একটা চোখের সাদা অংশটা বীভৎস ভাবে বেরিয়ে আছে। সে-চোখে যে দেখতে পায় না এটা তার চলার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায়।

'কে রে? মা পান না কি! আয়, আয়, অনেকটা হাঁটতে হয়েছে, না?'

'আমাদের আসার খবর তুমি কোত্থেকে পেলে খুড়ী?'

'বা রে তোর কাকা যে বললো। মা পান আসছে, শিগগীর চায়ের জল চড়িয়ে দাও আর বসবার ঘরটা রাখো পরিষ্কার করে।'

'কাকা বুঝি অনেকক্ষণ এসেছে।'

'হ্যাঁ, তা বেশ কিছুক্ষণ হলো বৈ কি। খালের পাশ দিয়ে সোজা রাস্তা ধরেই এসেছে। তোদের তো জলা ভেঙে আসতে হ'লো। তা তো হবেই, যা সব জিনিস তোর সঙ্গে থাকে সে সব নিয়ে তো আর সদর রাস্তা দিয়ে আসা যায় না, কি বলিস!' খিক্ খিক্ করে হেসে ওঠে বৃদ্ধাটি।

বৃদ্ধাটি সরু সরু দুটো হাতে জোর করে তালি দেয় আর অনেকক্ষণ ধরে হাসতে থাকে। তারপর হঠাৎ সীমাচলমের দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসিটা বন্ধ করে বলে, 'বা, বা, এবার বেশ জোয়ান ম্যানেজার এনেছিস তো সঙ্গে। খুব কাজের লোক বোধ হয়। আগেকারের সেই মড়াখেকো ম্যানেজারটার কাণ্ড মনে হলে এখনও যেন কেমন হয়ে যাই। ধন্যি বুকের পাটা তার। বাঘের ঘরে ঢুকে তার ছা চুরির সাহস। শাস্তিও পেয়েছে তেমনি—যেমন কুকুর—তেমনি—'

'আঃ, থামো দিকিনি খুড়ী, তোমার কথা একবার আরম্ভ হলে আর থামতে চায় না।' প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওঠে মা পান। সঙ্গে সঙ্গেই গলার

স্বর একেবারে পালটে ফেলে খুড়ী, 'আমার যেমন মরণ, কি বলতে কি বলে ফেলি, আয়, আয়, ভেতরে আয়।'

বেশ একটু দমে যায় সীমাচলম। ছোট্ট ছোট্ট কথার টুকরো, কিন্তু সব জোড়া দিয়ে অর্থটা পরিষ্কার হয়ে আসে তার কাছে। কিছু বিশ্বাস নেই এদের। সব পারে এরা। দা দিয়ে কুচি কুচি করে কাটলেও বাইরের পৃথিবী কোন সন্ধান পাবে না। চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে ফেললেও সাড়া দেবার লোক নেই মাইল খানেকের মধ্যে।

নতুন জায়গায় খুব ভোরের দিকে ঘুম ভেঙ্গে যায় সীমাচলমের। বেশ একটু শীত শীত করছে। সোয়েটারটা গায়ে চাপিয়ে পশ্চিম দিকের খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। গাছের ঝোপে ঝোপে তখনও জমাট অন্ধকার—পাতলা কুয়াশার একটা আস্তরণ সে অন্ধকারকে আরো গাঢ় করে তুলেছে। অনেক দূরে মোষের গাড়ির সার চলেছে, তার ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে।

সারা রাত ভাল ঘুম হয়নি সীমাচলমের। একতলার একটা ঘরে তাকে শুতে দেওয়া হয়েছিলো। ঠিক পাশেই পার্টিশন দেওয়া ডাক্তারের চেম্বার। অনেক রাত পর্যন্ত হট্টোগোল আর চিৎকারের স্বর ভেসে আসছিলো সেখান থেকে। মাঝে মাঝে খুবই বিরক্তি বোধ হয়েছিলো। ইচ্ছা হয়েছিলো চিৎকার ক'রে বলে ডাক্তার সাহেবকে সারারাত এভাবে গোলমাল চললে শুতে পারে নাকি কোন মানুষ। কিন্তু ক্লান্তিতে নির্জীব হয়ে পড়েছিলো। বিছানা থেকে ওঠবার সামর্থ্যও বুঝি ছিল না। তাই এক সময়ে ওই হট্টোগোলেও সে ঘুমিয়ে পড়েছিলো।

পনেরোটা দিন একটানা কেটে যায়। বৈচিত্র্যহীন, নতুনত্বহীন, গতানুগতিক। ক্রমেই যেন হাঁপিয়ে ওঠে সীমাচলম। মা পান উদ্বিগ্ন হ'য়ে দিনের পর দিন নতুন কোন সংবাদের প্রত্যাশা করে। কিন্তু কোন

সংবাদ নেই শহর থেকে। কি করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে আলিম কোন খবর না দিয়ে?

একদিন ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে সীমাচলম। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে আঁকা বাঁকা রাস্তা। ফার্ণ আর ইউকেলিপ্টাসের সারি আর ছোট ছোট আগাছার ঝোপ। শুকনো পাতা মাড়িয়ে মাড়িয়ে পথ চলতে মন্দ লাগে না সীমাচলমের। অস্পষ্ট কুয়াশার স্তর সরে যায় চোখের সামনে থেকে। মাদ্রাজের পাহাড়তলী আর হারানো জীবনের কথা ভেসে আসে। এমনি পাহাড় আর এমনি দুর্ভেদ্য অরণ্য সে ফেলে এসেছে অন্য এক প্রদেশে, আর ফেলে এসেছে নতুন জীবনের স্বীকৃতি। শুভলক্ষ্মী নিঃশেষ হয়ে গেছে তার জীবনে—মনের আদিম স্তরেও যেন তার কণামাত্রও অবশিষ্ট নেই। তারপর এসেছে অনেক সংঘাত—এসেছে হামিদা বান্নু আর মা পান। একদিনের পরিচয় হামিদা বান্নুর সঙ্গে—আর মা পান এখনও জড়িয়ে আছে তার জীবনে। সমস্ত যেন দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়। এ মেঘ কোনদিন কি কাটবে না তার আকাশ থেকে? নতুন সূর্য জাগবে না নতুন দীপ্তিতে?

পাহাড়ের ঢালু পাড় বেয়ে সংযত গতিতে নেমে আসে সীমাচলম। বাঁশের ঘন ঝোপ বাতাসে কান্নার সুর তোলে। বাঁশঝোপ পার হ'য়ে একেবারে নদীর কিনারে এসে পড়ে।

এদিকটায় বজরা বাঁধে না কেউ। বালি আর সবুজ ঘাসে ঢাকা চর। সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারে কালো হয়ে আসে চারিদিক। তাড়াতাড়ি পা চালাতে শুরু করে সীমাচলম। কিছুটা এগিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। সামনে অতিকায় কি একটা যেন পড়ে রয়েছে। আবছা অন্ধকারে স্পষ্ট কিছু দেখা যায় না। অনেক কষ্টে চোখ দুটো কুঁচকে ঠাওর ক'রে ক'রে পা বাড়ায় সীমাচলম। কাছে যেতেই সমস্ত কিছু পরিষ্কার হ'য়ে আসে। প্রকাণ্ড ডিঙ্গি একটা উপুর করা রয়েছে চরের ওপরে। বোধ হয় মেরামত

হচ্ছে কিংবা রং লাগানো হচ্ছে ডিঙ্গির চার পাশে। কেমন একটা বিদকুটে গন্ধ ভেসে আসছে বাতাসে। ডিঙ্গির পাশে যেতেই ফিস ফিস শব্দ কানে যায় সীমাচলমের। বিদেশ বিভুঁইয়ে গা ছমছম করে ওঠে তার। অনেক-গুলো টাকা সঙ্গে আছে—বিদেশের একমাত্র সম্বল। ডাকাতের হাতে পড়লো নাকি শেষকালে! পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায় সীমাচলম।

'কে যায়?' গলার আওয়াজে চমকে ওঠে সীমাচলম। কিন্তু সে ডাক উপেক্ষা করা যায় না। আস্তে আস্তে পিছিয়ে আসে। ডিঙ্গির কাছ বরাবর গিয়েই বেশ একটু ভড়কে যায়। প্রায় জন পাঁচেক লোক হাতে মোটা লাঠি আর লম্বা কোট পরনে। আলো-অন্ধকারে খর্বকায় এই সব চেহারাগুলো অদ্ভুত দেখায়।

কে একজন এগিয়ে এসে ফস করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে ধরে ওর সামনে: দু'একবারের চেষ্টায় কাঠিটা জ্বলে উঠতেই চম্‌কে লোকটি সরে যায়। সীমাচলমও পিছিয়ে আসে দু'পা। সেই স্বল্প আলোতেও চিনতে পারে সীমাচলম। এ চেহারা ভোলবার নয়—সীমাচলম চেঁচিয়ে ওঠে, 'আকো, একি আপনি এখানে!'

একটু যেন বিব্রত হয়ে পড়েন মা পানের কাকা। আর একবার জ্বালান দেশলাইয়ের একটা কাঠি। মুখের চুরুটটা ধরিয়ে নিয়ে সীমাচলমের খুব কাছে এসে দাঁড়ান। টানের সঙ্গে সঙ্গে লাল আলোর আভা। সেই আলোয় বিবর্ণ দেখায় সীমাচলমের মুখ।

'তুমি হঠাৎ এসময়ে এখানে যে?' অস্বাভাবিক রুক্ষ মনে হয় তাঁর কণ্ঠস্বর। এর আগে তাঁর কণ্ঠস্বরে গ্রাম্য টান লক্ষ্য করেছিলো সীমাচলম, যার জন্য তাঁর কথা বুঝতে মাঝে মাঝে বেশ অসুবিধা হতো। ঠিক শহরের ভাষা নয়, যে-ভাষা মা পানের কাছে শিখেছিলো সীমাচলম। আজ কিন্তু কোন জড়তা নেই ভাষায়, বুঝতে সীমাচলমের একটুও কষ্ট হয় না।

'এই এদিকটায় বেড়াতে এসেছিলুম একটু নদীর ধার দিয়ে দিয়ে সোজা খানিকটা রাস্তা।' আমতা আমতা করে সীমাচলম।

সঙ্গের লোকগুলোর দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে কি যেন বলেন মা পানের কাকা। গাছের গুঁড়িতে দাঁড়-করানো সাইকেলগুলো নিয়ে তারা মিশে যায় অন্ধকারে।

এগিয়ে আসেন তিনি। একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়ান সীমাচলমের।

'চলো, বাড়ির দিকেই যাবে তো!'

খুব সাবধানে পা ফেলে সীমাচলম। সরু আল। হয়ত কারুর জমির সীমানা, কিংবা হয়ত খালের জল আটকাবার জন্য মাটির স্তূপ জড়ো করা হয়েছে। মাঝে মাঝে শুকনো জারুল গাছের গুঁড়ি—বাঁশ বনের ঝোঁপ। অনেকটা পথ পার হলো দু'জনে। মা পানের কাকা হাতের লাঠি ঠুকে ঠুকে এগিয়ে চলেন। পিছনে পিছনে তাঁকে লক্ষ্য করে পা চালায় সীমাচলম। অনেকক্ষণ চুপচাপ। ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে হাওয়ার ঝলক, কোথাও বুঝি বৃষ্টি নেমেছে ধারে কাছে।

'কতদিন মা পানের সঙ্গে আছো তুমি?'

'ভারতবর্ষ ছেড়ে পর্যন্ত।'

'এ দলে আসলে কি করে?'

'কোন্ দলে?' খুব ভিজে গলায় জিজ্ঞাসা করে সীমাচলম।

'এই গাঁজা-আফিং-কোকেনের দলে?'

'আজ্ঞে আমি তো নেই এ দলে। পাকেচক্রে এসে পড়েছি দলে।'

'ছাড়তে হবে।'

কথাটা ভাল করে শুনতে পায়নি সীমাচলম। কিম্বা হয়ত যা শুনেছিলো তা বিশ্বাসই করতে পারেনি। আরো দু'পা এগিয়ে আসে। একটু উঁচু গলায় বলে, 'কি বললেন?'

'ছাড়তে হবে এদের সঙ্গ। এ ঘূর্ণিতে একবার পড়লে চিহ্ন থাকবে না তোমার। খণ্ড-বিখণ্ড হ'য়ে যাবে।'

চমকে ওঠে সীমাচলম। ওর গুরুজন থাকলে হয়ত ঠিক এইভাবে সাবধান করে দিতো ওকে—এমনি গম্ভীর গলায় আর অধঃপতনের ঠিক পূর্ব্বাহ্ণেই। হদিস পায় না সীমাচলম। মা পানের কাকাকে ঠিক এইভাবে যেন কল্পনাও করতে পারেনি। গ্রাম্য ডাক্তার টোটকাটুটকি আর ঝাড়ফুঁকই শুধু ভরসা। পুলিশের তাড়া খেয়ে মা পানের চোরাই মাল লুকোবার একমাত্র আস্তানা এর বাড়ি। এই ধরনের কথাবার্তা বেমানান এঁর মুখে।

আরো কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা। ঝাঁকড়া ডালপালার মধ্যে দিয়ে দু' একটা তারা নজরে আসে। ঝিঁঝিঁর একটানা সুর। থমথমে স্তব্ধতা।

আল ছেড়ে কাঁচা রাস্তায় নামে দুজনে।

'এদেশে আসার উদ্দেশ্য ?'

থেমে পড়ে সীমাচলম। কি ওর উদ্দেশ্য সাগর পার হয়ে অচেনা মুল্লুকে আসবার। একটা অহেতুক খামখেয়াল ছাড়া এ পাড়ি দেওয়ার আর কি কৈফিয়ৎ থাকতে পারে। আগুন জ্বলে উঠেছিলো বুকে, সেই তপ্ত দাহে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের মত ছুটে বেড়াতে ইচ্ছা হয়েছিলো দেশ থেকে দেশান্তরে। কিন্তু এ সমস্ত কথা বলা যায় নাকি কাউকে।

'এ মুল্লুকে আসলে কেন ?' আরও গম্ভীর গলার স্বর।

এ স্বর উপেক্ষা করতে সাহস পায় না সীমাচলম। আলগোছে উত্তর দেয় ছোট্ট করে, 'আজ্ঞে, ভাগ্য-অন্বেষণে।

'ওঃ, শুনেছিলে বুঝি চুনি-পান্নার দেশ এটা! চাল পেট্রোল আর কাঠে ঠাস-বোঝাই। ব্যবসায়ে নামলে রাতারাতি লক্ষপতি হবে আর মোটা মাইনের চাকরির ছড়াছড়ি—মোটর হাঁকাবে আর স্ফূর্তি করবে এই দেশের

মেয়েগুলোকে নিয়ে,—কেমন এই তো! কিন্তু এই দেশের ভেতরটা দেখেছো কোনদিন—যেখানে দাউ দাউ করে আগুন জলছে আর সেই আগুনে লক্ষ লক্ষ দা আর ভোজালি তেতে লাল হয়ে আছে। ভেবেছো কোনদিন এমন একটা জাগরণ আসতে পারে এদেশে যার তুলনায় থারাওয়াডির বিদ্রোহ একটা স্ফুলিঙ্গ মনে হবে। এইসব সরল হাসিখুশি আর আত্মভোলা বর্মীজাতের ভেতরে বিরাট শৃঙ্খলাবদ্ধ এক একটা দৈত্য বাস করছে। যেদিন শেকল ভেঙে তারা ছুটে আসবে সেদিন শাসকরা সাবধান! আর সাবধান তোমরা যাদের সাহায্য নিয়ে বর্মাবিজয় সম্ভব হয়েছিলো।'

থর থর করে কেঁপে ওঠে সীমাচলমের পা দুটো। পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা একটা শিহরণ। মাথাটা ঝিম ঝিম করে ওঠে। ঠিক এভাবে কোনদিন ভাবেনি সীমাচলম, কেউ তাকে ভাবতেও শেখায়নি। কোন একটা দেশ কেউ জয় করে, কিন্তু সেই দেশ আবার কেড়ে নিতে হবে তাদের কাছ থেকে এ চিন্তা এমন ব্যাপকভাবে কোনদিন করেনি সীমাচলম। এ কোন ব্যক্তিবিশেষের বা ধর্মবিশেষের চিন্তা নয়—এ একটা জাতির চিন্তা। কি গভীর বেদনা থেকে এ চিন্তার জন্ম ভেবে দিশা পায় না সীমাচলম।

'পারবে?'

'কি?'

'এই সংগ্রামে এদের পাশাপাশি দাঁড়াতে? 'কালা' বলে তোমাদের এরা কেন এতো ঘৃণা করে জানো? এদের মাঠের ফসল কেটে নিজের গোলায় তোলো তোমরা, এদের বৌ-ঝিদের টাকার জোরে নিজেদের কুক্ষিগত করো। এদের দেশ শোষণ করো পুরোমাত্রায়,—কিন্তু কোনদিন এদের দুঃখ-দরদে পাশে এসে দাঁড়াও না। কাজেই বিদেশী শাসকদের

থেকে আলাদা করেও এরা তোমাদের কোনদিন দেখতে পারে না। এদের চোখে তারাও যা তোমরাও তাই।'

'এদেশ সম্বন্ধে বেশী কিছুই জানি না আমি। আপনি যা বল্লেন তাই যদি সত্যি হয়, তবে ভারতীয়দের খুবই অন্যায় বলতে হবে।'

'হ্যাঁ, আমার প্রত্যেকটি কথা বর্ণে বর্ণে সত্যি। চোখ খুলে এদেশে বাস করলে সবই বুঝতে পারবে।'

একটা বাঁক। এটা পার হ'লেই একেবারে মা পানের কাকার বাড়ির ফটকে গিয়ে পৌঁছবে তারা। একটু থেমে পিছিয়ে আসেন মা পানের কাকা। সীমাচলমের পাশ ঘেঁষে দাঁড়ান, তারপর খুব চুপি চুপি ফিস ফিস করে বলেন, 'এখানে থাকো। তোমাকে আমার প্রয়োজন আছে।' কথাগুলো বলেই সোজা রাস্তা ধরে হন্ হন্ করে অন্যদিকে এগিয়ে যান।

বাড়ি ফিরতেই হৈ চৈ করে ওঠে মা পান, 'কোথায় গিছলে বলো তো। বিদেশ বিভুঁই—এতো রাত পর্যন্ত, ভেবেই সারা হচ্ছিলুম।'

ম্লান হাসে সীমাচলম। ওর জন্যে ভাবে মা পান! ওর দেরি হলে ভাবতো শুভলক্ষ্মী। এরা শুধু ভাবেই—প্রয়োজন হলে পাশে এসে দাঁড়াতে পারে না সব ছেড়ে। না, মা পানও নয়। সীমাচলমকে শুধু প্রয়োজন হয়েছিল তার—প্রহরী হিসাবে। পুলিশের হাতে পড়লে নির্বিচারে তার দিকে আঙুল দেখাতে একটুও দ্বিধাবোধ করতো না মা পান। মা পান কি জানে? সে তো মেয়েছেলে। এই পোঁটলা-পুঁটলি ওই পুরুষটিই নিয়ে চলেছে, সে শুধু চলেছে সঙ্গে।—ব্যাস কোন দিক দিয়ে কোনরকমে অসুবিধা হোতো না। পুলিশের নেকনজরে সীমাচলমের হয়ত জুটতো হাজতবাস আর মা পানের কিছু মাল বরবাদ হোত। এই পর্যন্ত।

কিন্তু কোন কথা বলে না সীমাচলম। মা পানের পাশ কাটিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে। ঘরে ঢুকেই কিন্তু টের পায় মা পানও এসেছে পিছনে পিছনে।

'কাল ভোরেই বেরিয়ে পড়তে হবে। তৈরী থাকবে।'

চমকে ওঠে সীমাচলম, 'কাল ভোরেই ?'

'হ্যাঁ চিঠি এসেছে আলিমের। আহা অসুখে পড়েছিলো বেচারী, তাই উত্তর দিতে দেরি হ'য়ে গেলো।'

'পুলিশের ব্যাপারের কি হলো ?' কথাটার ওপর খুব জোর দেয় না সীমাচলম।

'হুঁ, হবে আবার কি! খানাতল্লাসী ক'রে তারা ফিরে গেছে। এবারে মালপত্তর নিয়ে হাজির হব আমরা।'

কোন উত্তর দেয় না সীমাচলম। জানলার গরাদ ধরে চেয়ে থাকে বাইরের দিকে। বাইরে নীরন্ধ্র অন্ধকার। এমনি অন্ধকার বুঝি নামবে ওর জীবনে। কোথাও একটু আলোর কণামাত্রও নেই। এ অন্ধকারের যেন শেষ নেই—ওকে হয়ত গ্রাসই করবে এই তমিস্রা।

বাইরে থেকে মুখ ফেরায় সীমাচলম। মা পান দাঁড়িয়ে আছে তার দিকে চেয়ে। কেরোসিনের ম্লান আলোয় পাণ্ডুর দেখাচ্ছে তার মুখ—বিষণ্ণ আর নিষ্প্রভ। মায়া হয় সীমাচলমের। ওকে সম্বল করেই এই দূরপথে পাড়ি দিয়েছিলো মেয়েটি—ফিরে যাবে একলা ?

আস্তে উত্তর দেয় সীমাচলম, 'কাল ভোরে তৈরী থাকবো। আমার জন্য চিন্তা করো না।'

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে যায় মা পান।

বিছানায় শুয়ে ছটফট করে সীমাচলম। রাশি রাশি চিন্তা ভাবনার যেন শেষ নেই। সত্যিই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কোকেনের চোরা ব্যবসা

আর জুয়া এই কি তার জীবনের পরিধি! পুলিশের তাড়া খেয়ে খেয়ে এইভাবে পালানোর কোথায় শেষ? আলিমকে মনে পড়ে আর গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সাপের মত শান্ত দুটি চোখ কিন্তু চাউনিতে যেন বিষ সঞ্চারিত হয় সারা দেহে। মা পানের সঙ্গে মেশামিশি মোটেই ভাল চোখে দেখে না সে। মা পানকে মাঝখানে রেখে দ্বন্দ্বযুদ্ধই বুঝি শুরু হবে একদিন। এ সমস্ত কিন্তু চায়নি সীমাচলম। যে শুভলক্ষ্মীকে নিজের রক্তবিন্দুর চেয়েও আরও গভীরভাবে ভালোবাসতো, এদের আওতায় পড়ে তাকে ভুলে যেতে আরম্ভ করেছে। শুভলক্ষ্মীকে ভোলা ছাড়া আর কি পথই বা আছে, তবে এভাবে তাকে ভুলতে চায়নি সে। তার জায়গায় অন্য কাউকে বসিয়ে তাকে নামিয়ে দেবে বিস্মৃতির অতলগর্ভে—তা অসম্ভব। তার চেয়ে এই ভালো। মনকে একেবারে ঘুরিয়ে দেওয়া এই পরিবেশ থেকে। মা পানের কাকার কথাগুলো রক্তে দোলা দেয়। জীবনের এই দিকটার সঙ্গে কোনদিন পরিচয় ছিল না তার। মন্দ কি নতুনতরো এক খেলা—শুভলক্ষ্মী ভেঙে চুরমার হয়ে যাক।

আচমকা কড়া নাড়ার শব্দে বিছানায় উঠে বসে সীমাচলম। মা পান আসলো আবার। বিরক্ত হয়ে ওঠে।

না, মা পান নয়। দরজা খুলেই সে পিছিয়ে আসে। সামনেই মা পানের কাকা। ঠিক তার পিছনে দাঁড়িয়ে খুড়ী। দুজনেরই মুখ অত্যন্ত গম্ভীর। দরজা খুলতেই ঢুকে পড়েন মা পানের কাকা। তারপর খুড়ী ঘরে ঢুকতেই তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দেন দরজাটা।

স্বল্প পরিসর খাটের ওপরে ঘেঁষাঘেঁষি বসে তিনজনে।

'তুমি কি ঠিক করলে?' মা পানের কাকার গলা.

'আপনার সঙ্গেই থাকবো।' সব ঠিক করে ফেলেছে সীমাচলম। সংশয়ের দোলায় দুলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ঢেউয়ের মাঝখান থেকে কোন

একটা আশ্রয় চায়—যে কোন একটা চর। পায়ের তলায় ধ্বসে যাওয়া বালুচরই যদি হয়—ক্ষতি কি?

'তাহলে মা পানের সঙ্গে যাওয়া চলবে না তোমার।'

'কিন্তু কি বলা যায় তাকে?' এদিকটা যেন ভেবেই দেখেনি সীমাচলম।

'তাকে যা বলবার আমিই বলবো।' এই প্রথম কথা বলে খুড়ী।

ম্লান আলোয় বিবর্ণ দেয়ালে দীর্ঘতর হয়ে পড়ে কালো কালো ছায়া। কাঁপে ছায়াগুলো। সীমাচলমের বুকটা ঢিপ ঢিপ করে ওঠে। আর এক অজানা পথ—কোথায় শেষ কে জানে, তা হোক, নতুনত্বের আস্বাদ পাওয়া যাবে। মন্দ কি!

'তাহলে এখনি তোমাকে তো রওনা হতে হয়।'

রওনা? আবার কোথায় যেতে হবে তাকে গভীর এই রাত্রে। শেওলার মত ভেসেই বুঝি বেড়াতে হবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়।

'কোথায় যেতে হবে?' শান্ত আর নিস্তেজ গলার স্বর।

'পরে জানতে পারবে। তোমার জিনিসপত্তর নিয়ে এখনই বেরিয়ে পড়ো। পিছনের রাস্তায় মোষের গাড়ী তৈরী আছে, ঠিক জায়গায় নিয়ে যাবে।'

'কি আর জিনিসপত্তর!' পোশাকের পুঁটলিটা কাঁধে ফেলে নেয় সীমাচলম। নতুনত্বের নেশা ওকে পেয়ে বসেছে।

'আমি তৈরী।'

'বেশ, এসো তাহলে।'

মোমবাতি জেলে পথ দেখায় খুড়ী। মোমবাতির কম্পমান শিখায় সব কিছু কাঁপতে থাকে। পাশের ঘরে শুয়ে আছে মা পান। দরজা পার হবার সময় তার নিঃশ্বাসের গভীর শব্দ শুনতে পায় সীমাচলম। নিশ্চিন্ত

আরামে ঘুমোচ্ছে মা পান। আলিমের খবর এসেছে। তার জীবনের চিরসাথী আলিম। গ্রাম্য পরিবেশ ছেড়ে এবার শহরে চলে যেতে পারবে।

খিড়কি দরজা দিয়ে মাঠে নেমে পড়ে তিনজনে। কালো আকাশে অজস্র তারার সমাবেশ। তার মধ্যে জ্বল জ্বল করে উঠছে শুকতারাটি। অন্ধকার একটু পাতলা হয়ে আসছে। হাওয়া উঠেছে। বাঁশপাতার মধ্য দিয়ে আর উল্টানো ডিঙির গলুইয়ের ভিতর দিয়ে কেঁদে কেঁদে ওঠে বাতাসের শব্দ।

কাঁচা রাস্তার ওপরেই মোষের গাড়ি একটা। অন্ধকারে খুব ভালো করে কিছু ঠাওর হয় না। মোমবাতির অস্পষ্ট আলোয় শুধু গাড়ির ছইটা নজরে পরে। গাড়িতে উঠে বসে সীমাচলম।

'আপনার সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে?' সীমাচলমের গলার স্বর গাঢ় হয়ে আসে।

'মা পান আজ ভোরেই চলে যাবে—দিনকতক বাদেই নিয়ে আসবো তোমাকে।'

'মা পান শহরে গিয়ে পৌঁছলে তারপর।' এই সঙ্গে যোগ করে দেয় খুড়ী।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। মরিয়া হ'য়ে বলে ফেলে সীমাচলম, 'একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি?'

'বলো।'

'আপনি কি সত্যিই ডাক্তার—মা পানের কাছে যা শুনেছিলাম?'

'হতে বাধা কি!'

'বাধা নেই কিছুই, কিন্তু আমার যেন মনে হয় এ সমস্ত আপনার ছদ্মবেশ। এই টোটকাটুটকি আর গাছগাছড়ার ওষুধপত্তর।'

মোমবাতির আবছা আলোতেও জ্বলে ওঠে মা পানের কাকার চোখ-দুটো, কপালের শিরাগুলো ফুলে ওঠে। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা সজোরে কামড়ে ধরেন।

ভয় পেয়ে যায় সীমাচলম। কিন্তু অদম্য কৌতুহল সমস্ত কিছু বাধা ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। আজ আর কোন লুকোচুরি নয়। নতুন পথে পা দেওয়ার এই সন্ধিক্ষণে সব কিছু ওর কাছে পরিষ্কার হয়ে যাক।

'অন্যায় করেছি কি ?'

'কিসের অন্যায় ?'

'এই সমস্ত কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে ?'

'না অন্যায় আর কি। ডাক্তার আমি সত্যিই—তবে ডাক্তারী আমি করি না।'

'তবে গভীর রাত্রে যারা আসে আপনার কাছে, তারা আপনার রোগী নয় ?'

ঝুঁকে পড়েন মা পানের কাকা। হাত দিয়ে চেপে ধরেন সীমাচলমের মণিবন্ধ। সীমাচলমের মনে হয় যেন হাতের হাড়গুলো পিষে যাবে ওর—সশব্দে গুঁড়িয়ে যাবে।

'তুমি এসব জানলে কি করে ?'

'প্রথম রাত্রে ঘুম হয়নি। আপনার ঘরে অনেকগুলো লোকের কথাবার্তা শুনেছিলাম আমি। তার আগেই মা পান বলেছিলো এই অদ্ভুত সময়ে নাকি রোগী দেখেন আপনি।'

'না রোগী নয় তারা—তারা আমার দলেরই লোক। সময়ে সবই শুনতে পাবে। সীমাচলমের হাতটা ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ান গাড়িতে ভর দিয়ে।

'আরো একটা কথা।' সব কিছু জানতে চায় সীমাচলম।

'কি ?'

'খুড়ী যে এভাবে থাকেন এটাও কি ছদ্মরূপ তাঁর ?'

'সব কিছু জানবার প্রয়োজন নেই এখন। তবে এইটুকু শুনে যাও ইনি আমার স্ত্রী নন।'

'স্ত্রী নন আপনার ?' ভয়ার্ত গলার স্বর সীমাচলমের। কি অদ্ভুত-ভাবে ভেসে চলেছে সে এক রহস্য থেকে অন্য রহস্যে।

'থারাওয়াড়ি বিদ্রোহের নাম শুনেছো ? শেয়া শান যিনি এই বিদ্রোহের প্রাণ ছিলেন ? ইনি তাঁরই একমাত্র ভগ্নী। এঁর স্বামীকে পুলিশের লোকেরা কিরিচ দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে। ইনি স্বামীর তর্পণ করার জন্যই বেঁচে আছেন আজো।'

অসংখ্য প্রশ্ন ভেসে আসে সীমাচলমের মনে। অনেক কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে তার। সমস্ত কিছু যেন একটু একটু করে পরিষ্কার হয়ে আসছে, তবু অনেক কিছু অনুদ্‌ঘাটিত রয়েছে এখনও। সব কিছু জানার অবকাশ হবে কি তার ?

কিন্তু আর নয়। গাড়ি ছেড়ে সরে দাঁড়িয়েছেন মা পানের কাকা। মোমবাতি হাতে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে খুড়ী।

মোষের গলার ঘণ্টাটা অদ্ভুতভাবে বেজে চলেছে। তালে তালে পা ফেলছে তারা। কাঁচা রাস্তায় থপ থপ একটা আওয়াজ আর চাকাগুলোর আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ।

তখনও দাঁড়িয়ে আছেন মা পানের কাকা। খুড়ীর হাতের মোমবাতির কম্পমান আলোয় বীভৎস দেখায় তাঁর কপালের বলিরেখা আর মুখোসের মত ভাবলেশহীন মুখ। এলোমেলো চুলের রাশ। বার্ধক্যের কালো ছায়া মুখের প্রতি লোমকূপে।

বাঁশের ঝাড় বাঁ দিকে রেখে বাঁক ফেরে গাড়ি।

যত সাম্পান আর বজরাগুলোর ভিড় এদিকটায়। একেবারে পাড়ে এসে ভিড়ে না, কাছ বরাবর এসে নোঙর ফেলে। কাঠের তক্তা ফেলে কিম্বা কোমর জল পার হয়ে পৌঁছোতে হয় বজরায়। নদী উপনদীর শাখা প্রশাখা বেয়ে অনেক দূর গ্রামান্ত থেকে আসে এই সব সাম্পান—কেউ আনে ধান, কেউ মসলাপাতি, কেউ বা অন্য কিছু। দূরে সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারে কালো দেখায় চরের সীমানা। প্রকাণ্ড চর—অনেক বছর ধরে তিল তিল করে পলিমাটি পড়ে পড়ে নদীর বুক ফুঁড়ে উঠেছে।

নানারকমের আগাছা, কাশফুল আর শিশু গাছে ঢাকা এই চরকে বসতিহীন বলেই মনে হয় প্রথমে, কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গেই ইতস্তত জ্বলে ওঠে আলোর বিন্দু। চরকে আর প্রাণহীন মনে হয় না।

কয়েকঘর মাত্র জেলের বাস এখানে। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই ডিঙি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে এরা—খাল, নদী পেরিয়ে একেবারে মার্টাবান উপসাগরের মুখে গিয়ে হাজির হয়। ঢেউয়ের ধাক্কায় টলমল করে ওঠে ডিঙি, আর জেলেরা রুপালী জাল ছড়িয়ে দেয় উপসাগরের সবুজ জলের উপরে। সারারাত সাগর ছেঁচে জীবিকা আহরণের চেষ্টা চলে—অবিরত চলে ঢেউয়ের সঙ্গে সংগ্রাম।

ঠিক এমনি জীবনই তো সীমাচলমের। একটা সাম্পানের ওপর বসে বসে ভাবে সীমাচলম। সারা জীবন শুধু সংগ্রাম—ঢেউয়ের ধাক্কায় ওর সাম্পান তো টলমল করছে অবিরত। হয়ত বিরাটতর কোন ঢেউয়ের ঝাপটায় অতলে তলিয়ে যাবে একদিন। সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গেই নিবিড় কালো হয়ে আসে নদীর জল। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে সীমাচলম। তারপর একসময়ে জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দে চমকে মুখ ফেরায়।

নদীর জল ভেঙে কে একজন আসছে এদিকে। হাতের টর্চটা জ্বালিয়ে সেই দিকে ফেলতেই বুঝতে পারে কো টিন আসছে সাঁতরে। তার জন্যই এতক্ষণ অপেক্ষা করে ছিলো সে। এত দেরি করলো যে কো টিন? সন্ধ্যার আগেই তো আসবার কথা ছিলো তার।

লুঙ্গিটা নিংড়োতে নিংড়োতে সামনে এসে দাঁড়ালো কো টিন।

'এত দেরি যে? অনেকক্ষণ বসে আছি আমি।'

'পথে এদটু দেরি হ'য়ে গেলো। ইস্লুফ সাহেবের বিবি আর ছেলেটার কলেরার মতন হ'য়েছে। ইস্লুফ সাহেবও নেই এখানে, তাই দেখাশুনা করে এলুম একটু। আশেপাশের লোকগুলো দিব্যি হাত পা গুটিয়ে বসে আছে। দু-একজনকে ডাকতে স্পষ্টই বললো—ও সব ছোঁয়াচে রোগ ঘাঁটতে কে যাবে বলো! পরের রোগ বাড়িতে বয়ে এনে ছেলেপিলের সর্বনাশ করবো শেষে।'

হাসে সীমাচলম। এ বিষয়ে সব প্রাচ্যদেশই বুঝি এক। পরের রোগ ঘরে টানতে কেউ রাজী নয়।

'খবর কি?'

'সাড়ে আটটায় বৈঠক বসবে আজকে। হাজির থাকবেন আপনি।'

'হাজির তো থাকতেই হবে। আচ্ছা, আমি উঠি। তুমি থাকো এখানে। রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ লাল বজরা আসবার কথা আছে।' সীমাচলম বজরা থেকে নামতে শুরু করে। কাঠের তক্তা পার হ'য়ে ডাঙ্গায় এসে ওঠে।

সত্যি ক্লান্ত মনে হয় নিজেকে। শুধু বৈঠক আর আলোচনা, গ্রাম ঘুরে ঘুরে সংবাদ সংগ্রহ আর সেই সংবাদ বহন করে আনা দলপতির কাছে—এইটুকুই তো কাজের পরিধি। কিন্তু কবে এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দাবানলের রূপ নেবে! কবে হবে খাণ্ডবদাহন? আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত লাল হয়ে উঠবে লেলিহান শিখায়?

হন হন করে আরো এগিয়ে যায় সীমাচলম। এখনো অনেকটা পথ। পাহাড়ের একেবারে গা ঘেঁষে গাঁয়ের স্কুলবাড়ী—এদেশী ভাষায় বলে চাউঙ্গ। সেখানে রাত্রে গুটি কতক ছাত্র নিয়ে পালি ত্রিপিটক আর বৌদ্ধ শাস্ত্র পড়ান বৃদ্ধ আ ঠুন। অবশ্য বাইরের জগৎ এই কথাটাই জানে। কিন্তু কি শাস্ত্র সেখানে পড়ানো হয় ভালো করেই জানে সীমাচলম।

ভিতরে ঢুকেই একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে সীমাচলম। সবাই এসে গিয়েছে। জুতোটা খুলে রেখে সে-ও আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

গুটি ছয়েক লোক। প্রত্যেককেই চেনে সীমাচলম। মাসে একবার দু'বার করে দেখা হয় এদের সঙ্গে। সকলেই কর্মী। একটু দূরে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে' আ ঠুন। পরনে লম্বা কালো কোট আর সেই রংয়েরই ফুল প্যান্ট। ডান হাতটা কোলের ওপর নিস্পন্দভাবে পড়ে রয়েছে। বাঁ হাতটা কনুই পর্যন্ত কাটা—অনেক বছর আগে কোন পুলিশ সাহেবের গুলিতে জখম হয়েছিল, বাকী অংশ হাসপাতালেই রেখে আসতে হয়েছে। হাতটার জন্য এখনও মাঝে মাঝে আক্ষেপ করেন আ ঠুন। বাঁ হাতটাই সব ছিল তাঁর। এই হাতে পিস্তল থাকলে একশ গজের মধ্যে এগোবার সাহস ছিল না কারুর। যাক, ডান হাতটা অনেকটা পটু হ'য়ে এসেছে। মুখোমুখি একবার দাঁড়াতে পারলে আবার পরীক্ষা হবে।

সীমাচলম ঘরে ঢুকতেই মুখ তোলে আ ঠুন, 'এসো। বজরা এসেছে নাকি?'

'আজ্ঞে না, খবর পেলাম রাত বারোটা একটার আগে বোধ হয় আসবে না।'

'হুঁ, কো টিনকে বলে এসেছো থাকতে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, কো টিন বসে আছে বজরায়।'

ডান হাতটা আস্তে আস্তে মুঠো করেন আ ঠুন। কপালের শিরাগুলো স্ফীত হয়ে ওঠে, কুঞ্চিত হয়ে আসে দুটি চোখ। কি একটা ভাবছেন তিনি। অনেকক্ষণ পরে কথা বলেন, খুব থমথমে গলার স্বর—'তোমাকে আমাদের দেশের ভাষাটা আরো ভালো করে শিখতে হবে। ঠিক পার্বত্য অঞ্চলে যে ঢংয়ের কথা বলা হয় সেই ঢংটা আয়ত্ত করতে হবে, না হলে চাষী-মজুরদের ভেতরে কাজ করার অসুবিধা হবে। আমার ইচ্ছা শান স্টেটে তোমায় পাঠিয়ে দেবো। ওই দিকটা আমাদের লোকজন নেই বিশেষ, অথচ খুব বিশ্বাসী একজন লোকের প্রয়োজন সেখানে। চীন-সীমান্ত থেকে অনেক মালপত্তর পাহাড়ের পথ দিয়ে খচ্চরের পিঠে করে আসে মাঝে মাঝে. সেই সব জিনিস নির্বিঘ্নে চালান দিতে হবে ভিতরে, পুলিশের চোখ এড়িয়ে। ফুকলিমকে রাখা চললো না সেখানে—পুলিশ তাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে। তাকে মৌলমিনে সরিয়ে দিয়েছি। তুমি দিন চারেকের মধ্যেই রওনা হয়ে পড়বে।'

এ অনুরোধ নয় এ আদেশ। এর বিরুদ্ধে কোন আপত্তি চলে না, কোন প্রতিবাদ তো নয়ই। চুপ করে শোনে সীমাচলম। খড়ের কুটোর মতন ভেসে চলেছে এক তরঙ্গ থেকে আর এক তরঙ্গে। এই খড একদিন সবুজ তৃণ ছিল, সতেজ আর মসৃণ ছিল এক সময়ে—একথা যেন ভাবাই যায় না।

মুখটা তুলেই সীমাচলম দেখে আ ঠুনের দৃষ্টি ন্যস্ত তারই ওপরে। সাপের মত নিস্পলক দৃষ্টি, কটা দুটি চোখের তারায় অপূর্ব দীপ্তি আর মাদকতা। সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করে ওঠে। ওর কি মত তাই বুঝি জানতে চায় আ ঠুন। কি আবার মত হতে পারে ওর? সাধ্য কি ওর প্রতিবাদ করবে এই আদেশের—বলবে—না এভাবে নিজের জীবনকে খণ্ড খণ্ড করতে পারি না আমি। তোমাদের এ আগুন থেকে আমায় অব্যাহতি

দাও। আমি বাঁচতে চাই আরো পাঁচজনের মত—এ রুদ্র গৈরিকের আবরণ আমার নয়—বিভূতি আর রুদ্রাক্ষের মালা নাও তোমরা খুলে। আমি ক্লান্ত। আমি বিধ্বস্ত।

এ সমস্ত কথা বলে না সীমাচলম। এসব কথা বলার ফল কি হতে পারে তাও অজানা নেই তার। একটু বারুদের গন্ধ তারপর মাটিতে লুটিয়ে পড়ে থাকবে ওর লাস। সাইলেন্সর দেওয়া পিস্তলে আওয়াজও হবে না একটু। আ ঠুনের আদেশ অমান্য করে এ পর্যন্ত বাঁচেনি কেউ।

এগিয়ে যায় সীমাচলম, 'যেদিন আদেশ করবেন সেই দিনই রওনা হবো আমি।'

'বেশ, বেশ।' ঘাড় নাড়ে আ ঠুন। ভারি খুশি মনে হয় তাকে। ডান হাতটা নেড়ে নেড়ে বলে—'ভারতবর্ষ আর চীনের মাঝখানে এই বর্মা দেশ। ঐতিহ্য আর সংস্কৃতিতে এই দুই দেশের তুলনা হয় না। অসংখ্য বন্ধুর পার্বত্য পথ আর গিরিরন্ধ্র দিয়ে অনবরত চলেছিল সংস্কৃতির আদান-প্রদান। আজো প্যাগোডায় খোদিত শিলালিপিতে, শহরের নামে, দেশবাসীর আচারের মধ্যে এই সংস্কৃতির পরিচয় রয়ে গেছে। এবার নতুন অধ্যায়ের শুরু, রাজনৈতিক জন-জাগরণের কাজে তুমি রয়েছ ভারতবাসী আর আমি রয়েছি চীন—এদের জীবনে নতুনতর এক অধ্যায়ের সূচনা করবো আমরা।'

সীমাচলমের মনে হয়—ও কি যোগ্য এ সব কাজের? জানে কি আ ঠুন—শুধু এক তরুণীর স্মৃতিকে ভোলবার জন্য সাগর পার হয়ে এসেছে সে? কোন দিন ভেবে দেখেনি দেশের এই বিরাট রূপ—এই পরিব্যাপ্তি। কতো দুর্বল ও। এই বিরাট দায়িত্বের ভারে ও তো গুঁড়িয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। মাদ্রাজের অখ্যাত পল্লীর এক সন্তান—নিজের দয়িতাকে ছিনিয়ে আনবার মত সাহস যার ছিল না—সে আনবে ছিনিয়ে স্বাধীনতা

বৈদেশিক শক্তির কবল থেকে? লক্ষ মানুষের মধ্যে আনবে জন-জাগরণ?

আ ঠুনকে সিকো করে বাইরে চলে আসে সীমাচলম। এবার বৈঠক বসবে আ ঠুনের। সে বৈঠকে আজ থাকবার দরকার নেই সীমাচলমের। গভীরতর তত্ত্ব আলোচিত হবে সেখানে—জাতির ভাঙাগড়ার ইতিহাস।

পাংলাং পাহাড়শ্রেণীর কোলে ছোট্ট আর পরিচ্ছন্ন শহর হোকপান। পাহাড়ের সানুদেশ জুড়ে বিস্তৃত আলুর চাষ। আলু ব্যবসায়ী দু-একজন শুধু ফসলের সময়টা থাকে এখানে। দর্মা আর কাঠে ঘেরা ছোট ছোট থাক থাক বাড়িগুলো জুড়ে কেবল শানদের বসতি। বর্মীদের চেয়েও আরো স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা, আরো যেন কোমল।

একেবারে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে আবদুল গণি সাহেবের বাংলো। আবদুল গণি সুদূর গুজরাট প্রদেশের লোক—ব্যবসার সম্ভাবনায় এখানে এসে পত্তন করেছেন। তাঁর আর এক ভাই আছেন রেঙ্গুন শহরে। তিনি এখান থেকে আলু চালান দেন ভাইয়ের কাছে। আলুর ব্যবসার জালের দুটি প্রান্ত ধরে আছেন দুটি ভাই। প্রচুর টাকা কামিয়েছেন দুজনে। বর্মা দেশে আলু বলতে গণি সাহেব আর তার ভাইকেই বোঝে সকলে। ব্যবসা ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না এঁরা। এ হেন গণি সাহেবের সঙ্গে আ ঠুনের আলাপ হল কি করে, এও একটা ভাববার বিষয়। কি করে আলাপ হয়েছিলো গণি সাহেবের মুখেই শুনলো সীমাচলম। একই হাসপাতালে ছিলো দুজন পাশাপাশি। হাতে গুলি লেগে হাসপাতালে ছিলো আ ঠুন, আর তার বিছানার পাশেই ছিলেন আবদুল গণি অ্যাপেন-ডিসাইটিস অপারেশন করবার জন্য। সেই সময় পরিচয় হয়েছিলো দুজনের। গণি সাহেব শুনেছিলেন কোথায় যেন শিকার করতে গিয়ে আহত হয়েছিল

আ ঠুন। সঙ্গের বন্ধু শিকারীর গুলি এসে কব্জিতে বিঁধেছিলো তার। ব্যাপারটা বুঝতে পারে সীমাচলম। ইংরেজ রাজত্বে গুলি খেয়ে সেই অবস্থায় তাদের সীমানা পার হয়ে এই করদ রাজ্যে এসে উপস্থিত হয়েছিল আ ঠুন, এখানে শ-বোয়াদের (শান রাজা) প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালে এসে চিকিৎসা করেছিলো। দেরি করার ফলেই হয়ত পচে গিয়েছিলো হাতটা, কনুই থেকে কেটে বাদ দিতে হয়েছিলো।

আরো অনেক কথা শুনেছেন গণি সাহেব। সরকারের জরিপ বিভাগে না কি বড়ো কাজ করতো আ ঠুন। সেই কাজের জন্ত মাঝে মাঝে চীন-সীমান্তেও যেতে হতো তাকে। সেরে উঠে তাঁর বাংলোয় অনেককাল কাটিয়েছিলো আ ঠুন। সে সময়টাতেই বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়।

আপনার বলতে কেউ ছিল না গণি সাহেবের। অনেককাল আগে নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় তাঁর স্ত্রী। সেই থেকেই গণি সাহেব একলা। সারা বাংলোয় তিনি আর একটি যুবতী পরিচারিকা এদেশীয়া। দু-একদিনের মধ্যেই তাদের পরিচয়টা সহজ হয়ে আসে সীমাচলমের কাছে। আবার বিয়ে না করার হেতুটাও পরিষ্কার হয়। এ বিষয়ে কিন্তু গণি সাহেব কোন রকম লুকোচুরি করেন না। স্পষ্টই বলেন, 'এ না থাকলে তো মরে যেতাম আমি। এই বিদেশে এর ওপর নির্ভর করেই তো আছি। আমি মরলে সব কিছুই এর।' কথাটা বলতে বলতে কাছে দাঁড়ানো মেয়েটির নরম গালে আলতো টোকা মারেন। মেয়েটি লজ্জায় লাল হ'য়ে আসে—চোখ দুটো ছলছল করে। আস্তে বলে, 'পাইন গাছের মত দীর্ঘায়ু হন কর্তা। আরো একশ' বছরের আলুর ফসল তুলুন ঘরে।'

ভারি ভালো লাগে সীমাচলমের। মরুদগ্ধ প্রান্তরের মাঝখানে ঘন সবুজে ঢাকা ওয়েসিসের টুকরো। এই তো ছিলো ওর চিরদিনের কল্পনা—

পৃথিবীর নিরালা কোণে একটি নিভৃত নীড় আর পাশে মমতাময়ী এক নারী। চেয়ে চেয়ে আর আশ মেটে না সীমাচলমের।

কিন্তু এ আশ্রয়ে বেশী দিন থাকা চলে না। আকোর জরুরী চিঠি আসে, আ ঠুনের আদেশে তাকে রওনা হতে হবে সীমান্তে।

প্রায় দিন তিনেকের পথ। উৎরাই আর চড়াই ভেঙে ভেঙে পথ যেন দীর্ঘতর মনে হয়। পাইন আর ইউকেলিপটাসের ঘন বন—শুকনো পাতা মাড়িয়ে মাড়িয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রার শেষ নেই।

এখানেও চিঠি ছিল আ ঠুনের। পাহাড়ের চূড়ার ওপরে ওয়ারলেস স্টেশন—তারের শাখা-প্রশাখা অনেক দূর থেকেই চোখে পড়ে। এর পাশেই বা মঙ সাহেবের কোয়ার্টার। সেখানেই গিয়ে ওঠে সীমাচলম। বা মঙ এক কথার মানুষ। খাওয়া দাওয়া শেষ হতেই স্পষ্ট বলে তাকে, 'আপনাদের কাজ সম্বন্ধে আমি সবই জানি। আ ঠুন আমার মামা হন। তিনি কয়েক বছর ছিলেন এখানে। কিন্তু আমার বাড়িতে নানা কারণে আপনাকে থাকতে দেবার পক্ষে অসুবিধা রয়েছে। আমি সরকারের চাকর—এই আমার অন্ন সংস্থানের একমাত্র উপজীবিকা। কাজেই পুলিশের খানাতল্লাসীর ভারে চাকরি টিকবে না আমার। আমার পুরানো পরিত্যক্ত যে কোয়ার্টার আছে, সেখানেই থাকতে হবে আপনাকে—খাওয়া দাওয়ার অসুবিধা হবে না। আমার চাকর এখান থেকেই খাবার পৌঁছে দেবে। তবে দয়া করে আমার সঙ্গে আলাপের বিশেষ চেষ্টা করবেন না। এই চাকরি আমার ভরসা—এই চাকরি করে আমাকে বাপের দেনা শোধ করতে হবে। হুজুগে মাতবার আমার সময় নেই।'

অনাড়ম্বর, স্পষ্ট কথাগুলো বুঝতে অসুবিধা হয় না মোটেই। আ ঠুন বলেছিল প্রেরণা, আ ঠুনের ভাগ্নে বললো হুজুগ। বুদ্ধি দিয়ে যুক্তির বিচার করবার মত মনের অবস্থা নয় সীমাচলমের। হয়ত হুজুগ, হয়ত

প্রেরণা—কিন্তু তার কাজ তাকে করে যেতেই হবে। এই বিরাট জালে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে সে—এ বাঁধন কাটবার মত জোর আর সাহস তার নেই।

পাহাড়ের গায়েই পুরানো কোয়ার্টার। পরিত্যক্ত কোয়ার্টার সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ছাতের টিনগুলো ঝুলে পড়েছে নিচে। দেয়ালের কাঠগুলোর জায়গায় জায়গায় বেশ বড়ো রকমের ফাঁক। তবে ইতিমধ্যে ঝাড়পোঁছ করে কিছুটা যেন বাসোপযোগী করা হয়েছে। একটি মাত্র ঘর—কোন রকমে একটা মানুষ মাথা গুঁজে থাকতে পারে।

অবসন্ন শরীর নিয়ে এসব আর খুঁটিয়ে দেখবার ইচ্ছা হয় না সীমাচলমের। কোন রকমে বিছানাটা পেতেই শুয়ে পড়ে। সারাদিনের পরিশ্রম আর ক্লান্তির পরে ঘুম আসতে মোটেই দেরি হয় না।

মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে যায়। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় বুক পিঠের হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়। কাঠের ফাঁকে ফাঁকে নিজের জামাকাপড়গুলো গুঁজে দিয়ে আবার বিছানায় ঢলে পড়ে।

ঘুম যখন ভাঙে তখন বেশ কড়া রোদ উঠে গিয়েছে। কড়া নাড়ার শব্দে ধড় মড় করে উঠে পড়ে সীমাচলম। উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দেয়। দরজার সামনেই বা মঙ সাহেবের ছোকরা চাকর দাঁড়িয়ে। হাতে ট্রেতে চায়ের কেতলি আর প্লেট ঢাকা কি যেন রয়েছে। বাঃ, ওঠার মুখেই ধূমায়মান চা—দিনটা ভালোই যাবে আজ। বা মঙ সাহেবের আতিথেয়তার বিরুদ্ধে কিছু বলবার থাকতেই পারে না। শিমের বিচি ভাজা আর চা সহযোগে প্রাতরাশ শেষ করে সীমাচলম। তারপর পোশাক বদলে বাইরে এসে দাঁড়ায়।

পাহাড়ের পর পাহাড়—যতদূর চোখ যায় কেবল পাহাড়ের শ্রেণী। গাছে ঢাকা সবুজ পাহাড় নয়—রুক্ষ, কর্কশ, উষর। রোদের তেজে

বেশীক্ষণ চেয়ে থাকা যায় না। নিচে পাহাড়ের বুক চিরে আঁকাবাঁকা পথের রেখা। কোথাও জনমানবের সমাগম নেই। শুধু প্রকৃতির একচ্ছত্র রাজত্ব।

অনেক দূরে সাদা প্রস্তরফলক ঝলসে ওঠে সূর্যের আলোয়। ওখানে লেখা আছে বৃটিশ রাজ্য এখানেই শেষ। অপর পার থেকে চীন দেশ সুরু হলো। সেই প্রস্তর ফলকের পাশেই ছোট্ট টিনের শেড। কাস্টময়ের ঘর। ওখানেই যাত্রীদের মালপত্তর খানাতল্লাসী করা হয়। নিষিদ্ধ জিনিস থাকলে আটকানো হয় আর পাসপোর্ট পরীক্ষা করা হয়। এ সমস্ত খবর সে শুনেছিলো আ ঠুনের কাছে।

বাঁ দিকে পাহাড়ের ওপরে বেতারের দীর্ঘ দণ্ডটা ঝকমক করে উঠছে সূর্যের আলোয়। কত দূর দূরান্তের বার্তা ওরই মধ্য দিয়ে ভেসে চলে ইথারে ইথারে। ওই বেতার দণ্ডের সঙ্গে যেন মিল রয়েছে ওর। প্রদেশ থেকে প্রদেশান্তরে সংবাদ বহন করে বেড়ায়। শুধু সংবাদ নয়—ও বহন করে জিনিস—অপরিহার্য যে সব জিনিস বিদ্রোহের একান্ত সঙ্গী, পরাধীন জাতির পাশুপত অস্ত্র। কে জানে যদি জয়ী হয় এ সংগ্রাম—স্বাধীন বর্মার ইতিহাসে ওর নামও হয়ত থাকবে। হাতিয়ার চালান করেছিলো নির্ভীক-ভাবে সীমাচলম সুদূর চীন-সীমান্ত থেকে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে। সাগর পার হয়ে দাক্ষিণাত্য থেকে এই পুরুষ স্বাধীনতার মরণ পণ করে বর্মার মাটিতে পা দিয়েছিলো! আত্মীয় পরিজন সমস্ত পিছনে রেখে স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে সঞ্জীবিত করেছিলো জনসাধারণকে। স্বাধীনতার সংগ্রামের নির্ভীক সৈনিক সীমাচলম। হয়ত ঐ রকম এক প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ হবে এই সব কথাগুলো। চীন আর ব্রহ্ম সীমান্তের যাত্রীরা বিস্ময়ে মাথা নত করবে ওর অতুলনীয় শৌর্যের কথা ভেবে। কিন্তু কেউই জানবে না আসল কথাটা। দেশ স্বাধীন হোক আপত্তি নেই সীমাচলমের, পশুশক্তি

পরাজিত হোক আনন্দের কথা, কিন্তু এ পথ নয় সীমাচলমের। সে মুক্তি চায় এ বাঁধন থেকে—পরিপূর্ণ মুক্তি।

মাসে দুবার করে এই পথে জিনিস আসে। কাস্টম্‌সে লোক সতর্ক হয়ে ওঠে সেই সময়টা। পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে দেখা যায় ছোট ছোট টাট্টু ঘোড়া আর খচ্চরের সার। এরা আসে মাইল চল্লিশেক দূরের চীনের শহর থেকে। কাস্টমসকে ফাঁকি দিয়ে আমদানী করে চীনের বিখ্যাত সিল্ক আর কুখ্যাত কোকেন। এ ছাড়া আরও সমস্ত জিনিস থাকে তাদের সঙ্গে—সে সব জিনিস নিষিদ্ধ নয়। কাস্টমস্‌য়ের হাতে কিছু দিলেই ছেড়ে দেয় তারা।

সমস্ত নির্দেশ দেওয়া ছিল আ ঠুনের চিঠিতে। ঠিক দিনে পাহাড়ের বন্ধুর পথ ধরে অনেক এগিয়ে যায় সীলাচলম। কাস্টমসয়ের অফিস পিছনে রেখে ছোট পাহাড়টা ডিঙিয়ে আরো দূরে। ছোট্ট একটা পাহাড়ী ঝর্ণা। সরু রুপালী ফিতার মত শীর্ণ জলের ধারা—ধারে ধারে প্রকাণ্ড কালো কালো পাথরের রাশ। এদিকটা তবু কিছুটা গাছপালার আভাস আছে। ঝর্ণার পাশেই কমলালেবুর বন—তারই মধ্যে ছোট পায়ে চলা পথ। মাঝে মাঝে এই পথ দিয়ে দূরের গাঁ থেকে আসে সব লোক—বড় বড় পাহাড়ী ছাগল নিয়ে। দু একটা বাড়িতে দুধ দিয়ে আবার এই পথে ফিরে যায় তারা—সোজা পথে আসতে গেলে অনেকটা ঘুর হবে।

এই পথেই পা বাড়ায় সীমাচলম। দুধারে ঘন গাছের ঝোপ। বটগাছের মত ঝুরি নেমেছে কোন কোন গাছে—মোটা দড়ির মত জট। সেই জট ধরে নামতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। কিছুটা নামার পরেই কেলেমা জিদির বিরাট গাছ—এই গাছের নির্দেশও দেওয়া ছিল চিঠিতে। সেই গাছ বরাবর এসে দাঁড়িয়ে পড়ে সীমাচলম। ব্যস, আর কোন কাজ

নেই তার এখন—শুধু অপেক্ষা করতে হবে চীনদেশ থেকে সীমান্ত পার হয়ে যে লোকটি আসবে তার জন্য।

অনেকটা সময় কেটে যায়। গাছের ছায়ায় আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ে সীমাচলম। ভারি ঠাণ্ডা এই জায়গাটা—অনেকদূর থেকে পাহাড়ী ঝর্ণার ঝির ঝির শব্দটা ভেসে আসে আর কমলালেবুর মিষ্টি গন্ধ। নেশা আনে এই গন্ধ আর এই ছায়া আনে অবসাদ।

আচমকা একটা শব্দে ধড়মড় করে উঠে পড়ে সীমাচলম। ঘুমিয়ে পড়েছিলো। চোখ দুটো কুঁচকে চেয়ে থাকে পথের দিকে। অনেক দূর থেকে ঝর্ণার কলধ্বনির সঙ্গে আরো একটা কিসের শব্দ যেন ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসে।

কাছে আসতেই বুঝতে পারে সীমাচলম ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। ইতস্ততঃ ছড়ানো পাথরের টুকরোর ওপরে ঘোড়ার নালের ঠোকাঠুকিতে বিচিত্র শব্দ। কিছুক্ষণ পরেই দেখা যায় অশ্বারোহীকে। আপাদমস্তক কালো কাপড়ে ঢাকা, গলায় এবং মাথায় সাদা লোমের বন্ধনী। পাহাড়ী ঝর্ণার কাছ বরাবর এসে লাগাম টেনে ধরে সজোরে। ঘোড়াটা সামনের পা দুটো তোলে শূন্যে—তারপর একরাশ ধূলো উড়িয়ে নেমে আসে পায়ে চলা পথ বেয়ে। সীমাচলম এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় পথের মুখে। ঘোড়া থামিয়ে নেমে পড়ে লোকটি, তারপর সীমাচলমের সামনে এসে বিশুদ্ধ বর্মাভাষায় বলে, 'সংবাদ কুশল তো? অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে নাকি?'

'না, খুব অনেকক্ষণ নয়। আপনার কষ্ট হয়নি পথে?'

'কষ্ট ঠিক নয়—অসুবিধায় পড়ে গিয়েছিলুম একটু।'

'কি রকম?'

'এখান থেকে মাইল ত্রিশ দূরে প্রচণ্ড বরফ পড়া শুরু হয়ে গিয়েছে।

এ বছর যেন অনেক আগেই শীতটা পড়বে মনে হচ্ছে। বরফের মধ্যে ঘোড়া ছোটানো বড় বিপজ্জনক তাই ঘোড়া বেঁধে একটা সরাইখানায় অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

'বরফ পড়া শুরু হয়েছে এত কাছে, কিন্তু এখানে তো অল্প গরম রয়েছে।'

'এই সব পাহাড়ে দেশে এইরকমই হয়। পাহাড়ের চূড়ায় হয়ত প্রচুর বরফ পড়ছে অথচ নিচের দিকে উপত্যকায় দেখবেন ঝিক ঝিক করছে রোদ। এদেশের আবহাওয়া বড় বিশ্বাসঘাতক।'

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে লোমের টুপি আর অঙ্গাবরণ খুলে ফেলে। খর্বকায় প্রৌঢ় গোছের লোক। সারা মুখে গভীর বলিরেখা, মনে হয় ঘোড়ার পিঠে আর পাহাড়ে পাহাড়েই জীবনের বেশীর ভাগটা কেটেছে। হাতের দস্তানা খুলে ঘোড়াটাকে বাঁধে ছোট একটা গাছের সঙ্গে। তারপর সীমাচলমের দিকে চেয়ে বলে, 'একটু মাপ করবেন আমায়, বড্ড তৃষ্ণার্ত বোধ হচ্ছে। একটু জল খেয়ে আসি ঝর্ণা থেকে।'

সমস্ত ব্যাপারটা স্বপ্ন বলে মনে হয় সীমাচলমের। কোনদিন বোধ হয় কল্পনা করেনি—পাহাড়ের বুকে এমনি করে আত্মগোপন করে থাকবে আর পাহাড়ের পর পাহাড় পার হয়ে আসবে এক অশ্বারোহী বৃহত্তর জগতের সংবাদ বহন করে। ভাবতেও রোমাঞ্চ জাগে সীমাচলমের দেহে।

লোকটি মুখ-চোখের জল মুছতে মুছতে ফিরে এসে বসে সীমাচলমের গা ঘেঁষে। কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে সীমাচলমের দিকে, তারপর বলে, 'আপনি বুঝি সমতলভূমির বাসিন্দা? কোথায় বাড়ি আপনার?'

'আমাকে কোন্ জাত বলে মনে হয়?' প্রশ্ন করে সীমাচলম।

'আপনাকে—আপনাকে জেরবাদী বলেই মনে হচ্ছে?'

জেরবাদী কাকে বলে জানে সীমাচলম। ভারতীয় আর বর্মী রক্তের সংমিশ্রণে সঙ্কর জাতি হলো জেরবাদী।

'আমি কিন্তু খাঁটি ভারতীয়।'

'কোন প্রদেশের লোক বলুন তো?'

'মাদ্রাজের।'

'ও, তাই নাকি! আমাদের চোখে অবশ্য আপনাদের সব প্রদেশের লোককে একই রকম দেখি। আপনি অনেকদিন আছেন বুঝি এদেশে?'

'হ্যাঁ, তা প্রায় বছর তিনেক।'

'বছর তিনেক এমন কি বেশী। তার তুলনায় এদেশের ভাষাটাকে বেশ শিখেচেন তো।'

'আপনি কি চীনদেশীয়?' এবারে প্রশ্ন করে সীমাচলম।

'হ্যাঁ, চীনও বলতে পারেন, বর্মীও বলতে পারেন' হাসে লোকটি।

'মানে?'

'মানে, বাবা হচ্ছেন চীনদেশের আর মা এই দেশের মেয়ে। বিয়ের আগে বাবা 'পনি'র ব্যবসা কর্তেন।' বলে সস্নেহ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে নিজের ঘোড়াটির দিকে। তারপর কি মনে করে হঠাৎ উঠে যায়। ঘোড়ার পিঠের থলি থেকে ঘাসের গোছা বের করে ফেলে দেয় তার মুখের সামনে। 'আহা ভোর চারটে থেকে একটি দানাও পড়েনি এর পেটে!'

'চলুন এবার যাওয়া যাক ঘরের দিকে।' সীমাচলম উঠতে ব্যস্ত হয়।

'আর একটু অপেক্ষা করুন। কাস্টমস্য়ের লোকগুলো যায়নি এখনও। অন্য অন্য বারে কাস্টমস্য়ের অফিসের গা দিয়েই চলে যেতুম আমরা—ওই বড়ো পাহাড়ের তলায় গিয়ে মিলতুম ফুকলিম সাহেবের সঙ্গে। কিন্তু কাস্টমস্য়ের লোকগুলো সন্দেহ করতে আরম্ভ করলে। তবে ফুকলিমের দোষ ছিল বই কি? আফিংয়ের ঝোঁকে কথাটা সে বলেই ফেলেছিলো

কাস্টমস্য়ের লোকদের কাছে। ওদের সঙ্গে খুব ভাব ছিলো ফুকলিমের। প্রায় রোজ সন্ধ্যাতেই মদ আর জুয়ার আড্ডা বসতো। ফুকলিম এখন কোথায় বলতে পারেন?'

ফুকলিম এখন কোথায় জানতো সীমাচলম। কিন্তু বলা হয়তো সমীচীন হবে না এই ভেবে উত্তরটা এড়িয়ে যায়—'কি জানি, ঠিক বলতে পারি না!'

'আমি এই নতুন জায়গাটার নির্দেশ পেয়েছিলুম চিঠিতে, কিন্তু আরো বেশী শীত পড়লে তো এ জায়গাটা ঢেকে যাবে বরফে—তখন এই পথে ঘোড়া চালানো তো দূরের কথা, পায়ে হেঁটেও চলতে পারবেন না আপনি। সমস্ত গাছপালা বরফে সাদা হয়ে যাবে। অবশ্য শীতকালটা আমিও আসব না। সে সময়টা কাজ একটু মন্দা থাকে, আর নিয়ে আসারও ভারী অসুবিধা। তবে সেই সময়টা কাস্টমস্য়ের লোকদের কিন্তু খুব ফাঁকি দেওয়া যায়। বেচারারা দরজা জানলা বন্ধ করে কাঠের আগুন জ্বালিয়ে মদে বেহুঁস হয়ে থাকে।' বলতে বলতে হেসে ওঠে লোকটি। তারপর হাসি থামিয়ে বলে, 'চলুন এবার রওনা হওয়া যাক। আপনার নামটা আমি জেনেছি। আপনাদের লোকই জানিয়েছে আমাকে। আমার নাম হচ্ছে আঃ নি, মনে থাকবে তো?'

শুকনো শুয়োরের মাংস একতাল আর কয়েক ভরি আফিং—ঠিক জায়গায় ছাড়তে পারলে ভালোই রোজগার হবে আঃ নির। আর সীমাচলমের জন্য এসেছে পাঁচটা অটোম্যাটিক—বিভিন্ন অংশগুলো খোলা অবস্থায়। এগুলো নিয়ে যাবার লোক আসবে হোকপান থেকে। সেই লোক না আসা পর্যন্ত জিনিসগুলো থাকবে সীমাচলমের জিম্মায়।

রাত্রে পাশাপাশি শোয় সীমাচলম আর আঃ নি।

'এখানে আপনাকে কোন একটা ব্যবসা নিয়ে থাকতে হবে কিন্তু, নয়ত শুধু শুধু বসে থাকলে চট করে সন্দেহ করবে লোকে।'

'হ্যাঁ, ইতিমধ্যেই পাহাড়ী শানরা চেয়ে চেয়ে দেখে আমার দিকে। ওরা বোধ হয় বুঝতে পারে এ জায়গায় আমি বেমানান।'

'আচ্ছা ছবি আঁকা আসে আপনার? মাঝে মাঝে বিদেশীরা প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি আঁকতে আসে এখানে। পাহাড়ী ঝর্ণার কাছে বিরাট ক্যানভাস পেতে বসে। ছবি আঁকা জানা নেই?'

'ছবি আঁকা? না, আর তা ছাড়া দিনের পর দিন এতে কি আর ভোলে লোকে? দেখা যাক অন্য একটা উপায়।'

বা মঙের পাঠানো খাবার সেদিন ভাল করে খায় দুজনে। বাইরে বেশ কনকনে বাতাস। শীতের আমেজ। আর কিছুদিন পরেই বোধ হয় শুকনো পাতার স্তুপ জড়ো করে আগুন জ্বালাতে হবে।

একই বালিশে পাশাপাশি মাথা রাখে দুজনে। একটু পরেই আঃ নির নাসিকা গর্জন শুরু হয়। আহা, ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলো বেচারী। সারাদিনের দীর্ঘ পরিশ্রম। কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে সীমাচলম ঢলে পড়ে নিদ্রার কোলে।

খুব ভোরে উঠেই রওনা হ'য়ে পড়ে আঃ নি। সীমাচলম অনুরোধ করেছিল আর একটা রাত কাটিয়ে যেতে, তবু তো নির্বান্ধব পুরীতে কথা বলবার লোক থাকবে একটা। কিন্তু থাকবার উপায় নেই আঃ নির। উপত্যকায় নেমে হাটে চালান দিতে হবে শুয়োরের শুঁটকী মাংস, আর আফিংয়েরও গতি করতে হবে একটা। কাজেই আর বাধা দেয় না সীমাচলম। আবার একমাস পরে হয়ত দেখা হবে আঃ নির সঙ্গে। এর মধ্যে আর আসার সুবিধা হবে না তার। আবার একটানা জীবন —কোন বৈচিত্র্যের স্বাদ নেই কোনখানে। ক্লান্তি আসে সীমাচলমের।

কবে শেষ হবে এই জীবনযাত্রার, সহজ সরল জীবন ফিরে আসবে

শীতের প্রকোপ ক্রমেই বাড়তে থাকে। বাইরে বেরোনই দায়। অনবরত বরফ পড়ে ঝির ঝির করে—গাছের পাতায় বরফের স্তর জমে ওঠে। এর মধ্যে বারদুয়েক এসেছিলো আঃ নি। শীতে যেন আরও বুড়োটে দেখায় তাকে। কিছু জিনিসপত্রও এনেছিলো সঙ্গে করে, সে সব জিনিস চালান করে দিয়েছে সীমাচলম। উপস্থিত হাত খালি তার। আঃ নির সম্বন্ধেও ধারণা বদলে গেছে সীমাচলমের। ভেবেছিলো আঃ নি বুঝি ওদের দলেরই লোক, ওরই মতন অা ঠুনের হাতে হাত দিয়ে সঙ্কল্প নিয়েছিলো স্বাধীনতার। না, তা নয়। আঃ নি শুধু জিনিস দিয়েই খালাস। পরিবর্তে মোটা রকমের কিছু পেয়ে থাকে—ব্যস, ঐটুকুই তার সম্পর্ক। তার দরিদ্র জীবনের এই একমাত্র অবলম্বন। এর জন্য বিপদ তুচ্ছ করে, প্রাণ তুচ্ছ করে আনাগোনা করে।

এবারে অনেকদিন আসেনি আঃ নি। আসার সময় তার হয়ে গেছে অনেকদিন। রোজই সীমাচলম অপেক্ষা করে আর ফিরে আসে মনক্ষুণ্ণ হয়ে। এই নির্জন জীবনযাত্রার একমাত্র সঙ্গী এই আঃ নি। তার সঙ্গে গল্প করে তবু খানিকটা অবসাদ কাটে সীমাচলমের।

সেদিন সকাল থেকে শুরু হয়েছে বরফ পড়া। স্লেটের মত মিশ কালো আকাশ—হাত কয়েক দূরের জিনিসও দেখা যায় না ভালো করে। ঘরে শুকনো পাতা আর কাঠের স্তূপ জ্বালিয়ে শরীরটা গরম ক'রে নেয় সীমাচলম। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সূর্যের মুখ দেখা যায়নি। পুরানো খবরের কাগজ খুলে চুপচাপ বসে একলা।

দরজায় শব্দ হ'তেই লাফিয়ে উঠে পড়ে সীমাচলম, বাইরের ঘোড়ার খুরের শব্দও কানে আসে। আঃ নি আসলো বুঝি এতদিন পরে।

দরজা খুলেই কিন্তু পিছিয়ে যায় সীমাচলম। না, আঃ নি তো নয়।

আপাদমস্তক চামড়ার পোশাকে আচ্ছাদিত—তার মুখের দিকে চেয়ে দেখে সীমাচলম। কিশোর বয়স্ক এ আবার কে এলো এখানে।

'কে তুমি?'

'বাবা খুব অসুস্থ। আসতে পারলেন না আজ, খুব জরুরী ব্যাপার বলে না এসে আমার উপায় ছিল না। দরজা বন্ধ করে দিন। এই শীতে জমে যাবো যে।

লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি পথ ছেড়ে দেয় সীমাচলম। কিশোরটি একেবারে লাফ দিয়ে আগুনের ধারে গিয়ে বসে। হাত দুটো আগুনের ওপর সেঁকতে সেঁকতে বলে, 'ও, এ রকম বরফ পড়া আমার আঠারো বছরের জীবনের মধ্যে দেখিনি আমি। বরফের উপর দিয়ে কতবার যে পা হড়কে হড়কে গেছে ঘোড়ার, তার ঠিক নেই। এই রাস্তায় ঘোড়ার পা হড়কানোর মানে জানেন তো, একেবারে হাজার হাজার ফিট তলায় বাহনশুদ্ধ নিশ্চিহ্ন।'

ভারি মিষ্টি লাগে সীমাচলমের ছেলেটির কথা বলার ভঙ্গি। এই দুর্যোগে কিশোর বয়সী এই ছেলেটি কি করে আসলো এতটা পথ অতিক্রম করে। আঃ নি নিশ্চয় খুবই অসুস্থ, নইলে এই আবহাওয়ায় কেউ কাউকে বাইরে পাঠায়!

'খুব অসুস্থ বুঝি তোমার বাবা?'

'হ্যাঁ, বেশ অসুস্থ। হাঁপানি এই সময়টা বড্ড বাড়ে কিনা। পঙ্গু করে ফেলে বাবাকে।'

'কিন্তু এই দুর্যোগে তুমি না বেরোলেই পারতে. বেকায়দায় পড়লে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়তে কতক্ষণ।'

খিল খিল করে হেসে ওঠে ছেলেটি, 'ঘোড়া ফেলে দেবে আমাকে? আপনি শোনেননি বুঝি সারা হোয়াং কো শহরে আমার বাবার মত

ঘোড়সওয়ার এখনও কেউ নেই ; বাবার পরেই আমি। কাল সকালে আপনাকে ঘোড়ার নানারকম কসরৎ দেখাব এখন। আর এই আবহাওয়ার কথা বলছেন ? বেশ কয়েক গজ ভালো সিল্ক পাওয়া গেছে, বাজারে ভালো দামই পাওয়া যাবে। আর তা ছাড়া আপনার মালমসলাও জোগাড় করেছি কিছু,—মোটা রকমের কিছু না পেলে সারাটা শীত বাবার চিকিৎসা চালাবো কি করে !'

ছেলেটির কথায় অভিভূত হ'য়ে যায় সীমাচলম। সত্যি, এইটুকু ছেলের এতটা দায়িত্ববোধ ! নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে পথের সমস্ত কিছু বিপদ মাথায় করে সে বেরিয়ে পড়েছে,—বাপের চিকিৎসা আর পথ্য জোগাড় করতে হবে যে তাকে !

'তোমার বাড়িতে বাবা ছাড়া আর কেউ নেই বুঝি ?'

'এক মাসী আছে দূর সম্পর্কের। সেই থাকে বাবার কাছে।'

'বাবার আর ছেলেপুলে ?'

'না, আর কেউ নেই—কোল জুড়ানো মানিক আমি একলাই।'

'তোমার মা ?'

এবার ছল ছল করে ছেলেটির চোখ দুটো। আগুনের আভায় ম্লান আর বিষণ্ণ দেখায় তার মুখ।

'মা ? মা মারা গেছে অনেক আগে। আমি তখন খুব ছোট।'

কথা আর বাড়ায় না সীমাচলম। দুটো প্লেটে খাবার সাজাতে শুরু করে আর দুটি গ্লাসে মদ। এ সমস্তই বা মঙের দেওয়া। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় দিনের পর দিন এ ভাবে রসদ জুগিয়ে চলেছে কি বা মঙ ? বোধ হয় নয়। নিশ্চয় আ ঠুনের হাত আছে এর মধ্যে। ওর স্বাচ্ছন্দ্য আর সুখের সমস্ত নির্দেশ নিশ্চয় পাঠিয়েছে আ ঠুন। পৃথিবীর এই প্রান্তসীমায় যতটুকু করা সম্ভব সবই করেছে আ ঠুন।

খাওয়া-দাওয়ার পরে শয্যা পাততে শুরু করে সীমাচলম। একটি বালিশ সম্বল, সেটি ছেলেটির দিকেই এগিয়ে দেয়। ছেলেটি কিন্তু আপত্তি জানায়।

'না, না, বালিশ আমার লাগবে না। গাছের গুঁড়িতে মাথা রেখে শোয়া যার অভ্যাস তার ঘুম হয় এই নরম বালিশে? সারারাত ছটফট করবো শুধু।'

ছেলেটির কথা বলার ভঙ্গিতে হেসে ফেলে সীমাচলম।

'তা হোক, এক বালিশেই শোয়া যাবে দুজনে। তুমি আজ খুব ক্লান্ত, শুয়ে পড়ো চট করে।'

'সেটা অবশ্য অস্বীকার করতে পারছিনে। বাতিটা নিভিয়ে দিই তা হ'লে। বাতি থাকলে আবার চোখ বুজতে পারি না আমি।' শোবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাতিটা নিভিয়ে দেয়। কাঠের আগুনের স্তিমিত নীল আভা। কাঠগুলো পুড়ে লাল হয়ে গিয়েছে। সীমাচলম আরো কতকগুলো কাঠ আর কাগজের স্তূপ ঠেলে দেয় আগুনে। গনগন করে ওঠে আগুনের আঁচ। বেশ কিছুক্ষণ জ্বলবে এখন। ঝলকে ওঠা আগুনের আলোয় পলকের জন্য দেখতে পায় সীমাচলম—ছেলেটি পাশ ফিরে শুয়েছে —ঘুমিয়েই পড়েছে হয়ত।

অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে যায় সীমাচলমের। নিভে এসেছে আগুন। সমস্ত ঘরটা কনকন করছে বরফের মত। হাত পা অসাড় হ'য়ে আসছে। আরো দু' একটা কাঠের টুকরো আগুনে ঠেলে দেয়। শীতে কুঁকড়ে শুয়েছে ছেলেটি একেবারে তার বুকের উপর। কেমন মায়া হয় সীমাচলমের। আহা, এত ক্লান্ত যে নির্জীবের মত পড়ে আছে ছেলেটি—শীত বোধ করার শক্তিও বুঝি চলে গেছে তার।

আবার এক সময়ে আচমকা ঘুম ভেঙে যায় সীমাচলমের। ছেলেটি দুটি হাত দিয়ে চেপে ধরেছে তাকে—নিঃশ্বাস প্রায় রোধ হয়ে আসছে তার।

শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচবার মত যথেষ্ট শীত-পরিচ্ছদ নেই বেচারীর গায়ে। একটা চামড়ার পোশাকে এই পাহাড়ে শীতের হাত থেকে বাঁচা যায় না।

ছেলেটির হাতদুটো ধরে একটু সরিয়ে শোয়াতে গিয়েই চমকে ওঠে সীমাচলম। একি, তার সারা শরীরে একটা বিদ্যুৎ শিহরণ। স্বপ্ন দেখছে নাকি!

ম্লান চাঁদের আলো এসে পড়েছে মুখে। ক্লান্ত আর নিমীলিত দুটি চোখ। মাথার টুপিটা এলিয়ে পড়েছে এক পাশে—পিঙ্গল চুলের রাশ ছড়িয়ে পড়েছে বিছানায়। ভীত সন্ত্রস্তভাবে তার বুকের উপর আলগোছে হাতটা রাখে সীমাচলম। না, এবার আর সন্দেহ নেই। নিটোল দুটি বুক—নিঃশ্বাসের ছন্দে দুলে দুলে উঠছে। ছেলে নয় তবে,—মেয়ে! কিন্তু পুরুষের কাছে এভাবে শুয়ে পড়তে একটুও দ্বিধা করলো না মেয়েটি!

অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখে সীমাচলম। সুন্দরী কিশেরী—ওর দেহের যৌবন সম্বন্ধে আজও বুঝি ও অচেতন। রক্তে আবার নেশা লাগে সীমাচলমের। এই তো চেয়েছিলো। পৃথিবীর একান্তে ছোট নীড় আর এমনি স্বাস্থ্যোজ্জ্বল এক কিশোরী।

ঘুমের ঘোরে আবার এপাশ ফেরে মেয়েটি। একটি হাতে জড়িয়ে ধরে সীমাচলমের দেহ। এবারে আর তাকে সরিয়ে দেয় না সীমাচলম। দুটি হাতে নিবিড় আলিঙ্গনে টেনে আনে নিজের বুকের কাছে। একটু যেন চমকে ওঠে মেয়েটি, কিন্তু ঘুম ভাঙে না তার।

অনেক বেলায় ঘুম ভাঙে সীমাচলমের। বরফ পড়া অনেকটা কম। গাছের পাতায় রোদের অল্প আভাস। মেয়েটি পাশে নেই, বাইরে গিয়েছে বোধ হয়। হাত মুখ মুছে নেয় সীমাচলম। মাথার কাছে চায়ের কেতলি। চা তৈরী করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে মেয়েটির জন্য। কোথায় গেলো সে। ভোরে উঠেই আফিংয়ের খদ্দেরের সন্ধানে বেরিয়েছে বুঝি।

কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারে আর বোধ হয় ফিরবে না মেয়েটি। কেন যে ফিরবে না সেটাও কতকটা আন্দাজ করে। রাত্রে জেগেছিলো কি মেয়েটি ? হয়ত বুঝতে পেরেছে তার ছদ্মবেশ ধরা পড়ে গিয়েছে। দিনের আলোয় মুখ তাই সে দেখাতে চায়নি। তার চেয়েও বড়ো কথা—সীমাচলমের আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে কামনার উলঙ্গ রূপটাও হয়ত ধরা পড়ে গিয়েছে তার কাছে। বুঝেছে সে, তার নারীত্বের পক্ষে এ আশ্রয় নিরাপদ নয়।

আঃ নির মেয়ে সত্যিই আর ফিরে আসে না।

অনেকদিন পর্যন্ত কোন খবর নেই। আ ঠুনের চিঠি তো নয়ই, আকোরও কোন সংবাদ পায় না সীমাচলম। হাতের টাকা প্রায় ফুরিয়ে আসছে। এবার সত্যিই ভাবনায় পড়ে যায়।

একদিন ভোরে চা নিয়ে বা মঙ সাহেবের চাকর আর আসে না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে সীমাচলম, তারপর নিজেই বেরিয়ে পড়ে বাইরে। পাহাড় থেকে নেমে হাটের কাছ বরাবর যেতে হয়ত দু'একটা পাহাড়ী ছাগলওয়ালাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। এই শীতে গরম চা কিম্বা দুধ কিছু একটা না খেলে জমে যাবে ঠাণ্ডায়।

নামবার মুখে দেখা হ'য়ে যায় বা মঙের চাকরের সঙ্গে।

'সাহেব আপনাকে ডাকছেন একবার। বিশেষ জরুরী।'

একটু আশ্চর্য হয় সীমাচলম। মাস চারেক সে রয়েছে এখানে, কিন্তু এ পর্যন্ত ডেকে তার খোঁজখবর নেওয়া প্রয়োজন মনে করেনি বা মঙ। অবশ্য আতিথেয়তার কোন ত্রুটিই তার হয়নি। কিন্তু বিদেশ বিভুঁইয়ে পড়ে আছে একটা ভিন দেশের লোক—ডেকে একটু খোঁজখবর নেওয়ার মতও শিষ্টতা কি ছিল না তাঁর ?

'আমাকে ডাকছেন? বেশ তো, যাচ্ছি আমি, চলো। কি ব্যাপার বলো তো—এতদিন পরে তোমার মনিবের যে খেয়াল হ'লো আমার কথা?'

'আজ্ঞে তা তো কিছু জানি না। আজ সকালে উঠেই বললেন, ওখানে চা নিয়ে যাবার আর দরকার নেই। একটু পরে ডেকে নিয়ে এসো তুমি ওঁকে—এখানেই চা খাবেন উনি।'

কথা আর বাড়ায় না সীমাচলম। লোকটির পিছনে পিছনে চলতে শুরু করে।

নিচের প্রকাণ্ড হলঘরটায় সীমাচলমকে বসিয়ে উপরে খবর দিতে যায় চাকরটি।

প্রকাণ্ড কাঠের গোল টেবিল—ইতস্ততঃ দু' একটা কাঠের চেয়ার ছড়ানো। সামনের দেয়ালে মান্দালয় দুর্গের প্রকাণ্ড একটা বাঁধানো ছবি আর এক পাশে বর্মার শেষ রাজা থিবর আবক্ষ প্রতিমূর্তি। শেষ স্বাধীন রাজা এই দেশের—চেয়ে চেয়ে দেখে সীমাচলম। এর হাত থেকেই বুঝি শাসনভার কেড়ে নিয়েছিলো ইংরাজ। এর রাণী পৃথিবী বিখ্যাত সুন্দরী সুপিয়ালার কথাও শুনেছে সে অনেকবার। রাণী বুঝি বেঁচে আছেন এখনো!

পায়ের আওয়াজে মুখ ফেরায় সীমাচলম। ভারি একটা কম্বল গায়ে জড়িয়ে ঘরে ঢোকে বা মঙ। গম্ভীর প্রকৃতির লোক। চুরুটের ধোঁয়ায় মুখের সবটা চোখে পড়ে না। টেবিলের কাছে চেয়ার টেনে বসে পড়ে বলে, 'থিবর ছবিটা আমার নয়, মামাই রেখে গেছে এখানে।'

কথাটা ভালো বুঝতে পারে না সীমাচলম। ঘরে থিবর ছবিটাকেও কি অস্বীকার করতে চায় বা মঙ? বর্মার স্বাধীন নৃপতির প্রতিকৃতি রাখবার মত গর্হিত কাজ তার দ্বারা হওয়া সম্ভব নয় সে কথাই কি বোঝাতে চায়!

বা মণ্ডের চেয়ারের কাছে এসে সীমাচলম বলে, 'আপনি ডেকেছেন আমায় ?'

'বসুন, চা খেতে খেতে কথা হবে।'

কথার সঙ্গে সঙ্গেই চা নিয়ে ঘরে ঢোকে বা মণ্ডের চাকর। চা খেতে খেতে কথা শুরু করে বা মণ্ড।

'বর্মায় আপনার জানাশোনা আছে কেউ ?'

প্রশ্নের ধরনে একটু চমকে ওঠে সীমাচলম। তারপর মাথা নেড়ে বলে, 'না, তেমন জানাশোনা কেউ নেই।'

'তবে কার ভরসায় এসেছিলেন এদেশে ?'

উত্তর দেয় না সীমাচলম।

'এসব কাজে যখন নেমেছেন, সব সময় আস্তানা ঠিক করে রাখবেন একটা। বিপদের সময় দাঁড়াবেন কোথায় গিয়ে ?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না আপনার কথাগুলো। বিপদ কিছু হ'য়েছে নাকি কোথাও ?'

'বিপদ বৈকি। অা ঠুন ধরা পড়েছে আরাকানে। মণ্ড শানকেও ধরেছে পুলিশে। আপনার এখানেও শীগ্‌গির হানা দিলে আশ্চর্য হবো না।'

'উপায় ?' রীতিমত ঘেমে ওঠে সীমাচলম।

'সেইজন্যই তো আপনাকে ডাকা। এখান থেকে সরে পড়ুন কোথাও। কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকুন, তারপর ভালো ছেলের মতন জীবনযাপন করুন। এসব হাঙ্গামা কি পোষায় ?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে সীমাচলম, তারপর আস্তে আস্তে বলে, 'কোথায় যাই বলুন তো ?'

'আপনিই বলতে পারবেন ভালো। তবে এখন রেঙ্গুনের দিকে না যাওয়াই ভালো।'

'আর তো বিশেষ চেনাশোনা আমার নেই কোথাও।'

'আপনি এদেশে কেন এসেছিলেন?' খুব তীক্ষ্ণ গলার স্বর বা মঙের।

'চাকরির চেষ্টায়।'

'চাকরি এখন করতে রাজী আপনি?'

'নিশ্চয়।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ। ঘরের মধ্যে কোথাও ঘড়ির পেণ্ডুলাম একটা দুলছে তারই শব্দ আসছে ভেসে।

চুরুটে অনেকগুলো টান দিয়ে আস্তে আস্তে বলে বা মঙ, 'আপনি আজই চলে যান এখান থেকে। হেহোয় গিয়ে কাশিমভাইয়ের সঙ্গে দেখা করুন। আমি চিঠিও দিয়ে দেবো একটা। ভদ্রলোকের বিরাট ব্যবসা, একসময় আমার বাবার কাছ থেকে যথেষ্ট উপকার পেয়েছিলো, সেকথা যদি ভুলে না গিয়ে থাকে তো আপনার একটা কিছু হয়ে যাবে।'

কৃতজ্ঞতার ভাষা খুঁজে পায় না সীমাচলম। দাঁড়িয়ে উঠে দু'হাতে জাপটে ধরে বা মঙের হাত। 'আপনি যে কি উপকার করলেন আমার তা বলবার নয়। আমি আজই চলে যাচ্ছি এখান থেকে।' কথাটা বলেই একটু চিন্তিত হ'য়ে পড়ে সীমাচলম। কি একটা বলবার চেষ্টা করে, তারপর বসে প'ড়ে চেয়ারে।

'একটু অপেক্ষা করুন, আম আসছি এখনি।' ঘরের মধ্যে ঢুকেই কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে আসে বা মঙ।

কম্বলের ভিতর থেকে হাতটা বের করে রাখে টেবিলের সামনে। হাতে নোটের তাড়া। নোটগুলো এগিয়ে দেয় সীমাচলমের দিকে, 'নিন, রেখে দিন এগুলো আপনার কাছে। পথের রাহা খরচ আর যতদিন একটা কিছু উপায় না হয় এতেই চালিয়ে নেবেন কোনরকমে। বাবার দেনা শোধ করার জন্য যা রেখেছিলাম, তা থেকেই দিলুম আপনাকে

এনে। হিসেব করেছিলুম সামনের বছরের মধ্যেই শোধ করতে পারবো সমস্তটা, কিন্তু ভুল হ'য়ে গেলো হিসেবে। আরো একটা বছর লাগবে বোধ হয়।' চোখ দুটো ছল ছল ক'রে ওঠে সীমাচলমের। হাতের মুঠোর মধ্যে কেঁপে ওঠে নোটের তাড়াটা। আমতা আমতা করে বলে, 'এতখানি আপনি করলেন আমার জন্য, কি বলে ধন্যবাদ দেবো আপনাকে। আপনার কথা কোনোদিন ভুলবো না।'

'আজ্ঞে, ওই দয়াটি করবেন না অনুগ্রহ করে। মনে রেখে চিঠিপত্র আর দেবেন না যেন, কিম্বা ঋণ শোধ করবার ইচ্ছায় ডায়েরীতে নাম ধাম টুকে রাখবেন না। শেষকালে আপনার সঙ্গে আমাকেও টানাটানি করবে পুলিশে। সব কথা দয়া করে ভুলে যাবেন মশাই, ব্যস। আমাকে বাঁচতে হবে, দেনা শোধ করে যেতে হবে। ওসব ঝক্কি সামলাতে পারবো না।'

আশ্চর্য হ'য়ে যায় সীমাচলম। এতখানি প্রাণ কোথায় লুকানো ছিল এতদিন! অজানা অপরিচিত একজনের হাতে জীবনের সমস্ত সম্বল তুলে দেওয়ার মত নিঃস্বার্থ ত্যাগের কোথায় তুলনা!

চৌকাঠ পার হ'য়ে নেমে আসে সীমাচলম। বা মঙ আসে সঙ্গে সঙ্গে। ফটকের কাছে এসে দাঁড়ায় সীমাচলম।

'আজ সন্ধ্যায় আমি রওনা হবো। হয়ত কোনদিন আর দেখা হবে না আপনার সঙ্গে। আপনি যা করলেন আমার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে তাকে ছোট করবো না।'

'কি আর করেছি মশাই—একধারে বাপের দেনা আর একদিকে মামার দেনা এই শোধ করছি সারাজীবন।'

'মামার দেনা?'

'হ্যাঁ, তাই একরকম বই কি। মার ভাই মামা, তাকে তো আর

উপেক্ষা করতে পারি না। তার পাল্লায় পড়েই তো আপনাদের এই অবস্থা, কাজেই আপনাদের সাহায্য করা মানেই তো তার দেনা শোধ করা।'

ফটক পার হ'য়ে পথে পা দিতে গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ে সীমাচলম। বা মঙ আবার আসছে পিছনে।

'দিন হাতটা এগিয়ে, আবার কবে দেখা হবে ঠিক কি!' সীমাচলমের হাতটা বুকের ওপর চেপে ধরেই ছেড়ে দেয় বা মঙ। তারপর প্রায় দৌড়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে।

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে সীমাচলম। চাকরটি ঠিক সময়েই হাজির থাকে। বরফ পড়াটা অনেকটা কমে এসেছে। নয়ত পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথ ধরে ওই অন্ধকারে চলাই দুষ্কর হতো। পাহাড় থেকে নামতেই হাত দিয়ে দেখায় চাকরটি। সারা আকাশ লাল হয়ে উঠেছে।

'আগুন লেগেছে বুঝি কোথাও!'

'হ্যাঁ, আপনার থাকবার ঘরটা বা মঙ সাহেবের হুকুমে জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কোন চিহ্ন রাখার প্রয়োজন নেই—এ কথাই উনি বলেছেন।'

পাহাড়ের তলায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে সীমাচলম।

বিরাট কারবার কাশিমভাইয়ের। সালুইন নদীর ধার ঘেঁষে মস্ত বড়ো কাঠের কারখানা। গোটা ছয়েক হাতি শুঁড়ে করে বয়ে নিয়ে আসে প্রকাণ্ড কাঠগুলো, তারপর ভাসিয়ে দেয় সালুইনের জলে। কারখানার একটু দূরেই কাশিমভাইয়ের বাংলো।

বাংলোয় ছিলেন কাশিমভাই। সীমাচলম চিঠিটা দারোয়ানের কাছে দিয়ে রাস্তার ধারেই বসে পড়ে। তিন দিন আর তিন রাত্রির পরিশ্রমে অবসন্ন বোধ হচ্ছে। চোখের পাতাদুটো নিজের থেকেই জুড়ে আসছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পরে ফিরে আসে দারোয়ান। সীমাচলমকে একটা ঘরে বসিয়ে দিয়ে যায়। বেশ কিছুক্ষণ কাটে। হঠাৎ বাইরে সম্মিলিত কলরব শিশুকণ্ঠের। খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢোকেন কাশিমভাই। টকটকে ফর্সা রং, লম্বা চওড়া হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, একমুখ হাসি। দু' হাতে দুটি ছোট ছেলের হাত ধরা, কোলে আর একটি।

দাঁড়িয়ে উঠে সীমাচলম মুসলমানী কায়দায় সেলাম করে, 'আদাব।'

'আদাব, আদাব। বসুন।'

সীমাচলম বসবার আগেই একটা ইজিচেয়ারে থপাস করে বসে পড়েন তিনি। একটু পরিশ্রমেই হাঁপাতে শুরু করেন। ছেলেমেয়েগুলি ইজিচেয়ার ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে।

'আর বলেন কেন। দু'-দুটি পরিবার সরে পড়লো মশাই, গুটিকয়েক করে পুষ্যি ঘাড়ে চাপিয়ে। এই দেখুন না সামনে তিনটি আর দুটি আছেন ওপরে। জ্বালাতন মশাই জ্বালাতন। বা মণ্ডের চিঠি পড়লুম, কিন্তু কারখানার কাজের চেয়ে বাড়ির কাজ করে আমায় উদ্ধার করুন মশাই।

'বাড়ির কাজ?'

'হ্যাঁ, এই পুস্তিকটির লেখাপড়ার ভার নিন। আমায় রেহাই দিন। যতটা সোজা ভাবছেন ততটা সোজা নয়। এসব ডাকাত ছেলেপিলে মশাই, প্রাণের তোয়াক্কা করে না।'

এইবার হেসে ফেলে সীমাচলম। নাবালক ছেলেগুলোর গুণ্ডামির বহর শুনে নয়, সে হাসে কাশিমভাইয়ের বলার ভঙ্গিতে।

'বেশ তো। এদের পড়াবার ভারই দিন আমায়। আমি রাজি।'

'এখুনি, এখুনি। আজ রাতটা থাক কাল সকাল থেকেই শুরু করবেন পড়ানো। কিন্তু মাইনে-পত্তরের কথাটা বলুন। কি হ'লে চলবে আপনার ?'

'ওসব ঠিক আছে, আপনি যা দেবেন তাই।' টাকার প্রসঙ্গে একটু বিব্রত হ'য়ে পড়ে সীমাচলম। দরকষাকষি আসে না ওর ধাতে।

'থাক, সে পরে ঠিক করা যাবে। আপনার থাকবার সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। আজ ব্যস্ত রয়েছি একটু। আলাপ করবো এরপর একদিন ভালো করে।' উঠে পড়েন কাশিমভাই।

ম্যানেজারের ভাইয়ের কাছে সব কথা জানতে পারে সীমাচলম। ম্যানেজার মিঃ নায়ার—কর্মঠ ব্যক্তি, কাশিমভাইয়ের ডান হাত। তার ভাই শঙ্করন নায়ার ভবঘুরে লোক—দাদার পরগাছা। বন্দুক ঘাড়ে করে শিকার আর চাঁদনী রাতে শাম্পান বেয়ে ওপারের বস্তিতে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো—এই ক'রেই কাটায় সময়টা। সীমাচলমের সঙ্গে প্রথম কয়েকদিনের মধ্যেই পরিচয় হ'য়ে যায়, আর আরো দু' একদিনের মধ্যেই সে পরিচয় নামে অন্তরঙ্গতায়।

তার কাছেই কাশিমভাইয়ের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম পক্ষের একটিমাত্র মেয়ে, অপরূপ সুন্দরী। একবার শুধু কোন পোয়েতে দেখেছিলো শঙ্করন, সেই থেকে সমস্ত দুনিয়া বিস্বাদ হয়ে গেছে শঙ্করনের

কাছে। মেয়েটি নাকি অত্যন্ত লাজুক। তারপরের চারটি সন্তান দ্বিতীয় পক্ষের বর্মী রমণীর গর্ভের। নাক সিঁটকায় শঙ্করন, বলে, 'শূয়োরের পাল—সর্বদাই ঘোঁৎঘোঁৎ করছে।

প্রায়ই ছলছুতো করে আসে শঙ্করন সীমাচলমের কাছে, পড়াবার সময় চুপটি করে বসে থাকে এক কোণে আর মাঝে মাঝে চোখ তুলে দেখে ওপরের সিঁড়ির দিকে। কিন্তু কোনদিন ছায়াও দেখা যায় না মেয়েটির। সীমাচলমও কোনদিন দেখেনি মেয়েটিকে; এমনকি তার গলার আওয়াজও শোনেনি।

মেয়েটির নাম বুঝি ফতিমা। অনেকরকম ভাবে তার কথা জিজ্ঞাসা করে শঙ্করন। ছোট ছেলেটিকে ডেকে বলে, 'আচ্ছা, তোমার দিদি দিনরাত ঘরের মধ্যে বসে বসে কি করে বলোতো?'

'কি আবার করবে? পড়ে।'

'পড়ে, কি পড়ে?'

'কেন, বাবা কতো বই আনিয়ে দেন দিদির জন্য, সুন্দর সব ছবির বই। দিদি খুব পড়তে ভালোবাসে।'

বিস্মিত হয় শঙ্করন। সীমাচলমেরও আশ্চর্য লাগে। নিভৃতে একান্তে ব'সে কি এত পড়ে মেয়েটি! রীতিমত আক্ষেপ করে শঙ্করন, 'এ আবার কি শখরে বাবা! এই বয়সে খাও, দাও, স্ফূর্তি করো। তা নয় বই কোলে দিনরাত এ আবার কি ঢং!'

সীমাচলম জবাব দেয় না। অন্নদাতার মেয়ের সম্বন্ধে অহেতুক কৌতূহলে ওর কাজ নেই। মাথার ওপরে আচ্ছাদন আর একমুষ্টি অন্ন হারানো যে কি ব্যাপার সেটা হয়ত সযত্নপালিত শঙ্করন বুঝবে না, কিন্তু হাড়ে হাড়ে বোঝে সীমাচলম। পথকে অবলম্বন করতে আর রাজী নয় সে

ছেলেগুলোর সম্বন্ধে যতটা ভয় দেখিয়েছিলেন কাশিমভাই, আসলে অতটা দুর্দান্ত কিন্তু নয় তারা। ভালবেসে বুঝিয়ে কিছু বললে তারা খুবই শোনে। ভালোই লাগে সীমাচলমের।

পড়ার ঘরে হঠাৎ একদিন এসে ঢোকেন কাশিমভাই। ঢুকেই কেশে গলাটা পরিষ্কার করে বলেন, 'পড়ার সময় বিরক্ত করতে আসলুম আপনাকে।'

'সে কি কথা—' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে সীমাচলম।

'দেখুন ব্যবসা সম্পর্কে আমাকে দিন কয়েকের জন্য রেঙ্গুনে যেতে হবে। ম্যানেজার রইলেন, তিনি প্রত্যেকদিন এসে খোঁজ নেবেন এদের। আপনিও দয়া করে এ ক'টা দিন এদের দেখবেন। অসুখ-বিসুখ হলে সোজা সিভিল সার্জনকে ফোন করে দেবেন, তাঁকে আমার বলাও আছে। টাকাপত্তর যা দরকার ম্যানেজারের কাছেই পাবেন।'

'এসব কথা বলে আমায় কেন লজ্জা দিচ্ছেন। আপনার অনুপস্থিতিতে কোন অসুবিধা হবে না এদের। আমি এদের আমার ছোট ভাই বোনের মতন দেখি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'বেশ, বেশ, ভারি খুশি হলুম আপনার কথা শুনে। আমার বড়ো মেয়েও বলছিলো যে, ছেলেমেয়েগুলো আপনাকে খুব ভালবাসে। খেতে শুতে বসতে কেবল আপনার গল্প।'

এতদিন বড়ো মেয়েটির সম্বন্ধে একটা অশরীরী অস্তিত্বের কল্পনা করেছিলো সীমাচলম—প্রাণহীন, নিশ্চেতন। রক্ত মাংসের রূপ নিয়ে যেন সে দাঁড়ায় আজ তার সামনে। বড়ো মেয়েটি সীমাচলমের সম্বন্ধে আলোচনা করে তার বাপের সঙ্গে! কোন এক দুর্বল মুহূর্তে হয়ত ভাবে তার ভাইবোনদের পড়াশুনার কথা—আর—হয়ত—মাথাটা ঝেঁকে চিন্তার হাত এড়ায় সীমাচলম।

আসল খবর নিয়ে আসে শঙ্করন, 'ব্যবসার কথাটা সব ভুয়ো বুঝলে ভায়া, আসল ব্যাপারটি কি জানো ?'

'কি ?'

'হুঁ, সাদি গো সাদি। বুড়োর তৃতীয় পক্ষ আসছে এবার। বিছানা খালি যাবে নাকি ?'

'সত্যি ?' ভারি আশ্চর্য লাগে সীমাচলমের।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার দাদাকে সব বলে গেছে। রেঙ্গুনেই হচ্ছে বিয়ে। অল্পবয়সী জেরবাদী ছুঁড়ি বুঝি আসছে এবার। আরে ভাই, টাকার জোর থাকলে সবই হয়।'

নতুন বৌ ঘরে আনবে কাশিমভাই জীবনের এই সায়াহ্নে ? ছেলে-মেয়েদের যত্ন হবে কি আগের মতো ? কথাগুলো মনে হতেই হাসি পায় সীমাচলমের। ওর এত মাথাব্যথার দরকার কি ? মাইনে করা গৃহশিক্ষক —ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ভারটুকু নিয়েই ওর সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয় কি ? এত ভাবনায় ওর কি প্রয়োজন ?

কিন্তু সত্যিই ভাবনার মধ্যে পড়ে সীমাচলম। দুপুরবেলা খেয়ে দেয়ে হাল্কা একটা নভেল হাতে নিয়ে সবে শোবার আয়োজন করছে, এমন সময় ইব্রাহিম এসে দাঁড়ায় দরজায়। কাশিমভাইয়ের সবচেয়ে ছোট ছেলে ইব্রাহিম—বছর ছয়েক বয়স।

'মাস্টারমশাই।'

কি ব্যাপার ? ধড়মড় ক'রে উঠে পড়ে সীমাচলম। কি আবার হলো হঠাৎ ? অসুখবিসুখ নাকি কারুর ?

'ভেতরে এসো ইব্রাহিম। কি হ'য়েছে বলোতো।' ভিতরে এসে ঢোকে ইব্রাহিম। সীমাচলমের গা ঘেঁষে দাঁড়ায় আর হাত বাড়ায় বইটার দিকে, 'ওটা কি বই মাস্টারমশাই ?'

'বলছি, কিন্তু কি বলতে এসেছিলে বলোতো।'

'দিদি আপনাকে ওপরে ডাকছে একবার।'

কথাটা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না সীমাচলম। ইব্রাহিমকে আরো কাছে টেনে জিজ্ঞাসা করে, 'কে ডাকছে আমায়?'

'দিদি ডাকছে। দিদি বললে, তোমার মাস্টারমশাই ঘুমিয়েছেন কিনা দেখে এসোতো। না যদি ঘুমিয়ে থাকেন তো বলবে বিশেষ প্রয়োজনে আমি একবার ডেকেছি।'

বিশেষ প্রয়োজনে? কি এমন প্রয়োজন থাকতে পারে ওর সঙ্গে? ডজন খানেক বেয়ারা চাকরানী রয়েছে, তাছাড়া ম্যানেজার মিঃ নায়ার রোজ খবর নিয়ে যাচ্ছেন এসে। কিন্তু ততক্ষণে হাত ধরে টানতে শুরু করেছে ইব্রাহিম, 'চলুন, চলুন। দেরি হ'লে দিদি আবার বকবে।'

সন্ত্রস্ত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যায় সীমাচলম। দুপুরবেলা থমথমে একটা ভাব। সব ঘরগুলো নির্জন। সামনে রোদের আলোয় চিক চিক করছে সালুইনের জল। প্রকাণ্ড বসবার ঘর। অনেকগুলো মেহগনি কাঠের টেবিল আর চেয়ার। একটা চেয়ারে সীমাচলমকে বসতে বলে ইব্রাহিম।

পিছনে একটা খস খস আওয়াজ শুনে ঘুরে বসে সীমাচলম। সামনে পাতলা একটা চিক ফেলা। চিকের ওপারে অপূর্ব সুন্দরী এক কিশোরী। আবছা দেখা যায় শরীর, অস্পষ্টতার মধ্যেও নিটোল মাধুর্যের আভাস। চিকের তলার দিকে আবিষ্টের মত চেয়ে থাকে সীমাচলম। চমৎকার দুটি পা। মনে হয় যেন শ্বেত পাথরের তৈরী।

'একটা কথা জিজ্ঞাসা করার জন্য ঠিক দুপুরবেলা বিরক্ত করলাম আপনাকে।' পরিষ্কার গলার আওয়াজ! কিন্তু কি আভিজাত্য সে কণ্ঠস্বরে! চেয়ার ছেড়ে নিজের অজানিতে দাঁড়িয়ে ওঠে সীমাচলম।

'আজ্ঞে বিরক্ত আর কি! কি কথা জিজ্ঞাসা করবেন বলুন।' অসম্ভব কাঁপছে সীমাচলমের গলার স্বর।

'আপনি বসুন, বলছি।'

চেয়ারে বসে পড়ে সীমাচলম। কি এমন কথা জিজ্ঞাসা করবে মেয়েটি?

'বাবার খবর কি জানেন?'

'তিনি তো কাজে গেছেন রেঙ্গুনে। বোধ হয় দিন তিনেকের মধ্যেই ফিরে আসবেন।'

'কি কাজে গেছেন জানেন কিছু আপনি?'

'আজ্ঞে না। বোধ হয় ব্যবসা সম্পর্কে কিছু হবে। ম্যানেজার সাহেবের জানবার কথা, ডেকে পাঠাবো তাঁকে?'

'না, দরকার নেই। তিনি জানলেও বলবেন না কিছু। কিন্তু সত্যি বলছেন কিছু জানেন না আপনি?'

বিব্রত হ'য়ে পড়ে সীমাচলম। যেটুকু সে জানে, তা বলা চলে না এই কিশোরীর কাছে। আর তাছাড়া কতটুকুই বা জানে? শঙ্করনের কাছে শোনা কথার উপর নির্ভর করে কিছু বলাও চলে না।

হাত দিয়ে চেয়ারের হাতলটা খুঁটতে খুঁটতে আমতা আমতা করে উত্তর দেয় সীমাচলম, 'সঠিক কিছুই জানিনা আমি। আপনি দয়া করে ম্যানেজার সাহেবের কাছেই খোঁজ নেবেন।'

সশব্দ একটা দীর্ঘশ্বাস। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সীমাচলম। অনেক বেদনা এ নিঃশ্বাসে।

'আচ্ছা, কিছু মনে করবেন না। মিছামিছি বিরক্ত করলাম আপনাকে।'

'না, না, এসব বলে আমায় লজ্জা দেবেন না।'

'শুনুন।'

কিছুটা গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ে। আবার কেন ডাকছে মেয়েটি?

'আমি যে এসব কথা জিজ্ঞাসা করেছি আপনাকে, একথা বলবেন না যেন কাউকে।'

'আজ্ঞে না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন আপনি।'

সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে সীমাচলম। নিজের ঘরে ঢুকেই দেখে তক্তাপোশের ওপরে ব'সে আছে শঙ্করন। একখানা বালিশ কোলে নিয়ে কি একটা গান ভাঁজছে গুন গুন করে।

সীমাচলম ঘরে ঢুকতেই ভুরু দুটো নাচাতে শুরু করে শঙ্করন, 'এসো বন্ধু, আজ বড্ড ধরা পড়ে গেছো। তোমার এ গোপন অভিসার সফল হোক। কিন্তু অভাগা শঙ্করনই বাদ!'

শঙ্করনকে ভারি ভয় করে সীমাচলম। কোন কথা আটকায় না ওর মুখে; আর তিলকে তাল করতে ওর জুড়ি নেই।

'কি ব্যাপার, দুপুরবেলা কি মনে করে?' অন্য কথা বলবার চেষ্টা করে সীমাচলম।

'কিছুই মনে করে নয় ভাই। কিন্তু কতদিন চলছে এ ব্যাপারটা? কাশিমভাই শহরে যাবার পর থেকে বুঝি?'

'কি যে বলো যা তা, তার ঠিক নেই।'

'তা তো হবেই। কিন্তু এই নির্জন দ্বিপ্রহরে হঠাৎ ওপরে যাওয়ার কি এমন দরকার পড়লো ভাই? যাক্ ফতিমা বিবির পছন্দ আছে।'

'না, তোমার সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। যা মুখে আসে, তাই বলো তুমি। ইব্রাহিমের এয়ার-গানটা তোলা ছিল তাকে, সেইটা পেড়ে দেবার জন্য গিয়েছিলাম ওপরে।'

'ওহো, তাই নাকি। যাক পেড়ে দিয়েছো তো এয়ার-গানটা? ঘায়েল হয়নি কেউ?'

মুচকে মুচকে হাসে শঙ্করন। দাঁড়িয়ে উঠে বলে, 'এবার চলি ভাই।

একটা কথা বলতে দাদা পাঠিয়ে দিলেন তোমার কাছে। কালই ফিরে আসছেন কর্তা বিকেলের গাড়িতে। চাকরবাকরদের ঘরদোর ঝেড়ে-মুছে রাখতে বোলো। কাল সকালে দাদা বাড়ি সাজানো সম্বন্ধে আলাপ করবেন তোমার সঙ্গে। বাড়ি সাজাতে হবে বৈ কি। জোড়ে ফিরছেন যে কর্তা। সঙ্গে তৃতীয় সংস্করণ।'

সেদিন ভোর থেকেই হৈ চৈ শুরু হয় বাড়িতে। বাগানে গাছে গাছে বাতির বন্দোবস্ত। গেটের দুপাশে দুটি কাঁচের পদ্মর মধ্যে জ্বলবে লাল আলো। মোটরটি নানা রংয়ের ফুল দিয়ে সাজানো হয় আগাগোড়া। স্টেসনে যাবে মোটর আর এই মোটরেই ফিরবেন কাশিমভাই বৌ নিয়ে।

সকাল থেকে কোন কাজে হাত দেয়নি সীমাচলম। কোন কাজও অবশ্য ছিল না। আবার বিয়ে করতে গেলেন কেন কাশিমভাই? এই সব ছোট ছেলেমেয়েগুলোর কি হবে অবস্থা? এর চেয়েও বড় আর এক প্রশ্ন জাগে সীমাচলমের মনে। কি বলবে ফতিমা? ওর নিশ্চয় ধারণা সবই জানে সীমাচলম, কিন্তু এড়িয়ে গেছে তাকে।

বিশ্রী লাগে সীমাচলমের যখন বিকেলে ভাল পোশাক পরে ইব্রাহিম এসে হাত ধরে সীমাচলমের।

'চলুন মাস্টারমশাই, মাকে নিয়ে আসি।'

'তোমার মা আসবেন বুঝি আজ?'

'হ্যাঁ, ও মা, জানেন না বুঝি আপনি। সবাই তো জানে। ম্যানেজার-কাকা বললো, মাকে আমরা আনতে যাবো স্টেসন থেকে।'

কোন কথা বলে না সীমাচলম। ইব্রাহিমের হাতটা ধরে' চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

'জানেন মাস্টারমশাই, মাকে কতদিন দেখিনি। অনেকদিন আগে

আমি ঘুমুচ্ছিলাম বিছানায়, আর চুপি চুপি মা পালিয়ে গিয়েছিলো কোথায়। দিদি বলে, মা নাকি অনেক দূরে বেড়াতে গেছে। আজ মাকে এমন বকবো আমি!'

ইব্রাহিমের হাতটা চেপে ধরে' একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে থাকে সীমাচলম। অবোধ শিশু, ওর মাকে আনতে যাবে স্টেসন থেকে!

সিগন্যাল ডাউন হবার সঙ্গে সঙ্গেই চঞ্চল হয়ে ওঠে সবাই। ম্যানেজার স্ত্রীকে নিয়ে এগিয়ে আসেন প্লাটফর্মের দিকে। ছেলে-মেয়েদের নিয়ে পিছনে থাকে সীমাচলম আর শঙ্করন। কারখানার তরফ থেকে কুলিরা প্রকাণ্ড ফুলের তোড়া এনেছে। স্টেসনের বাইরে ব্যাণ্ডপার্টির বাজনার বিরাম নেই।

চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখে সীমাচলম, সকলেই এসেছে স্টেসনে। কিন্তু কই ফতিমা তো আসেনি। কথাটা শঙ্করনকে বলতেই হেসে ওঠে শঙ্করন, 'ছাগলের নজর শাকের ক্ষেতে। বাড়িতেই আছে বোধ হয়, কাশিমভাইয়ের বউকে বরণ করে তোলবার লোক চাই তো একজন।'

স্টেসনে গাড়ি ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই খুব জোরে শুরু হয় ব্যাণ্ডের বাজনা। ম্যানেজার সাহেব হাত দিয়ে কোটটা টেনে নিয়ে কেতাদুরস্ত হয়ে দাঁড়ান স্ত্রীকে সঙ্গে করে। কাশিমভাই নামেন একমুখ হাসি নিয়ে। ম্যানেজারের স্ত্রী গাড়ির মধ্যে উঠে গিয়ে নববধূকে নামিয়ে নিয়ে আসে। আপাদমস্তক সিল্কের বোরখায় ঢাকা। মুখের সামনে ঝুলছে অনেকগুলো বেলফুলের মালা। হাতের চেটো দুটি মেহেদি পাতায় রাঙা। প্রচুর পুষ্প-বৃষ্টি হয়। কাশিমভাই পকেট থেকে নোটের তাড়া বার করে দেন ম্যানেজার সাহেবের হাতে। তিনি আবার কুলিদের দিকে চেয়ে কি যেন বলেন চেঁচিয়ে। অসহ্য গোলমাল আর হৈ চৈ।

হাত তুলে ইঙ্গিতে বাজনা থামাতে বলেন কাশিমভাই। তারপর চেঁচিয়ে বলেন, 'ইব্রাহিম কই? ইব্রাহিম!'

ইব্রাহিমের হাত ধরে এগিয়ে আসে সীমাচলম। কাশিমভাই হাত বাড়িয়ে ইব্রাহিমের হাতটা ধরতে যান, কিন্তু ইব্রাহিম শক্ত করে ধরে থাকে সীমাচলমের হাত। কিছুতেই এগিয়ে যাবে না।

ব্যাপারটা বোঝে সীমাচলম অভিমান হয়েছে তার। এতদিন পরে ফিরে এলো মা, একবার কি আদর করে ডাকতে নেই তাকে! আগেকার মতন কোলে করে গালে গাল দিয়ে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে নেই! অভিমানে চোখদুটো ছল ছল করে আসে তার। দু'হাতে কাশিমভাইয়ের হাতটা সরিয়ে দিয়ে শক্ত হ'য়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে।

মোটরে ওঠবার সময়ও আপত্তি জানায় ইব্রাহিম। অন্য ছেলেমেয়েরা ম্যানেজার সাহেবের মোটরে গিয়ে ওঠে, কিন্তু মুস্কিলে পড়ে ইব্রাহিম। মাকে ছেড়ে অন্য মোটরেও যেতে ইচ্ছা নেই তার, অথচ মা না ডাকলে কেনই বা যেতে যাবে সে তার সঙ্গে। কাশিমভাই দু'একবার টানাটানি করে সীমাচলমের দিকে চেয়ে বলেন, 'মাস্টারমশাই, আপনিও আসুন, নয়ত ওকে মোটরে ওঠানো মুস্কিল দেখছি।'

ইব্রাহিমকে নিয়ে সীমাচলম ওঠে ড্রাইভারের পাশে। তখনো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে ইব্রাহিম। লাল হয়ে গেছে দুটি চোখ আর ফুলে উঠেছে গলার শিরাগুলো।

মোটর চলতে শুরু করতেই বলেন কাশিমভাই, 'শুনছো, বোরখা খুলে ফেলো। গরমে সিদ্ধ হয়ে যাবে যে!' উত্তরে চুড়ির আওয়াজ হয় একটু। বোধ হয় বোরখাটা একটু খোলে মেয়েটি।

নদীর ধার দিয়ে মোটর যেতে আর একবার শোনা যায় কাশিমভাইয়ের গলা, 'ওই যে ওধারে মস্ত লম্বা একটা চিমনি ওইটেই আমার কারখানা।

আজ কারখানা বন্ধ, অন্যদিন হলে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতো ওই চিমনি দিয়ে।'

হাসি পায় সীমাচলমের। দাম্পত্য আলাপের নমুনায় হাসি পাবারই কথা। মেয়েটি কি ভাবছে কে জানে কাশিমভাইকে। বিরাট একটা কারখানার মালিক, এ ছাড়া আর কি পরিচয়ই বা থাকতে পারে ওঁর!

মেয়েটি কি বলে ফিস ফিস করে। নিজের অজানিতেই চোখটা তোলে সীমাচলম। সামনের কাঁচে পিছনের সমস্ত কিছু প্রতিফলিত হয়। অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখে।

বেলফুলের মালাগুলো সরে গেছে একপাশে। বোরখাটা মুখ থেকে তোলা। একরাশ কোঁকড়া কোঁকড়া চুল মুখখানি ঘিরে। এ মুখ ভুল হবার জো নেই। হামিদা এলো কাশিমভাইয়ের সংসারে। ওর মনিব কাশিমভাইয়ের নবতম সংগ্রহ ওরই হারানো হামিদা বানু।

কথাটা সীমাচলম বলে ফেলে একদিন। ঠিক কাশিমভাইয়ের কাঠের কারখানার পাশে প্রকাণ্ড একটা বাগান পড়েছিল। ফল আর ফুলের গাছগাছড়ায় ভরা, কিন্তু উপেক্ষিত আর অযত্ন-বর্ধিত। কোন এক সময়ে এই সবের খেয়াল ছিল কাশিমভাইয়ের যৌবনের প্রথম ঝোঁকে। তারপর কাজকারবারে জড়িয়ে পড়ে এইসব বিলাসের আর অবসর হয়নি। সেই বাগানের ঠিক মাঝখানে একতলা কাঠের বাংলো হয়ত একসময়ে কাশিম-ভাইয়ের প্রমোদভবনই ছিল। বহুদিন সংস্কারাভাবে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে।

এই বাংলোখানাই চেয়ে নেয় সীমাচলম।

'কেন, আপনার কি অসুবিধে হচ্ছে না কি এখানে?'

'না, না, ও কথা বলবেন না। আমি নির্জনে একটু পড়াশোনা করতে চাই। তাই বলছিলাম, ও বাংলোটা তো পড়েই আছে।'

'বেশ তো, তা আর কি, আমি আজই ম্যানেজারকে ডেকে মেরামত করতে বলে দিচ্ছি ঘর দুটো। অনেকদিন ব্যবহার হয়নি কি না।'

ঘর দুটো মেরামত হয়ে যায়। বাগানটারও সংস্কার হয় কিছুটা। নির্জন পরিবেশে ভালোই লাগে সীমাচলমের। সকালে আর বিকালে পড়িয়ে আসে। তারপর অখণ্ড অবসর। শঙ্করনের কাছ থেকে প্রচুর বই জোগাড় করেছে, কাশিমভাইয়ের লাইব্রেরী থেকেও নানানরকমের বই নিয়ে আসে মাঝে মাঝে। কাশিমভাই বোধ হয় কোনদিন পাতা উল্টিয়েও দেখেননি এসব বইয়ের। কিন্তু বড়লোকের খেয়াল, লাইব্রেরী একটা থাকা চাই বৈ কি! দেশবিদেশ থেকে মোটা মোটা পার্শেলে নানারকমের বই আসে কাশিমভাইয়ের নামে। দিনগুলো একটানা মন্দ কাটে না সীমাচলমের।

একদিন খাওয়া-দাওয়ার পরে বিছানায় বসে বসে ছেলেমেয়েদের অঙ্কের খাতা দেখছিলো সীমাচলম, এমন সময়ে হঠাৎ কড়া নাড়ার আওয়াজে চমকে উঠলো। ঠিক দুপুরবেলা আবার কে আসলো বিরক্ত করতে! সময়ে অসময়ে শঙ্করনই আসে ওর কাছে, কিন্তু ক'দিন ধরে পাত্তা নেই শঙ্করনের। কোথায় বুঝি শিকার করতে গেছে। ওসব ভালো লাগে না সীমাচলমের। ঘাস আর নলখাগড়ার বন ভেঙে আধ মাইল জলার মধ্য দিয়ে হেঁটে হেঁটে বনতিতির আর বালিহাঁস মারার ধৈর্য নেই ওর। তাছাড়া সামনেই কাশিমভাইয়ের ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা। এ সময়ে কোথাও নড়বার ফুরসৎ নেই তার।

সীমাচলম দরজা খুলে দেখে কাশিমভাইয়ের এক চাকর দাঁড়িয়ে, হাতে তার গোটা তিনেক বই।

'কি ব্যাপার?'

'আজ্ঞে নতুন-মা পাঠিয়ে দিলেন এই বই কটা। আজকের সকালের মেলে এসে পৌঁছেচে।'

তার হাত থেকে বইগুলো নেয় সীমাচলম। হামিদাকে নতুন-মা বলে চাকরবাকরেরা। কিন্তু হামিদা কেন পাঠাতে গেলো এইসব বই! কাশিমভাইয়ের কাছে বলা আছে, নতুন কোন বই এলে তার কাছেই আসে সমস্ত বই। সে বইয়ে নম্বর দিয়ে লাইব্রেরীর তালিকাভুক্ত করে নেয়। লাইব্রেরীর দেখাশোনার ভারটাও এসে পড়েছে তার ওপরে।

কিন্তু এ নিয়ে বেশীক্ষণ মাথা ঘামায় না সীমাচলম। প্রভুর বদলে প্রভুপত্নীই যদি পাঠিয়ে থাকে বইগুলো, তাহ'লেই বা কি এমন অশুদ্ধ হয়ে গেছে সব? সীমাচলমকে চিনেছে না কি হামিদা বানু? কিন্তু হামিদা বানুর সঙ্গে দেখা হবার কোনোরকম অবকাশ দেয়নি সীমাচলম। এই ভয়েই সে সরে এসেছে কাশিমভাইয়ের বাড়ি থেকে। কি জানি যদি মুখোমুখি দেখাই হয়ে যায় কোনদিন!

বইগুলো হাতে নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে সীমাচলম। তিনখানি বইই ভারতে মুসলিম ঐতিহ্য নিয়ে লেখা। ভারি মনোজ্ঞ। পড়তে পড়তে তন্ময় হ'য়ে যায় সীমাচলম। কয়েকটা পাতা উল্টানোর সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু চমকে উঠে বসে। ছোট সবুজ রংয়ের খাম একটা পিন দিয়ে আঁটা পাতাটার ওপরে। কম্পিত হাতে খামটা খুলে ফেলে। সবুজ রংয়ের কাগজে দুলাইন লেখা।

বিদেশী বন্ধু,

তোমাকে প্রথম দিনেই আমি চিনেছি। তোমার সঙ্গে আমার কোথায় দেখা হতে পারে জানাবে।—হামিদা বানু।

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে সীমাচলমের। এ কি! এ কি করেছে হামিদা? অনেক দিন আগেকার সামান্য একটু চেনাকে অনায়াসেই তো ভুলে যেতে পারতো। কোটিপতির পরিণীতা স্ত্রী আজ সে, তার প্রভুপত্নী, এ সমস্ত বুঝেও কি আত্মসম্বরণ করতে পারেনি হামিদা।

চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে সীমাচলম। কিন্তু ছিঁড়েও শান্তি নেই। কি জানি হাওয়ায় যদি বাইরে যায় কাগজের টুকরোগুলো। শুধু যে হারেমের পবিত্রতা নষ্ট হবে তাই নয়, বিশ্রী একটা হৈ চৈ শুরু হবে চারিদিকে। অতীতকে আর স্বীকার করতে চায় না সীমাচলম। ফেলে আসা সব কিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে ওর জীবন থেকে।

কাগজের টুকরোগুলো এক সঙ্গে করে জ্বালিয়ে দেয় সীমাচলম। মিষ্টি একটা গন্ধ বেরোয় কাগজের টুকরোগুলো থেকে। হামিদার চুলেও ঠিক এমনি গন্ধ পেয়েছিলো সীমাচলম প্রথম দিন। চেয়ে চেয়ে দেখে, বিবর্ণ হয়ে আসে সবুজ কাগজের টুকরোগুলো, তারপর এক সময়ে সব ছাই হয়ে যায়।

সেদিন বিকালে সালুইন নদীর ধার দিয়ে অনেক দূরে চলে যায় সীমাচলম। রবার গাছের ঘন অরণ্য, অশ্রান্তভাবে ঝিঁঝির একটানা ডাক। নদীর জলে পা ডুবিয়ে অনেকক্ষণ সে ব'সে থাকে। বাড়ি ফেরে যখন, তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। শুক্লপক্ষের রাত, পাতলা জ্যোৎস্নায় অস্পষ্ট দেখায় পথঘাট। আজকে আর পড়াতে যাবার হাঙ্গামা নেই। শুক্রবারে পড়ে না ওরা, সপ্তাহে এই দিনটাই ছুটি।

মন ঠিক করে ফেলে সীমাচলম। এসব আর নয়। কাশিমভাইয়ের সমস্ত বিশ্বাস ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে কিছুতেই সে পারবে না। শান্ত পরিমিত জীবন ছেড়ে প্রদেশ থেকে প্রদেশে ঘুরে বেড়ানো আর সম্ভব হবে না। তার দিক থেকে কোন সাড়া না পেলেই নিস্তেজ হয়ে যাবে হামিদা। এক সময়ে ভুলে যাবে। ঘরভাঙার মন্ত্র সীমাচলম কোনদিন শোনাবে না ওকে।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায় সীমাচলমের। অনেক দূরে থেকে কিসের শব্দ ভেসে আসে। অনেকগুলো লোকের সম্মিলিত গলার আওয়াজ। বিছানা থেকে ধড়মড় করে উঠে পড়ে সীমাচলম। ফটক পার হ'য়ে রাস্তায় এসেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

সালুইন নদীর বুকে কতকগুলো শাম্পান দেখা যায়, অন্তত গোটা দশেকের কম নয়। প্রত্যেক শাম্পানে জলছে অনেকগুলো মশাল। সেই কম্পমান মশালের আলোয় আবছা দেখা যায় সব কিছু। এপারেই আসছে শাম্পানগুলো, মাঝে মাঝে ভীষণভাবে চিৎকার করে উঠছে বর্মী ভাষায়। কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারে না সীমাচলম, কিন্তু দু-একটা যা বুঝতে পারে তাতেই শঙ্কিত হয়ে ওঠে।

'জ্বালিয়ে দাও জেরবাদী কালার কাঠের মিল। ম্যানেজারকে টেনে এনে সমস্ত শরীর ঝলসে দাও মশালের আগুনে। আমাদের ইজ্জৎ মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে কালারা।'

প্রথমে মনে হয় ডাকাতই হবে বুঝি এরা। ওপার থেকে লুঠ করতে এসেছে কাশিমভাইয়ের কুঠি আর কাঠের মিল। কিন্তু ইজ্জতের কথা কি বলছে? ডাকাতের আবার কিসের ইজ্জৎ?

দেরি করে না সীমাচলম। প্রাণপণে দৌড়ে কারখানায় গিয়ে হাজির হয়। কারখানাতেও হৈ চৈ শুরু হ'য়েছে। চৌকিদারেরা জেগে উঠেছে। কারখানার ভিতরেই ম্যানেজার সাহেবের বাংলো। গেট পার হ'য়ে ম্যানেজার সাহেবের বাংলোর সামনে গিয়ে দাঁড়ায় সীমাচলম। মিঃ নায়ারও উঠে পড়েছেন। নৈশ বেশের ওপরে লম্বা কোট চাপিয়ে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে নেমে এসেছেন নিচেয়।

'কি ব্যাপার বলুন তো?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না, ডাকাতি বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু কাঠের কারখানায় কি লুঠতে আসছে ওরা?' মিঃ নায়ারকেও উত্তেজিত মনে হয়।

'কাশিম সাহেবের কুঠি লুঠ করতে আসছে না তো?'

'কাশিম সাহেবের কুঠি? কি জানি, আজ চল্লিশ বছর উনি আছেন

এখানে, আশেপাশের গ্রামের সকলেই ওঁকে ভয় করে। বুঝতে পারছি না কিছু।' কথাগুলো বলেই ম্যানেজার ছুটে যান গেটের দিকে, 'সমস্ত লোহার দরজা বন্ধ করে দাও কারখানার। আমাদের যে কটা বন্দুক আছে নিয়ে তৈরী হয়ে থাকো সবাই।'

এপারে এসে লাগে শাম্পানগুলো। মশাল হাতে করে লাফিয়ে পড়ে সবাই কাদার ওপরে। বিশ্রী একটানা চিৎকার, ঠিক বোঝা যায় না কথাগুলো। কাশিমভাইয়ের কুঠির দিকে নয়, মিলের দিকেই এগিয়ে আসে সকলে। মশালের আলোয় চকচক করে ওঠে ধারালো দা আর সড়কির ফলাগুলো। মিলের কাছ বরাবর আসতেই গুড়ুম করে বন্দুকের আওয়াজ শোনা যায়। ফাঁকা আওয়াজ, কিন্তু তাতেই কাজ হয় যথেষ্ট। জনতা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে মিলের ফটকের সামনে। দোতলার ওপর থেকে আওয়াজ করেছিলেন মিঃ নায়ার। সেইদিকে মুখ তুলে দাঁড়ায় সকলে। ম্লান চাঁদের আলোয় বীভৎস দেখায় কঠিন মুখগুলো। পাথরের তৈরী বলে মনে হয়। মশালের আলোয় স্পষ্ট দেখা যায়, উড়ছে অবিন্যস্ত চুলের রাশ আর জ্বলে জ্বলে উঠছে ছোট ছোট রক্তাভ চোখগুলো।

কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে চিৎকার করে ওঠে একজন, 'নেমে এসো সামনে। এদেশের মেয়েদের ইজ্জতের কতখানি দাম তা ভালো করে জানিয়ে দিই কালাদের।'

ওপর থেকে চিৎকার করে ওঠেন মিঃ নায়ার। কি বলতে চায় তারা? কিসের ইজ্জৎ? মানে মানে যদি না হটে যায় তো গুলি করতে বাধ্য হবে মিলের দারোয়ানেরা। প্রাণের মায়া যদি থাকে তো এক পা যেন এগোয় না কেউ।

'কিসের ইজ্জৎ!' বিকট আওয়াজ করে ওঠে প্রৌঢ় গোছের একজন।

চিৎকার করে উঠেই ভিড় ঠেলে পিছনে ঢুকে যায়। তারপর একটু পরেই কারা যেন ধরাধরি করে কি একটা নিয়ে এসে ছুঁড়ে ফেলে কারখানার ফটকের সামনে।

সীমাচলম আর মিঃ নায়ার প্রায় একসঙ্গেই আর্তনাদ করে ওঠে। বীভৎস দৃশ্য। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকে সীমাচলম।

শঙ্করন নায়ারের ক্ষতবিক্ষত শব। চোখ দুটো উপড়ে ফেলা হয়েছে, মাথার চুলগুলো রক্তে ভিজে লেপ্টে রয়েছে কপালের ওপরে। সারা শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে দা আর সড়কির আঘাতে।

প্রৌঢ় লোকটি দুহাতে বুক চাপড়ায় আর চিৎকার করে ওঠে, 'আমার মেয়ের ইজ্জৎ নষ্ট করার ঐ ফল। খণ্ডবিখণ্ড করেছি কালার দেহ, আজ কেরোসিন দিয়ে এই মিলের সৎকার করবো। আমি গাঁয়ের লুজি, আমার ইজ্জতের অনেক দাম।' সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে আর সবাই। মশালগুলো আকাশের দিকে তুলে ধরে গর্জন করে ওঠে।

মিঃ নায়ারকে এবার বেশ বিচলিত মনে হয়। তিনি মুখ ফিরিয়ে সীমাচলমকে বলেন, 'আপনি মিঃ কাশিমভাইকে টেলিফোনে খবর দিয়েছেন কি ? বিশ্রী কাণ্ড দেখছি শুরু হলো। পাগল হয়ে গেছে এরা। বন্দুকের গুলিতে মোটেই ভয় পাবে না। একজন ঘায়েল হলে দশজন এসে দখল করবে তার জায়গা।'

'হ্যাঁ, টেলিফোন করে দিয়েছি তো কাশিমভাইকে।' সীমাচলমের তালু পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ।

'কি বল্লেন তিনি ?'

'তিনি শয্যাগত কলিক বেদনায়। আর একজন কে ধরেছিলেন ফোন।'

বিব্রত হয়ে পড়েন ম্যানেজার সাহেব। ঠিক এই সময়ে আবার কলিক

ব্যাথায় শয্যাশায়ী হলেন কাশিমভাই! ব্যাথাটা অবশ্য মাঝে মাঝে হয় তাঁর। যখন হয় তখন আর দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। বিছানায় মূর্ছিতের মতন পড়ে থাকেন আর মধ্যে মধ্যে দাঁতে দাঁত টিপে অসহ্য চিৎকার। তার মানে কাশিমভাইয়ের এখানে আসা অসম্ভব। প্রৌঢ় লুজিকে নিশ্চয় চেনেন কাশিমভাই, এই উত্তেজিত জনতাকে হয়ত তিনিই পারতেন কিছুটা পরিমাণে শান্ত করতে।

'কে আবার ফোন ধরল আজ!'

কে যে ফোন ধরলো ভালো করেই জানে সীমাচলম। তার কণ্ঠস্বরে সমস্ত শরীরে বিদ্যুতের শিহরণ অনুভব করেছে। কিন্তু মুখে বলে, 'কি জানি, বুঝতে পারলাম না ঠিক।'

'মহা মুস্কিল।' কপালের ঘাম মুছে আবার জানলায় গিয়ে দাঁড়ান মিঃ নায়ার, 'তোমরা নরহত্যা করেছো, ফাঁসি হবার মতো কাজ করেছো তোমরা। পুলিশে ফোন করে দেওয়া হয়েছে, এখনি এসে পড়বেন তাঁরা। তোমাদের উচিত শাস্তিই হবে।'

কথাটা শোনা মাত্র আবার চিৎকার করে ওঠে প্রৌঢ়, 'নরহত্যা? দরকার হলে সমস্ত কালাদের দা দিয়ে কুপিয়ে কাটবো। আমাদের মা-বোনের ইজ্জৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে পার পেয়ে যাবে তোমরা? এই কালাকে দু'দিন সাবধান করে দিয়েছি আমি নিজে, তারপর আজ ধরেছি একেবারে হাতে নাতে। তাড়া খেয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলো শূয়োরের ছানা, কিন্তু বাঁচতে পারেনি আমাদের হাত থেকে।' কথার ফাঁকে ফাঁকে পা দিয়ে শঙ্করনের শব দেহটায় লাথি মারে প্রৌঢ় বর্মীটা, 'আর পুলিশের কথা বলছো বুঝি?' হো হো করে হেসে ওঠে লোকটি, 'লুজি হয়ে পুলিশের খবর বুঝি কিছু রাখি না আমি! পুলিশসাহেব ঘোড়ায় পিঠে চড়ে তদন্তে গিয়েছেন জিগপিন গাঁয়ে, এখান থেকে বাহান্ন মাইল দূরে। খবর

পেলেও ভোরের আগে আসতে পারছে না কেউ। তার আগেই সমস্ত কাজ শেষ হয়ে যাবে আমাদের।

ভিড়ের মধ্যে থেকে আর একজন এগিয়ে আসে। হাতের মশালটা ঘুরিয়ে চিৎকার করে ওঠে, 'কথা থাক এখন, আমাদের দেশ চড়াও হয়ে যারা আমাদেরই সর্বনাশ করতে শুরু করেছে নিপাত যাক তারা। কালাদের কারখানার চিহ্ন পর্যন্ত রাখবো না আমরা।'

মশালের আলোয় সেই লোকটাকে চিনতে অসুবিধা হয় না মিঃ নায়ারের। কো মঙ, কয়েকদিন আগে কাঠ চুরির অপরাধে একেই তাড়ানো হয়েছিলো কারখানা থেকে। সেদিন চাকরির জন্য হাঁটু গেড়ে বসেছিলো ম্যানেজার সাহেবের সামনে। আজ কিন্তু উদ্ধত ভাব, হাতের মশালের আগুনে ছাই করে দেবে সমস্ত কারখানা।

শঙ্কিত হয়ে ওঠেন মিঃ নায়ার। থানাতেও ফোন করেছিলেন তিনি, কিন্তু সবাই বাইরে গেছে তদন্তে। সত্যিই ভোরের আগে কেউই এসে পৌঁছুবে না এদিকে। কিন্তু তার আগেই সর্বনাশ যা হবার হয়ে যাবে।

'তোমরা বন্দুক নিয়ে তৈরী থাকো। যতক্ষণ গুলি আছে সমানে চালিয়ে যাও। তারপর সবই ভগবানের হাত!'

মিঃ নায়ারের স্ত্রী আর ছেলে দুটি চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। সীমাচলম জানলার কপাট ধরে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মরিয়া হয়ে উঠেছে সবাই। তিনচারশ লোকেরও বেশী। গুলি করে আর কটাকে মারতে পারবে এরা? মিঃ নায়ারও তৈরী থাকেন বন্দুক নিয়ে। প্রৌঢ় লোকটি উত্তেজিতভাবে জনতার দিকে চেয়ে কি বলছে দুটো হাত তুলে। বিক্ষুব্ধ জনতার অবিশ্রান্ত চিৎকারে চৌচির হয়ে ফেটে যায় রাত্রির আকাশ।

হঠাৎ অনেক দূরে মোটরের হর্ণ। প্রথমে অস্পষ্ট তারপরে স্পষ্ট। জনতা সহসা দুভাগ হয়ে যায়। ভীষণ জোরে আসছে মোটরটি অনবরত

হর্ণের শব্দ করে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন মিঃ নায়ার, যাক, কাশিমভাই এসে গেছেন। যাহোক একটা কিছু করবেন তিনি। ঝুঁকে পড়ে দেখে সীমাচলম। প্রকাণ্ড লাল মোটর কাশিমভাইয়ের। যাক, ঠিক সময়ে এসে পড়েছেন তিনি। কিন্তু কিভাবে থামাবেন এই উত্তেজিত জনতাকে? হাত দিয়ে কপালের ঘাম মোছে সীমাচলম।

মোটরের চারপাশে ঘিরে দাঁড়ায় সড়কি আর দা হাতে বর্মী জনতা। যেই আসুক, দাম দিতে হবে তাদের ইজ্জতের।

কিন্তু কাশিমভাই নয়। এক পা এক পা করে মোটর থেকে পিছিয়ে আসতে শুরু করে সবাই। এ আবার কে? মিঃ নায়ার আর সীমাচলম অভিভূতের মত চেয়ে থাকে। মোটরের দরজা খুলে নামে হামিদা বাসু। বর্মীর পোশাক। কালো সিল্কের লুঙ্গি। পুঁতির আর জরির কাজগুলো জ্বলে জ্বলে ওঠে মশালের আলোয়। হাতে দামী জড়োয়া গয়না আর কানে চুনির ফুল। মোটর থেকে নেমেই দারোয়ান দাঁড়াবার যে উঁচু চাতালটা ছিলো ফটকের সামনে, লাফিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে তার ওপরে।

একটা হাত তুলে ধরে উত্তেজিত জনতার সামনে, তারপর চিৎকার করে বলে, 'আমার বর্মী ভাইরা, কাশিম সাহেব অসুস্থ, তাঁর প্রতিভূ হয়ে আমিই এসেছি আপনাদের কাছে। বলুন আপনাদের কি বলবার আছে?'

আশ্চর্য, একটুও কাঁপছে না হামিদা বাসুর গলা। অচঞ্চল, স্থির, সংযত গলার স্বর। শুধু বাতাসে কপালের কাছে উড়ছে দু-একটা চুল, গলায় জড়ানো সিল্কের দামী বন্ধনীটা দুলছে এদিক থেকে ওদিকে।

মিনিট দুয়েক স্তব্ধতা, তারপর ফেটে পড়ে প্রৌঢ়টি রুদ্ধ আক্রোশে, 'আমাদের মেয়ের ইজ্জতের দাম চাই আমরা। এ কারখানা আর ম্যানেজারের বাংলো পুড়িয়ে ছাই করে দেবো। ওর কোন আত্মীয়কে আমরা জীবিত থাকতে দেবো না।'

প্রৌঢ়ের ইঙ্গিতে শঙ্করনের শবের দিকে চোখ ফেরায় হামিদা। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়েই আবার মুখ ফেরায় জনতার দিকে, 'দুর্বৃত্তের এর চেয়ে উপযুক্ত শাস্তি আমি নিজেও কল্পনা করতে পারতুম না। মেয়েদের ইজ্জতের মর্যাদা যারা রাখতে জানে না, তাদের মৃত্যু এইভাবেই হওয়া উচিত। যে সমাজে মেয়েদের অবমাননাকারীর শাস্তি হয় না সে সমাজে পুরুষ নেই, আছে নপুংসক! এগিয়ে আসুন আপনি। দুষ্টের সমুচিত শাস্তি আপনি দিয়েছেন, ফয়া আপনার কল্যাণ করুন।'

থতমত খেয়ে যায় প্রৌঢ় লোকটি। একবার হামিদা বানুর দিকে চেয়ে কিছুটা এগিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। এইবার হামিদা বানু এগিয়ে যায়। গলা থেকে সবচেয়ে দামী হারটা খুলে জড়িয়ে দেয় লুজির হাতে। বলে, 'ফায়ার কাছে এই প্রার্থনা করি, স্ত্রীলোকদের মর্যাদা যেন আপনার দ্বারা চিরদিন রক্ষিত হয়। কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারছি না আমি! এই পশুটার দেহ নদী পার করে কেন কষ্ট করে বহন করে আনলেন আপনারা? নদীর ওপারে ঝোলাবার মত উপযুক্ত গাছের ডালের অভাব ছিলো নাকি?'

পিছন থেকে কে চিৎকার করে উঠে, 'ওর আত্মীয়স্বজনকে উপহার দেবার জন্য এনেছি ওর দেহ। আর যত বিষের মূল এই কারখানা। এই কারখানা জালিয়ে দেবো।'

কুঞ্চিত হয়ে ওঠে হামিদার সুন্দর দুটি ভ্রূ। জনতার দিকে ফিরে বলে, 'যত বিষের মূল এই কারখানা! এ কি বলছেন আপনারা? এখানে একশ'র বেশী মেয়ে কুলি কাজ করে, বলতে পারবে কেউ একদিনের জন্যও কোনরকম অসম্মানজনক ব্যবহার করা হয়েছে তাদের সঙ্গে? কাশিমভাই সমস্ত উৎসবে নিজে তাদের সঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া করেছেন। আমার বিয়ের সময় প্রত্যেককে দামী লুঙ্গি আর ফানা দেওয়া

হয়েছে একজোড়া ক'রে। এই কারখানার সঙ্গে কি সম্পর্ক ওই নরপশুটার? এই কারখানার মালিক কিম্বা ম্যানেজারের কাছ থেকে কোনরকম খারাপ আচরণ কোনদিন পেয়েছেন আপনারা? আর তা ছাড়া, এ কারখানা পুড়ে ছাই হয়ে গেলে কি সুবিধা হয় আপনাদের? যে সব মেয়ে কুলি এখানে কাজ করে, আপনাদেরই মেয়ে আর বোনেরা, কারখানা পুড়ে গেলে তারা কাজ করতে যাবে নামটুর রূপোর খনিতে কিম্বা টিনের কারখানায়। সেখানে মর্যাদা কি অক্ষুণ্ণ থাকবে তাদের, বলুন আপনারা? আমি কথা দিচ্ছি আপনাদের এ নিয়ে কোন হৈ চৈ করবো না আমরা। আপনাদের ইচ্ছা হয়, এই মাদ্রাজী কালার দেহ নিয়ে যেতে পারেন সঙ্গে করে, কিম্বা যদি বলেন, আমরাই আপনাদের সামনে দাহ করতে পারি দেহটা নদীর ধারে। এই কারখানা অন্ন জোগাচ্ছে আপনাদের দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে; একে ধ্বংস করা মানে নিজেদেরই সর্বনাশ করা।'

কথাগুলো আস্তে আস্তে বলে হামিদা বানু। ধীর গলার আওয়াজ, কিন্তু প্রত্যেকটি কথা স্পষ্ট। আবিষ্টের মত দাঁড়িয়ে থাকে সীমাচলম। সব কিছু ওর কাছে যেন একটানা স্বপ্নের মত মনে হয়। কোথা থেকে পেলো হামিদা বানু এই সাহস আর বলার এ অপূর্ব ভঙ্গি!

হামিদা বানুর কথাগুলো কাজ করে জনতার মধ্যে। লুজি পিছন ফিরে কি বোঝাবার চেষ্টা করে। প্রথমে খুব উত্তেজিত কয়েকটা কথার বিনিময়, তারপর ঝিমিয়ে আসে সব কিছু। মশালগুলো নিভে আসে আস্তে আস্তে। লুজিকে ঘিরে গোল হ'য়ে বসে জনতা। কিছুক্ষণ পরে পিছনের সবাই পিছিয়ে যায় নদীর দিকে। সামনের কয়েকজন এগিয়ে এসে তুলে নেয় শঙ্করনের মৃতদেহ। তারপর লুজি এসে দাঁড়ায় হামিদার সামনে, বলে, 'চললুম আমরা।'

চাঁদের আলোয় পাণ্ডুর আর বিষণ্ণ দেখায় হামিদা বাসুর মুখ। কারখানার পাঁচিলে হেলান দিয়ে চুপ করে সে দাঁড়িয়ে থাকে।

বর্মীরা শাম্পানে গিয়ে ওঠে। ছলাৎ ছলাৎ করে দাঁড়ের শব্দ জলের ওপরে। ফিরে যাচ্ছে ওরা।

এতক্ষণে নেমে আসেন মিঃ নায়ার। সীমাচলমও দ্রুতপদে নেমে আসে পিছন পিছন।

কারখানার ফটক খুলে হামিদা বাসুর কাছে গিয়ে দাঁড়ান ম্যানেজার সাহেব, 'বিবিসাহেবা, কারখানার তরফ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আপনাকে। মহা বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন আজ আমাদের, নইলে দু'তরফে অনেকগুলো খুন-খারাপি হয়ে যেত আজ!'

এবারেও হামিদা বাসু নির্বাক। দুটি চোখে পলক নেই তার। ফ্যাকাশে মুখে রক্তের বিন্দুমাত্র আভাসও নেই।

তার পাশে গিয়ে দাঁড়ায় সীমাচলম। আস্তে ডাকে, 'হামিদা!' হামিদা ফিরে চায় তার দিকে। একটা হাত বাড়িয়ে দেয়। তারপর দুলে ওঠে সমস্ত শরীরটা। মাটিতে লুটিয়ে পড়বার আগেই হামিদার শরীরটা জাপটে ধরে সীমাচলম। দু'হাতে পাঁজাকোলা করে তাকে নিয়ে আসে মিঃ নায়ারের বাংলোয়। হামিদা সম্পূর্ণ অচেতন। তার মাথাটা কোলে নিয়ে অনেকক্ষণ বাতাস করে। মিঃ নায়ারের কাছ থেকে ব্র্যাণ্ডি নিয়ে আস্তে আস্তে ঢেলে দেয় হামিদা বাসুর মুখে, কিন্তু মুখে যায় না সবটা, কশ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে।

অনেকক্ষণ পরে খুব জোরে কেঁপে ওঠে হামিদা বাসুর সমস্ত শরীর। আস্তে চোখ দুটো সে খোলে। লাল দুটি চোখ, আর উদাস দৃষ্টি। ঝুঁকে পড়ে সীমাচলম, 'হামিদা, হামিদা!'

বেশ কিছুক্ষণ পরে কথা বলে হামিদা বাসু, 'তুমি টেলিফোনে ডেকেছিলে!'

কোন কথা বলে না সীমাচলম। চোখ দুটো বুজে এসেছে হামিদা বামুর। বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। মাথাটা কোল থেকে নিয়ে আস্তে আস্তে বালিশে শুইয়ে দেয়।

পাশেই একটা চেয়ারে বসেছিলেন মিঃ নায়ার। খুব চাপা গলায় বল্লেন, 'বিবিসাহেবা ঘুমিয়ে পড়েছেন বুঝি ?'

'হ্যাঁ।'

জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় সীমাচলম। অনেক দূরে সালুইন নদীর ওপারে ঘন ঝোপ। পাহাড়ের ওপরে জ্বলজ্বল করে শুকতারা। ভোর হবার বুঝি আর দেরি নেই।

বেশ কয়েকদিন পরে দেখা মেলে কাশিমভাইয়ের। সামনের ঘরে ছেলেগুলোকে নিয়ে পড়ানোয় ব্যস্ত ছিলো সীমাচলম। হঠাৎ কাশির শব্দ করে পর্দা ঠেলে ঘরে ঢোকেন কাশিমভাই।

'কেমন পড়াশুনা করছে আপনার ছাত্রেরা ?'

একটু বিব্রত হয়ে পড়ে সীমাচলম। এ প্রশ্নটা একটা ভূমিকা মাত্র, তা বুঝতে তার একটুও অসুবিধে হয় না। কিন্তু কি কথা বলবেন তিনি ? অসময়ে এভাবে এ-ঘরে কোনদিনই তো আসেন না !

'থাক আজ এই অবধি', ছেলেদের দিকে চেয়ে বলেন কাশিমভাই। তারপর চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে সীমাচলমের দিকে ফিরে বলেন, 'চলুন, মিলের দিকে যাবো একবার। আপনাকে পথে নামিয়ে দেব।' কাশিমভাইয়ের গলায় আদেশের স্বর। কোথায় যেন হয়েছে কিছু একটা। গাড়িতে উঠে সীমাচলম সন্তর্পণে বসে তাঁর পাশে। প্রতি মুহূর্তে অপেক্ষা করে কাশিমভাইয়ের কথার। কিন্তু সীটে হেলান দিয়ে চোখ বুজে চুরুটে কেবল টানের পর টান দিয়ে চলেন কাশিমভাই। সাড়া নেই তার। ভারি অস্বস্তি

বোধ করে সীমাচলম। কেমন থমথমে পরিস্থিতি। ঝড়েরই পূর্ব্বাভাষ বুঝি। প্রচণ্ড এক ঝড়ে আবার বুঝি নিশ্চিহ্ন হবে তার নীড়, তারপর বিসর্পিল অনন্ত পথ, ধুলোর ঝাপটা আর উত্তপ্ত রোদ বাঁচিয়ে আবার চলা শুরু হবে।

'রাখো।'

প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে যায় গাড়িটা। সালুইন নদীর ধারে ছোট এক গোরস্থান অল্প একটু জায়গা ঘিরে। চাঁদের ম্লান আলোয় অস্পষ্ট দেখা যায় সাদা কবরগুলোর আশেপাশে বুনো ফুলের গাছ। একটা উগ্র সুরভি ভেসে আসে বাতাসে।

কাশিমভাই জোর পায়ে একেবারে নদীর শান-বাঁধানো চাতালটায় গিয়ে বসেন। উপায় নেই সীমাচলমের, তার ইঙ্গিতে পাশেই বসতে হয় তাকে।

'আকিয়াবে আমার অফিস রয়েছে একটা। সেখানে আমার একজন কাজ-জানা লোকের প্রয়োজন। আপনাকে সেখানেই পাঠাবো ভাবছি। অফিসের দেখাশোনা করবেন, আমার সঙ্গে যোগাযোগও ছিন্ন হবে না। তেলের কলগুলোও বিশেষ সুবিধের চলছে না। আপনি গিয়ে একটা বন্দোবস্তও করতে পারবেন সেগুলোর।'

সীমাচলম ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়, তারপর উঠে নদীর ধার দিয়ে চলতে শুরু করে। কিছুদূরে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে দেখে কাশিমভাইয়ের দিকে। নমাজে বসেছেন কাশিমভাই। হাঁটু গেড়ে বসে কাতর প্রার্থনা হয়তো জানাচ্ছেন খোদাকে। আল্লা, আমার গৃহে শান্তি ফিরে দাও। সর্পরূপী শয়তানকে এখান থেকে সরিয়ে দাও রসুলাল্লা। আমার মোনাজাত পূর্ণ করো।

নিঃশ্বাস ফেলে চলে আসে সীমাচলম। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসে না তার। বিছানায় শুয়ে ছটফট করে। কি একটা যেন অভিশাপ কিছুতেই

কোথাও স্থায়ী হতে দেবে না ওকে। একটু ঘর বাঁধার আভাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কার অমোঘ নির্দেশ আসে ঘর ভাঙার। পিঠে তল্পি-তল্পা গুটিয়ে অনুর্বর পথের ওপর দিয়ে আবার নূতন করে যাত্রা শুরু। শুভলক্ষ্মী, মা পান আর হামিদা বানু একের পর এক শুধু চাবুকের আঘাতে ওকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায় দেশ থেকে দেশান্তরে।

প্রথম দৃষ্টিতে আকিয়াব শহরটি ভালোই লাগে সীমাচলমের। রামরি আর চেডুবার পাশ কাটিয়ে সন্তর্পণে জেটিতে ভিড়ে জাহাজ ডুবন্ত দ্বীপ বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে। ফিকে সবুজ জলের রং, মাঝে মাঝে ঘোলাটে। সিঁড়ি দিয়ে নেমেই কিন্তু বিশ্রী লাগে সীমাচলমের। অসম্ভব ধুলো আর বালি, নোংরা নালার পাশে পাশে নীল মাছির ভিড়। দুর্গন্ধে পকেট থেকে রুমাল বের করে নাকে চেপে ধরে।

তেলের কলের ম্যানেজারের সঙ্গে গেটের কাছেই দেখা হয়ে যায়। জাতে ফিরিঙ্গি লোকটা। বাঁ পা-টা হাঁটু পর্যন্ত কাটা। কোন্ মিলে নাকি কিছুটা রেখে আসতে হয়েছিলো। ওঁর এই অঙ্গহীনতাই এখন ওঁর সব চেয়ে বড়ো সার্টিফিকেট। যখন তখন মজুর আর মিস্ত্রীদের শোনান জোর গলায়, 'দেখেছো, নিজের দেহের কিছুটা রেখে এসেছি যন্ত্রের তলায়। এসব কাজ অমনি হয় না। চুরুট ফুঁকে সুপারভাইজারের চোখ এড়িয়ে ঘুম মারলেই হয় না। জান দিতে হয় এই সব কাজে। আধখানা পা করাত দিয়ে চিরে চিরে কেটে ফেললো ডাক্তাররা, কিন্তু লাইন ছেড়েছি আমি?

মিলের কাজ আমায় করতেই হবে।' ভারি ভারি যন্ত্রগুলোর গায়ে হাত বুলান আর বলেন, 'এরা সব আমার দোস্ত। কিন্তু ভারি জবরদস্ত দোস্ত। একটু অসাবধান হয়েছিলাম, ব্যস, নিলে ঠ্যাংয়ের কিছুটা সরিয়ে।'

অগস্‌টিন সাহেব এদিকে বেশ হাসিখুশি দিলদরিয়া মেজাজের লোক। কুলি মজুরদের সঙ্গে মিলে মিশে হৈ হৈ করে বেড়ান। সীমাচলম নামতেই চিৎকার করেন সাহেব, 'মিঃ সীমাচলম! আশা করি ঠিক আছে! কাশিম-ভাইয়ের তার আর চিঠি আমি পরশু পেয়েছি। চলে আসুন সোজা।'

সীমাচলমের হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে আসেন অগস্‌টিন সাহেব। ছোট্ট মিল। পাশেই কাঠের একটা ব্যারাক। খুপরি খুপরি ঘর। সীমাচলমের একলার পক্ষে তাই যথেষ্ট। তিনটি ভাগ করা। বড়োটিতে থাকেন অগস্‌টিন সাহেব সস্ত্রীক। মধ্যেরটি উপস্থিত খালি। সীমাচলমের জন্য নির্দিষ্ট হয় সেটা। আর শেষের ঘরটায় থাকেন মিলের একাউন্টেন্ট বাঙালী ভদ্রলোক ভবতারণ বসু। সম্প্রতি একলাই রয়েছেন। দু-একদিনের মধ্যেই বাঙলাদেশ থেকে স্ত্রী এসে পৌঁছোবেন তাঁর। প্রতিবেশী হিসাবে কেউই মন্দ নয়। মিলে সীমাচলমকে ঠিক যে কি কাজ করতে হবে তা সীমাচলমও জানে না। কাশিমভাইয়ের চিঠিতে তার বিশেষ কিছু নির্দেশও ছিলো না। মনে মনে হাসে সীমাচলম। ওকে শুধু কাশিমভাইয়ের সংসার থেকে সরাবার প্রয়োজন হয়েছিল, যত শীঘ্র হোক আর যেখানেই হোক। আগাছা সরিয়ে ফেলাই দরকার, অন্য কোথাও তার স্থান নির্দেশের কি প্রয়োজন থাকতে পারে?

অগস্‌টিন সাহেব হুঁশিয়ার লোক। সীমাচলমের কথাবার্তায় আর চালচলনে কাশিমভাইয়ের সঙ্গে তার সম্পর্কের যোগসূত্র আন্দাজ করতে পারেন। কর্তার জানিত লোক কাজেই তাকে কেরানীর দলে ফেলা যায় কি আর! মিলের চিঠিপত্র আর শাসনযন্ত্রের ভারটা সীমাচলমের ওপরে ছেড়ে দেন অগস্‌টিন সাহেব। বলেন, 'ব্যস, ভাগাভাগি করে নিলাম কাজ

আজ থেকে। আমি দেখবো মেসিন আর যন্ত্রপাতি, আর আপনি দেখবেন কাগজপত্তর আর অফিসের নিয়মকানুন। ঝঞ্ঝাট থাকবে না কোন।'

ঝঞ্ঝাট অবশ্য থাকবার কথাও নয়। এই তেলের মিলটা কেন যে এখনও খাড়া করে রেখেছেন কাশিমভাই তার কোন হদিসই পায় না সীমাচলম। অন্য সমস্ত তেলের কল যেসব জায়গায় চিনাবাদাম উৎপন্ন হয় তারই চার পাশ জুড়ে। এতে খরচও কম হয় আর হাঙ্গামাও সেই পরিমাণে খুবই সামান্য। কিন্তু এখানে মজুরি পোষায় না মোটেই। রেল আর স্টীমার ভাড়াতেই প্রচুর খরচ হয়ে যায়। অবশ্য ব্যবসায়ীদের এ-ও একটা ভড়ং। প্রদেশের বড়ো বড়ো জায়গায় নিজেদের বিজ্ঞাপন লটকে দেওয়া, জাহির করা নিজেকে। কাঠের মিল, তেলের মিল, ধানের কল, লুঙ্গির ব্যবসা, হাতীর দাঁতের কারবার, কি নেই কাশিম সাহেবের? এর মধ্যে দু-একটা যদি কম লাভজনকই হয়, তাতেই বা কি ক্ষতি!

বেশ কিছুক্ষণ বসে বসে ভাবে সীমাচলম। আচমকা বাধা পায়, পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন ভবতারণবাবু। প্রৌঢ় ভদ্রলোক, দিব্বি গোলগাল চেহারা, মাথায় আধুলি মাপের একটি টাক। সর্বদাই হাস্যমুখ, পৃথিবী একটা বেড়াবার জায়গা এমনি মনের ভাব।

আস্তে আস্তে সীমাচলমের পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলেন, 'গুড মর্ণিং, কেমন লাগছে নতুন জায়গাটা?'

'মন্দ কি, ভালোই তো। তবে আর একটু ধূলো কম হলেই যেন ভালো হতো।'

'ধূলোর কথা যদি তুললেন, তবে বলি। এ আর কি ধূলো দেখছেন! প্রথম যেবার আমি শ্বশুরবাড়ি যাই বিয়ের পরে গরমকাল। ইস্টিশন থেকে প্রায় কোশ পাঁচেক হবে শ্বশুরবাড়ি। গরুর গাড়িতে যেতে হয়। রাঢ়

দেশের ধূলো মশাই, বিখ্যাত ধূলো। সূর্য দেখা যায় না এমন ধূলোর বহর। উঃ, কি ধূলোরে বাবা, তার তুলনায় তো এ সোনার দেশ।'

বিস্ময়ে চোখ তুলে দেখে সীমাচলম। কয়েকদিনের আলাপে এইটুকু বুঝতে পারে, একটু বেশীই কথা বলে লোকটি। আলাপ-আলোচনায় বেশ একটু অন্তরঙ্গতার ভাব।

'আপনার স্ত্রী তাহলে সেই ধূলোর দেশ থেকেই আসছেন, কি বলেন?' হাল্কা পরিহাসের সুরে বলে সীমাচলম।

একটু বিব্রত হয়ে পড়েন ভবতারণবাবু। পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ে' হাসেন টিপে টিপে, বলেন, 'না, এ বৌ আমার খাস কলকাতার মেয়ে। ধূলোর নামগন্ধ নেই। আমার প্রথমপক্ষের স্ত্রী বেঁচে নেই।'

কথাটা ঘুরিয়ে নেবার চেষ্টা করে সীমাচলম, 'আপনার স্ত্রী আসবেন কবে?'

'কাল জাহাজে উঠবে। চিঠি পেয়েছি একখানা বড় শালার কাছ থেকে।' বেশ একটু উৎফুল্লই মনে হয় ভবতারণবাবুকে। উৎফুল্ল হওয়াটাই স্বাভাবিক। বিদেশে নিঃসঙ্গতার মত অভিশাপ আর কি আছে? বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে সীমাচলমের।

ব্যাপারটাকে লঘু করার চেষ্টায় সীমাচলম বলে, 'আমার এখানে থাকাই হলো মুস্কিল!'

'কেন বলুন তো, মুস্কিলটা কিসের?'

'এপাশে অগস্টিন সাহেব থাকবেন সস্ত্রীক, আপনারও স্ত্রী আসবেন দিন তিনেক পরেই। আর মধ্যে আমি বেচারা বায়ু-ভূতো নিরাশ্রয়!'

হো হো করে হেসে ওঠেন ভবতারণবাবু। তারপরেই হাসিটা থামিয়ে ঝুঁকে পড়েন সীমাচলমের দিকে, 'আসল ব্যাপারটা মশাই শুনুন তাহলে। ওই যে ঢ্যাঙা মতন মেয়েটা অগস্টিন সাহেবের বাড়িতে থাকে, আপনার ধারণা বুঝি ওটি ওর স্ত্রী! হা ভগবান!'

ব্যাপারটা আবছা বোঝে সীমাচলম, তবু চেষ্টা করে' বিস্ময়ের ভাব আনে সারা মুখে, 'স্ত্রী নন, সে কি ? উনি তো বললেন ওঁর স্ত্রী !'

'তা ছাড়া আর বলবে কি ? আরে মশাই আজ দশ বছর রয়েছি এখানে। আমাদের চোখে ধুলো দেওয়া কি সোজা কথা ! বছর তিনেক আগে এক জাহাজ-ডুবি হয় এই আকিয়াবের ধারে কাছে কোথাও। বরাতের জোর দেখুন মশাই, সব গেলো তলিয়ে, কেবল ঐ মাগীটা তক্তা জড়িয়ে ভাসতে ভাসতে এসে ঠেকলো চড়ায়। অগস্টিন সাহেব শিকার করতে গিয়ে দেখতে পায় ওকে। নিয়ে এলো ঘরে তুলে। ব্যস, সেই থেকে আর যাবারও নাম করে না মাগী। বলে ও নাকি জার্মান ! কিন্তু ও যে কেন চাটগাঁয় এসেছিলো আর যাচ্ছিলই বা কোথায়, ভগবান জানেন। ও সব একেবারে বাজে কথা মশাই, ছেলে ভুলানো গল্প। জার্মানী না হাতী ! লোক-ধরা ব্যবসা ওদের, এই করে বেড়ায়। আরে বলবো কি আপনাকে আমি বারান্দায় বেড়াই ভোরের দিকটা, আর মাগী ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থাকে পাশের বারান্দা থেকে ! তবে আমার তুই করবি কচু। চোখাচোখি হ'লেই ঘরের ভেতর ঢুকে প্যাটরা খুলে বৌয়ের ফটো নিয়ে বসি। সাধে কি আর বিদেশে বিভুঁয়ে তাড়াতাড়ি পরিবার নিয়ে আসছি মশাই !'

অগস্টিন সাহেবের স্ত্রী মার্থাকে কিন্তু ভালোই লাগে সীমাচলমের। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহ, দৃঢ় ঠোঁট আর সবচেয়ে ভালো লাগে সমুদ্রের চেয়েও নীল দুটি চোখ। প্রথম দিনে অগস্টিন সাহেবের বাড়িতেই নিমন্ত্রণ ছিলো সীমাচলমের। ছেলেপিলে নেই, শুধু স্বামী আর স্ত্রী। ছোট্ট পরিচ্ছন্ন নিটোল সংসার।

মার্থা জিজ্ঞেস করে, 'আপনার দেশ মাদ্রাজ অঞ্চলেই না ?'

'হাঁ, মাদ্রাজ শহর থেকে বেশী দূরে নয় আমাদের গ্রাম।'

'মাদ্রাজ শহরটি আমার খুব ভাল লাগে। সমুদ্রের কোল ঘেঁষে ভারি পরিষ্কার শহরটি।'

'আপনি মাদ্রাজেও ছিলেন বুঝি?'

'হ্যাঁ, প্রায় মাসখানেক ছিলাম ক্রুগারের সঙ্গে', একটু থেমে মার্থা বলে, 'ক্রুগার আমার স্বামীর নাম।'

একটু অস্বস্তি বোধ করেন অগস্টিন সাহেব। স্যুপের বাটিটায় চামচ নাড়তে নাড়তে বলেন, 'মানে, আমার সঙ্গে মার্থার বিয়ে হয়েছে আজ বছর তিনেক হ'লো।'

মার্থাকে কিন্তু বিশেষ বিচলিত মনে হয় না। 'ক্রুগার এসেছিলো মাদ্রাজে একটা মেসিন বসাতে ওর কোম্পানীর তরফ থেকে। মাদ্রাজ থেকেই ফিরে গেছে বের্লিনে। আমার কিন্তু ভারতবর্ষটা এতো ভালো লেগে গেলো যে, আমি বললাম এ দেশটা সমস্ত ঘুরে দেখবো আমি। ক্রুগার আমার কোন ইচ্ছায় বাধা দেয় না কখনও। আমাদের ছাড়াছাড়ি হলো। আমি মাদ্রাজ, বোম্বাই, কলকাতা সমস্ত ঘুরে চিটাগাং থেকে রেঙ্গুনে আসবার সময় দৈবদুর্ঘটনায় পড়লাম। তারপরেই পলের সঙ্গে আমার আলাপ। তাই না পল?' জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে অগস্টিনের দিকে চায় মার্থা।

স্যুপের বাটি ছেড়ে ততক্ষণে কড়াইশুঁটির ঝোলে নজর দিয়েছেন অগস্টিন সাহেব। ঘাড় নেড়ে মার্থার কথার জবাব দিলেন।

মিলের কাজ বলতে এমন কিছুই নেই। বড়ো জোর জন বিশেক মিস্ত্রী আর মজুর, আর গোটা চারেক বাবু। তাহলে কি হয়, সারাটা দিন হাঁকডাকে কান পাতা যায় না মিলে। সমস্ত দিন চরকির মতন ঘোরেন ম্যানেজার সাহেব। তাঁর হৈ চৈয়ের ঠেলায় মনে হয় যেন হাজার খানেক

কুলি মজুর নিয়ে প্রকাণ্ড একটা মিলের তত্ত্বাবধান করছেন তিনি। কোণের দিকে ছোট একটা টেবিলে একরাশ খাতাপত্তর ছড়িয়ে বসেন ভবতারণবাবু। কাজের মধ্যে তিনি পানের ডিবে থেকে পাঁচ মিনিট অন্তর পান মুখে দেন আর চশমাটা নাকের ডগায় ঠেলে দিয়ে প্রকাণ্ড লেজার খাতাটায় দাগ দেন মাঝে মাঝে। তাঁর পাশেই সীমাচলমের বসবার জায়গা। চিঠিপত্রের মধ্যে বেশীর ভাগই হচ্ছে জাহাজ কোম্পানীর সঙ্গে। চীনাবাদামের বস্তার কম ডেলিভারী নিয়ে ঝগড়া। গত সপ্তাহে সতেরো বস্তা কম এসেছে। ব্যাপারটা নিয়ে খুব কড়া করে চিঠি লিখতে হবে জাহাজ কোম্পানীকে। প্রত্যেক সপ্তাহেই গোলমাল হয় বস্তার সংখ্যায়, কারণ তলব করতে হবে এর।

'আস্তে ব্রাদার আস্তে। মাসে চার পাঁচখানা তো চিঠি। তা কি আর অত তাড়াতাড়ি শেষ করতে আছে?'

হেসে ভবতারণবাবুর দিকে মুখ ফেরায় সীমাচলম, 'কাজ যাই থাক, চটপট করে ফেলাই ভালো। দেখেছেন তো অগস্টিন্ সাহেব কি রকম ছুটে বেড়াচ্ছেন সারা মিলে '

'ওর কথা বাদ দিন। এক ঠ্যাংয়ে যেন দশ ঠ্যাংয়ের কাজ করছে সাহেব। এদিকে তো সাহেব ছুটোছুটি করছে আর ওদিকে—' চোখটা মটকে হাত দুটোর অদ্ভুত ভঙ্গি করেন ভবতারণবাবু।

'ওদিকে কি?'

'না, কি আর! সাহেব বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই মেমও হাওয়া। সমস্ত দিন কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায় ঠিক-ঠিকানা নেই।'

বারোটা বাজতেই খাতাপত্তর বন্ধ করে ফেলেন ভবতারণবাবু। কলম পেন্সিল গুছিয়ে ড্রয়ারজাত করেন।

'কি ব্যাপার এরই মধ্যে বন্ধ করলেন চিত্রগুপ্তের খাতা?'

'হে, হে, আজ উঠতে হবে তাড়াতাড়ি। একটু ইয়ে রয়েছে—বলেছি অগস্টিন সাহেবকে—'

'কি ব্যাপার ?'

'ঐ ওর নাম কি, পরিবার আসবে কিনা আড়াইটে নাগাদ। একবার স্টীমার ঘাটে যেতে হবে।'

এবার সমস্ত পরিষ্কার হয়ে আসে। খুব ভোরবেলাই ঝাঁটা নিয়ে সামনের বারান্দাটা নিজের হাতে পরিষ্কার করছিলেন ভবতারণবাবু। তারপর ছেঁড়া লুঙ্গি দিয়ে পর্দা টাঙানো হ'লো দুটো জানলায়। বাজারটাও আজ নিজেই করেছিলেন তিনি। আয়োজন সম্পূর্ণ, শুধু দেবী আসবার অপেক্ষা।

বিকেলের দিকে বাড়ি ফিরেই কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সীমাচলম। লম্বা টানা বারান্দাটার মাঝখানে কাঠের পার্টিশন উঠছে। ভবতারণবাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তদারক করছেন।

সীমাচলমকে দেখেই হাসলেন, 'এই, একটু প্রাইভেসির বন্দোবস্ত করছি। এবারে তো ফ্যামিলিম্যান হয়ে পড়লাম, একটু আব্রু না থাকলে কেমন যেন দেখায়।'

একটু আব্রু ? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে সীমাচলম। বারান্দার একপাশ আড়াল করে প্রকাণ্ড পার্টিশন উঠছে। নিচে রান্নাঘরের সামনেটাও দর্মা দিয়ে ঘেরা হয়েছে। মানে অন্তরালবর্তিনীকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখবার যত রকম সম্ভব অসম্ভব উপায় ছিলো সবই করেছেন ভবতারণবাবু। সত্যই তো, ঘরের বৌয়ের আব্রু আছে তো একটা। সবাই তো আর অগস্টিন সাহেব নয় ?

ভবতারণবাবু ক্রমে ক্রমে দুর্লভ হয়ে উঠলেন। মিলে কয়েক ঘণ্টা ছাড়া সকাল বিকাল তো দেখাই পাওয়া যায় না তাঁর। হঠাৎ

চোখাচোখি হয়ে গেলে বিব্রত হয়ে পড়েন ভবতারণবাবু, পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে বলেন, 'এমন মুস্কিল হয়েছে, একেবারে একলা থাকতে পারে না। বড়ো বংশের মেয়ে, দিনরাত লোকজন ঘিরে থাকতো, এখানে একলাটি এসে হাঁপিয়ে মরছে বেচারী।'

বেচারীর জন্য কষ্টই হয় সীমাচলমের। বিদেশে সত্যিই একলা পড়ে গেছে মেয়েটি। শহর থেকে মিলটা এত দূরে যে অন্য কোন বাঙালী পরিবারের সঙ্গে আলাপের যোগসূত্র রাখাও মুস্কিল।

সেদিন সকাল থেকে টিপ টিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছিলো। মাথার কাছের জানলাটা খোলা থাকায় ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছিল সীমাচলমের। মাথাটা ভারি আর গাঁটে গাঁটে ব্যথা। বেলা একটার পর থেকে গা বেশ গরমই হয়ে ওঠে। অগস্টিন সাহেবকে বলে ছুটি নিয়ে বাড়িতে চলে আসে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে আধা-হিন্দী আধা-বাঙলায় মেশানো খিচুড়ি ধরনের কথাবার্তা কানে যেতেই দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখে অগস্টিন সাহেবের বারান্দায় পাশাপাশি দুটি চেয়ারে বসেছে মার্থা আর একটি অল্পবয়সী মেয়ে। মুখের পাশের কিছুটা দেখা যাচ্ছে। বয়স খুবই কম মনে হয়, এমন কি বছর চোদ্দ-পনেরোর বেশী তো নয়ই।

কথাবার্তা হচ্ছিলো দুজনের মধ্যে। মার্থা বলছিলো, 'তোমার বয়স কত? এত অল্পবয়সে বিয়ে হয় তোমাদের?'

খিল খিল করে হেসে ওঠে মেয়েটি, বলে, 'আমার বয়স পনেরো বছর। আমার তো তবু বেশী বয়সে বিয়ে হয়েছে গো। আমার দিদি আমার বিয়ে হয়েছে ন'বছরে। আহা, দিদি আমার দশ বছরে হাত খালি করে ফিরে এলো বাপের বাড়ি!'

সিঁড়িতে বেশীক্ষণ আর দাঁড়ায় না সীমাচলম। জুতো ঠুকে ঠুকে জোরে জোরে ওপরে উঠে আসে। পায়ের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই হুড়মুড়

করে একটা শব্দ হয়। আন্দাজে বুঝতে পারে সীমাচলম, ভবতারণবাবুর পরিবার সশব্দে পালিয়ে আব্রু রক্ষা করলেন।

সন্ধ্যার দিকে ভবতারণবাবু আর অগস্টিন সাহেব দুজনেই এলেন দেখতে। অগস্টিন সাহেব একটু থেকেই উঠে পড়েন, 'মিঃ সীমাচলম, আজ রাত্রের মত রুটি আর দুধ আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। শহরের দিকে যেতে হবে একবার, অমনি ডাক্তার মিণ্টকে আমি খবর দিয়ে দিচ্ছি আসবার জন্য।'

'না, না, ডাক্তার ডাকবার দরকার হবে না।' ব্যস্ত হয়ে ওঠে সীমাচলম। 'সর্দির জন্য একটু জ্বর হয়েছে, ও কালই ঠিক হয়ে যাবে।'

ভবতারণবাবু কাছে ঘেঁষে বসেন ঝুঁকিয়ে, বলেন, 'ব্যাটার কথা ছেড়ে দিন, শহরে যাবে আড্ডা দিতে, ডাক্তার আনবার কথা কি আর মনে থাকবে ওর? যেমনি মেম তেমনি সাহেব!'

'কেন মেম তো মোটেই খারাপ নয়, আজ আপনার স্ত্রীর সঙ্গে খুব আলাপ চলছিল।'

'আমার স্ত্রীর সঙ্গে!' চমকে ওঠেন ভবতারণবাবু। 'আপনি দেখলেন কোথা থেকে?'

বিকালের ব্যাপারটা সমস্ত বলে সীমাচলম।

'তাই নাকি?' একটু যেন আনমনা হয়ে যান ভবতারণবাবু। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক করে উঠে পড়েন আস্তে আস্তে।

ভবতারণবাবু উঠে যাবার একটু পরেই ঘরে ঢোকে মার্থা। ট্রেতে দুধ রুটি আর কয়েকটা ফল।

শশব্যস্তে বিছানার ওপর উঠে বসে সীমাচলম, 'এ কি, আপনি কেন কষ্ট করে আনলেন এসব? চাকরদের দিয়ে পাঠালেই হ'ত।'

'সত্যি বড্ড কষ্ট হয়েছে এই সব ভারি জিনিসগুলো বয়ে আনতে। আপনি শুয়ে পড়ুন তো লক্ষ্মী ছেলেটির মত।'

জোর করে বিছানার ওপরে মার্থা শুইয়ে দেয় সীমাচলমকে। গায়ের ওপরে কম্বলটা আস্তে আস্তে টেনে দিয়ে বলে, 'ইস্ গা তো বেশ গরম রয়েছে দেখছি। পল গেলো কোথায়, ডাক্তারকে একটা খবর দিলে পারতো।'

'হ্যাঁ, উনি ডাক্তারকেই ডাকতে গেছেন শহরে।'

'আপনি কথা বলবেন না বেশী। চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকুন চুপ করে।'

সীমাচলমের মাথার কাছে চেয়ারটা টেনে নেয় মার্থা। একহাতে সীমাচলমের ঘন অবিন্যস্ত চুলের মধ্যে আস্তে আস্তে হাত চালায়। ভারি ভাল লাগে সীমাচলমের। খুব ছেলেবেলায় একবার কি একটা শক্ত অসুখ হয়েছিল। ওর মা এমনি করে সারাটা দিন চুল টেনে টেনে দিত ওর শিয়রে বসে। তন্দ্রার মত আসে। জানলা দিয়ে সূর্যের ম্লান আলো এসে পড়েছে। আবছা লাল আলো। বাইরের গোলমাল একটু একটু করে কমে আসছে। সন্ধ্যা নামছে শহরতলীতে। সারাদিনের ধুলো আর ধোঁয়ার পরে খুব মনোরম মনে হয় এই সন্ধ্যা।

অনেকগুলো লোকের কলরবে তন্দ্রা ভেঙে যায় সীমাচলমের। অগস্টিন সাহেব ফিরেছেন ডাক্তারকে সঙ্গে করে, পিছনে পিছনে মার্থাও দাঁড়িয়েছে এসে।

বুক পিঠ পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়ান ডাক্তার। সর্দি-জ্বর, সাঙ্ঘাতিক কিছু নয়, তবে অবহেলা করলে অনেক কিছু হয়ে যেতে পারে। বুকের একটা মালিশ আর খাবার ওষুধ এক শিশি, এই চলুক এখন।

রাত্রির দিকে চাপা কান্নার আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায় সীমাচলমের। কে যেন কাঁদছে গুমরে গুমরে। পার্টিশনের ওপার থেকে আসছে কান্নার শব্দ। আস্তে আস্তে বিছানার ওপরে উঠে বসে সীমাচলম। কিছুক্ষণ

পরেই ভবতারণবাবুর গলার আওয়াজ পাওয়া যায়, 'বিশ বার বারণ করেছি না ওই ফিরিঙ্গি মাগীর সঙ্গে মিশতে। ওর সঙ্গে এত আলাপ কি তোমার? বাড়ির বৌ হয়ে বারান্দা পার হয়ে ও চুলোয় যাবার তোমার কি দরকার? এ নিজের দেশ পাওনি, যত বদমাইসের আড্ডা এখানে। একটু সাবধান না হলেই সর্বনাশ। ছি-ছি, তোমার জন্য মান-সম্ভ্রম নষ্ট হবার যোগাড় আমার। পাশের মাদ্রাজী ছোকরাটি পর্যন্ত যা নয় তাই বললে—'

কথাগুলো বাঙলা ভাষাতে হলেও রসগ্রহণে বিশেষ অসুবিধা হয় না সীমাচলমের। একবার মনে হয় চিৎকার ক'রে এই হীন অলোচনার প্রতিবাদ করতে, কিন্তু অবসাদ নামে স্নায়ু আর শিরায়। একটা আচ্ছন্নের ভাব। চোখ দুটো বুজে আসে সীমাচলমের।

পরের দিন গায়ের উত্তাপ অনেকটা কম। দুপুরবেলা চুপচাপ বিছানায় শুয়েছিলো সীমাচলম, এমন সময় ঘরে ঢোকে মার্থা।

'কেমন আছেন আজ?'

'একটু ভালো। খুব কষ্ট দিলাম কাল আপনাদের।'

'হ্যাঁ, বড্ড কষ্ট দিলেন!'

কথার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে মালিশের শিশিটা হাতে নেয় মার্থা। বলে, 'চুপ করে শুয়ে পড়ুন লক্ষ্মী ছেলের মত। মালিশটা করে দিয়ে যাই।'

'সে কি আপনি মালিশ করবেন কি!' ধড়মড় করে বিছানায় বসে পড়ে সীমাচলম. 'না, না, আমি করছি মালিশ, দিন আমার হাতে শিশিটা।'

হেসে ফেলে মার্থা, 'রোগী আর শিশু একই রকমের জানেন তো? তাদের কথায় কান দিলে আমাদের চলে না।'

জোর করে বিছানায় শুইয়ে দেয় সীমাচলমকে, তারপর ওষুধটা ঢেলে আস্তে আস্তে মালিশ করতে শুরু করে। চোখ বন্ধ করে চুপ করে শুয়ে থাকে সীমাচলম। কাল রাত্রের ভবতারণবাবুর ধমকের কথাগুলো মনে পড়ে। গণ্ডী পার হওয়াই পাপ মেয়েদের পক্ষে। সামাজিক শাসন অবহেলা করা উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর। ওদেশের মেয়েদের কিন্তু এত সহজে অপমৃত্যু হয় না।

'এ দেশটা আপনার কেমন লাগছে বলুন তো?' সীমাচলম প্রশ্ন করে।

'কোন দেশটা? ভারতবর্ষ না বর্মা?'

'যদি বলি ভারতবর্ষ?'

'এতগুলো প্রাণহীন পঙ্গু লোকের বিরাট সমাবেশ আর কোন দেশে দেখিনি। ঘা খেলেও চেতনা আসে না, এ রকম জাতের কল্পনাও আমরা করতে পারি না।'

একটু অস্বস্তি লাগে সীমাচলমের। ঠিক এ রকম উত্তর ও আশা করেনি, আর প্রশ্নও করেনি এভাবে। ও জানতে চেয়েছিলো প্রাকৃতিক সৌষ্ঠবের কথা আর মোটামুটি কেমন লাগলো দেশটা এইটুকুই। কথাটার কিন্তু একটা উত্তর না দিয়ে পারে না সীমাচলম। বলে, 'দেশের লোকদের এই অবস্থার জন্য কে দায়ী তাতো জানেনই।'

'জানি, কিন্তু বিশ্বাস করি না। পরের ওপর দোষ চাপানো কোন কাজের কথা নয়। গৃহস্থ সাবধান না থাকলেই চোরের সুবিধা হয়। নিজেদের মধ্যে আপনাদের বিভেদ, দশটা লোক থাকলে এগারটা মত, এ দেশের উন্নতির আশা খুব কম।'

মুখ ফিরিয়ে দেখে সীমাচলম। মার্থার গভীর দুটি নীল চোখে কিসের যেন ছায়া। সারা মুখে আরক্ত দীপ্তি। এ কথাগুলো শুধু ওর মুখের কথা নয়, মনের কথাও বুঝি।

'আমাদের দেশের ইতিহাস পড়েছেন? শতধা বিভক্ত পিতৃভূমিকে কিভাবে একসঙ্গে আনা হয়েছিল? পৃথিবীর সমস্ত জাত একপাশে আর আমরা একপাশে। সকলের অভিসন্ধি বিফল করে আমাদের অভিযান শুরু হয়েছে বারবার। হেরেছি কি জিতেছি সে প্রশ্ন বড়ো নয়। আপনার মাথার কাছের জানলাটা বন্ধ করে দেবো? রোদ আসছে বিছানায়।'

সহসা চমক ভাঙে সীমাচলমের। কোন দেশের রূপকথার গল্পই বুঝি শুনছিলো। প্রকাণ্ড এক দৈত্যের শিকল ভাঙার গল্প।

মার্থা আস্তে ভেজিয়ে দেয় জানলাটা।

একদিন ভবতারণবাবুর চিৎকারে খুব সকালে ঘুম ভেঙে যায় সীমাচলমের। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে দেখে দরজার সামনে বিরাট জটলা। ভবতারণবাবু অগস্টিন সাহেব আর পাড়া-পড়শী আরো কয়েকজন জুটেছেন এসে। ভবতারণবাবু হাতের খবরের কাগজটা ধরে চিৎকার করেন তারস্বরে, 'আমি আজ ছ'মাস ধরে বলে আসছি, লড়াই বাধলো বলে। আমি ঠিক জানি জার্মানী প্রতিশোধ নেবেই। কেউ বিশ্বাস করেনি আমার কথা। হুঁঃ, ইংরেজের বিরুদ্ধে কে লড়বে? আরে বাবা, এতো আর পরাধীন জাত নয় যে, পায়ের তলায় লেজ নাড়বে আর এঁটো-কাঁটা চাটবে বসে!'

কলরবে সমস্ত কথাগুলো ভালো করে কানে যায় না সীমাচলমের। এগিয়ে এসে ভবতারণবাবুর হাত থেকে টেনে নেয় কাগজটা। বড়ো বড়ো শিরোনামায় স্পষ্ট করেই লেখা রয়েছে। লড়াই শুরু হয়ে গেছে জার্মানী আর ইংরাজে। যে সময়ের মধ্যে জবাব দেবার কথা ছিলো জার্মানীর, সে সময় পার হয়ে গেছে। ব্যস, জার্মানী এবার থেকে ইংরাজের শত্রু বলেই পরিগণিত হলো।

অনেকক্ষণ ধরে সংবাদটা পড়ে সীমাচলম। লড়াই সম্বন্ধে ওর স্পষ্ট কোন ধারণা নেই। এর আগের যুদ্ধের সময় খুবই ছোট ছিলো। পরে মায়ের কাছে একটু একটু শুনেছিলো। সমস্ত মাদ্রাজের সমুদ্র অঞ্চল থেকে লোক সরে এসেছিলো। যে কোন মুহূর্তে জার্মান ডুবো জাহাজ "এমডেন" এসে গোলাবর্ষণ করতে পারে এই ভয়েই তটস্থ ছিলো সবাই। এবার আবার কি হবে কে জানে।

ভবতারণবাবু কিন্তু ভীষণ উত্তেজিত হ'য়ে ওঠেন, 'দেখবে মজা সবাই, সোনা আর লোহার দাম আগুন হয়ে উঠবে। গতবারের যুদ্ধে ফেঁপে লাল হয়ে উঠলো লোহার কারবারীরা। আর কোন কথা নয়, স্রেফ লোহা যোগাড় করা আর চালান দেওয়া।'

অগস্টিন সাহেব কিন্তু কোন কথা বলেন না, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন শুধু। লড়াই কিছুটা বোঝেন তিনি। গতবারের লড়াইয়ে তার একমাত্র ভাই মিলিটারী পোশাক পরে হাসতে হাসতে জাহাজে উঠেছিলো, আর ফিরে আসেনি।

বিশেষ কিছু পরিবর্তন বোঝা যায় না আকিয়াব শহরে। শুধু জাহাজ-ঘাটে গেলে সৈন্য বোঝাই অনেকগুলো জাহাজ ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। জাহাজগুলোর গায়ে অদ্ভুত রংয়ের প্রলেপ। বাইরে যুদ্ধের আবহাওয়া যতটা না বোঝা যায়, তার দ্বিগুণ বোঝা যায় ভবতারণবাবুর বাসায়। প্রকাণ্ড একটা ম্যাপ যোগাড় করেছেন তিনি আর কাগজ পড়ে পড়ে লাল কালির দাগ দিচ্ছেন ম্যাপে।

'একা রামে রক্ষা নেই সুগ্রীব দোসর। শুধু জার্মানীতেই কাহিল অবস্থা, তার সঙ্গে আবার রাশিয়া। এবার প্রভুরা কাত, বুঝলেন সীমাচলমবাবু!'

সীমাচলম হাসে মুচকে মুচকে। বলে, 'কিছু লোহা-টোহা জমানোর

বন্দোবস্ত করুন। কারা যেন ফেঁপে লাল হয়ে উঠেছিলো বলছিলেন গত যুদ্ধে ?'

'ও, সে মশাই এক আরব্য উপন্যাস। আমার মাসতুতো ভাইয়েরা। চাল নেই চুলো নেই, বাপের চোখ উল্টোবার সঙ্গে সঙ্গেই ভিটেমাটি চাটি। ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। লড়াই শুরু হলো উনিশশো চোদ্দয়। তুখোড় ধড়িবাজ ছেলে দুটি, সব ছেড়ে কেবল বাজার ঘুরে ঘুরে পেরেক কিনতে শুরু করলো। ঘটি বাটি বেচে ধারধোর করে স্রেফ পেরেক কেনা। মাঝ রাত্রিতে ছোটটা আবার চিৎকার করে উঠতো স্বপ্ন দেখে, 'পেরেক, পেরেক !' কত ঠাট্টাই আমরা করেছি তাই নিয়ে।'

'তারপর ?'

'তারপর সেই লোহা সোনা হ'য়ে উঠলো মশাই। বাড়ি হ'লো, গাড়ি হ'লো, মেজাজই অন্য রকম হ'য়ে গেলো। দশ ঘণ্টা অপেক্ষা করে তারপর দেখা করবার ফুরসৎ মিলতো তাঁদের সঙ্গে। তবে হাঁ, ভগবানও আছেন।'

'কি রকম ? সব গেলো বুঝি আবার ? কিসে গেলো ?'

'ঘোড়া, ঘোড়া। আর মানুষের যায় কিসে ?'

ভাইদের প্রসঙ্গটা বিশেষ ভালো লাগে না সীমাচলমের। বিষয়টা পাল্টাবার চেষ্টা করে, 'তাহলে এই লড়াইয়ে আমাদেরও ধরতে হয় কিছু, কি বলেন ?'

নিজের প্রশস্ত ললাটে সজোরে করাঘাত করেন ভবতারণবাবু, 'সব এইখানে, বুঝলেন সীমাচলমবাবু। এখানে যদি লেখা থাকে, তবে আপনি ছাই ধরুন, সোনা হয়ে যাবে।'

মুচকে হাসে সীমাচলম, বলে, 'তেলের কলের লোহালক্কড়গুলো বিক্রী করে দিলেই তো হয়, কি বলেন ? সোনার দাম পাওয়া যাবে নিশ্চয় !'

কথাটায় বেশ একটু চমকে ওঠেন ভবতারণবাবু। একেবারে দাঁড়ান

সীমাচলমের গা ঘেঁষে। 'কথাটা মন্দ বলোনি ভায়া। এমনিতে তো তেলের কল উঠে যাবার যোগাড়। কলকব্জাগুলো খুলে ঝেড়ে দিতে পারলে মন্দ হয় না। একবার জাহাজে উঠে বসতে পারলে কে কার খোঁজ রাখে।'

কথাটা যে এভাবে মোড় ঘুরবে সীমাচলম তা আশা করেনি। তাড়াতাড়ি অন্য কথা আরম্ভ করে, 'এবারে কি মনে হচ্ছে আপনার? হিটলার কি আর তোড়জোড় না করে নেমেছে?'

'হুঁ, ফুঁয়ে উড়ে যাবে মশায়, ফুঁয়ে উড়ে যাবে। ওদের তো যতো জোর আমাদের ওপর।'

'হবে না কেন বলুন? ওদের একজনকে দেখলে আপনারা একশো জন যে পিছিয়ে যান।'

'সেদিন আর নেই মশাই। আপনি বাঘা যতীনের নাম শুনেছেন? কানাইলালের নাম? চাটগাঁ আর্মারি কেসের ব্যাপার জানেন?'

'না, বলুন শুনি।' বেশ আগ্রহান্বিতই মনে হয় সীমাচলমকে।

'চেপে যান মশাই। কে কোথা দিয়ে শুনে ফেলবে, তারপর এই বয়সে শেষকালে হাজতবাস করতে হবে। কি দরকার?'

'হাজতবাস করতে হবে কেন?'

'আর কেন, আমরা মশাই আদার ব্যাপারী, কি দরকার জাহাজের খবরে, কি বলেন?'

ভবতারণবাবুর সামনে টাঙানো প্রকাণ্ড ম্যাপখানার দিকে চেয়ে দেখে সীমাচলম, তারপর একটু হেসে বলে, 'সত্যি, কি দরকার জাহাজের খবরে?'

সেদিন ভোরে বারান্দায় এসেই দাঁড়িয়ে পড়ে সীমাচলম। সমস্ত বাড়িটা ছেয়ে ফেলেছে পুলিশে। একটা পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে

ঠিক গেটের সামনে। দু-একজন পুলিশ ইন্সপেক্টরকেও ঘোরাঘুরি করছে দেখা যায় ধারে কাছে। মাথাটা ঘুরে ওঠে সীমাচলমের। এতদিন পরে সন্ধান পেলো নাকি পুলিশে? অনেক দিনের ফেলে আসা টুকরো টুকরো ঘটনাগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। কিন্তু সেদিনের সে উত্তাপ আজ তো নিভে গেছে পরিমিত জীবনের অন্তরালে। সে সব স্মৃতি আর সেই পরিবেশের কথা ও তো ভুলতেই চায়। ভয় ভয় করে সীমাচলমের।

একটু ভোর হতেই দুজন পুলিশের লোক ভিতরে ঢোকে। পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে উচ্চ কর্ম্মচারী বলে মনে হয়। সোজা খট খট করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে আসে। সীমাচলম সরে দাঁড়ায় বারান্দা থেকে। কি জানি কি চিহ্ন ফেলে এসেছে পিছনে, তারই সূত্র ধরে আজ পুলিশ দাঁড়িয়েছে ওর দরজায়: আস্তে আস্তে ঘরের ভিতরে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দেয় সন্তর্পণে।

খুট খুট করে শিকল নাড়ার শব্দ হয়। সার্টের কলারটা ঘামে ভিজে যায় সীমাচলমের। উঠে ঠেলে খুলে দেয় দরজাটা।

'মিঃ পল অগস্টিন থাকেন কোন্ কুঠরিতে?'

পল অগস্টিন! ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে সীমাচলমের। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় অগস্টিন সাহেবের ঘরটা। সোরগোলে অগস্টিন সাহেব আগেই বেরিয়ে এসেছিলেন বারান্দায়। তাঁর নাম শুনে এগিয়ে এসে দাঁড়ান সামনে।

'ভিতরে আসুন।' ব্যাপারটা আবছা যেন বুঝতে পারেন অগস্টিন সাহেব, কিন্তু বারান্দায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সীমাচলম। এ সময়ে অগসটিন সাহেবের ঘরে যাওয়া উচিত হবে কি না তা ঠিক করে উঠতে পারে না।

কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে আসে পুলিশ ইন্সপেক্টর দুজন। তাদের পাশে

পাশে গম্ভীর মুখে বেরিয়ে আসে মার্থা, আর সব চেয়ে পিছনে মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে হাঁটেন অগস্টিন সাহেব। পুলিশের গাড়িটা গেট দিয়ে একেবারে ব্যারাকের সামনে এসে দাঁড়ায়। ইতিমধ্যে ছোটখাট একটা ভিড জমেছে গাড়িটা ঘিরে। বেশীর ভাগই ছেলেপিলের দল আর পথ চলতি আধাশহুরে লোক। সীমাচলম এইবার সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে তর তর করে। জোর পায়ে হেঁটে অগস্টিন সাহেবের পাশে এসে দাঁড়ায়।

গাড়িতে ওঠবার আগে ফিরে দাঁড়ায় মার্থা। অগস্টিন সাহেবের দিকে ফিরতে গিয়ে চোখাচোখি হ'য়ে যায় সীমাচলমের সঙ্গে। হাসে মার্থা, 'চললুম, মিঃ সীমাচলম। গারদে থাকবো না বেশী দিন। এবার আমরা জিতবোই। গতবারের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত শুরু হয়েছে জার্মানীতে, এবার আর ভুল হবে না।'

সীমাচলমের বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে, চোখের পাতাটা ভিজে ভিজে ঠেকে। আস্তে আস্তে ভিড় থেকে সরে আসে সীমাচলম। একটু পরে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে গেটের কপাটে মাথা রেখে ছেলেমানুষের মতন কাঁদছেন অগস্টিন সাহেব। পুলিশের গাড়িটা আর দেখা যায় না।

বারান্দায় উঠতেই দেখা হয়ে যায় ভবতারণবাবুর সঙ্গে। কোমরে তোয়ালে জড়ানো, পার্টিশনের পাশ থেকে উঁকি দিচ্ছেন। সীমাচলমকে দেখে এগিয়ে আসেন এক পা দু' পা করে।

'মাগীকে ধরে নিয়ে গেল বুঝি?'

কথার উত্তর দেয় না সীমাচলম। বিশ্রী লাগে এসব কথা নিয়ে আলোচনা করতে, তাও আবার ভবতারণবাবুর সঙ্গে। বারান্দার ওপর চেয়ার পেতে চুপচাপ বসে থাকে। অগস্টিন সাহেব তখনও দাঁড়িয়ে আছেন সেইভাবে।

'হ্যাঁ মশাই শুনছেন, কেন ধরলো বলুন তো?'

'আপনি ছিলেন কোথায় এতক্ষণ?' চাপা বিরক্তি ফুটে উঠে সীমাচলমের কণ্ঠস্বরে।

'আমি? আর বলেন কেন মশাই! ভোর থেকে টনটন করছে পেটটা। একবার পায়খানা আর একবার ঘর, এই করছি সকাল থেকে। আমি থাকলে তো স্পষ্ট জিজ্ঞাসাই করতে পারতুম ওদের কি ব্যাপার?'

'জিজ্ঞাসা করার আর প্রয়োজন হবে না।' গলার আওয়াজটা যথাসম্ভব গম্ভীর করে তোলে সীমাচলম, 'এই ব্যারাকের কেউ বাদ যাবে না, সব যেতে হবে গারদে।'

'সে কি মশাই, এ আবার কি সর্বনেশে কথা? আমরা কি করলুম?' চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে আসে ভবতারণবাবুর। 'আপনাকে ওই ফিরিঙ্গি মাগীটা তাই বুঝি বলে গেলো যাবার সময়?'

'হ্যাঁ ভবতারণবাবু, মনেও ভাববেন না যে লুকিয়ে থাকলেই পার পেয়ে যাবেন। সবায়েরই দিন আসছে।'

এবার কেঁদেই ফেলেন ভবতারণবাবু। হাউ মাউ করে কাঁদেন বসে পড়ে, 'কি বিপদ দেখুন তো মশাই, আমি সাতেও নেই পাঁচেও নেই, নিরীহ গোবেচারা। আমায় কেন এভাবে ইয়ে করা। আমি কস্মিনকালে ভালো করে কথাও বলিনি মাগীটার সঙ্গে। বিদেশ বিভুঁয়ে কি করি বলুন তো মশাই?'

কাদার ডেলা নিয়ে খেলতে বিশ্রী লাগে সীমাচলমের। আস্তে আস্তে বলে, 'বলে গেলো ইংরাজ রাজত্বের অবসান হয়ে আসছে। এবার ওদের জিৎ। বুজরুকি আর ফাঁকিবাজির দিন শেষ হয়ে গেছে।'

'বলেন কি মশাই, ওই একপাল পুলিশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললে এই কথা? কেউ বললে না কিছু?'

'বলবে আবার কি? বলবার কি আছে? ওরাই জিতবে এবার।'

ভবতারণবাবু ফিরে গিয়ে দেয়ালে লটকানো ম্যাপটার দিকে চেয়ে দেখেন। যেখানে যেখানে জার্মানীরা এগিয়ে চলেছে আর যে সব ঘাঁটি দখল করেছে নীল পেন্সিল দিয়ে নিজের হাতে দাগ দিয়েছেন। অনেকক্ষণ সেই দিকে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলেন, 'হুঁ, এবার বোধ হয় জিতেই গেলো জার্মানী।'

অগস্টিন অনেকটা গম্ভীর হয়ে গেছেন। অফিসে ছোটাছুটিটাও স্তিমিত হয়ে গেছে। একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন। মাঝে মাঝে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন মেসিনের সামনে, কি ভাবেন, তারপর হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠে জোরে জোরে পা ঠুকে ফিরে আসেন নিজের চেয়ারে।

সীমাচলম বিকালের দিকে যায় মাঝে মাঝে অগস্টিন সাহেবের ঘরে।

'আসুন আসুন।' নিস্তেজ গলার স্বর অগস্টিন সাহেবের! চুপচাপ চেয়ারে গিয়ে বসে সীমাচলম। অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতায় বিরক্তি আসে। মাঝে মাঝে মনে হয়, এত অল্পতেই ভেঙে পড়লেন কেন অগস্টিন সাহেব? ক' বছরেরই বা পরিচয় মার্থার সঙ্গে!

'মার্থাকে রাখতে পারবো না তা জানতুম।' টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে দু-হাতে মাথাটা চেপে ধরেন অগস্টিন সাহেব। আস্তে আস্তে বলেন কথাগুলো, 'জার্মানীর মেয়েরা দেশ ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসতে পারে না। ওদের কাছে দেশ সবচেয়ে বড়ো দেবতা। সব কিছু করতে পারে দেশের জন্য। লড়াই যে লাগবে, তা ও জানতো ছ' মাস আগে। কতবার আমায় বলেছে, তোমার কাছে আর থাকতে পারবো না বেশীদিন। মস্ত বড়ো একটা কাজের ভার আমার ওপরে। এখান থেকে শীঘ্রই সরে যেতে হবে আমাকে।'

'মিসেস অগস্টিন কি এখানেই আছেন এখন?'

'না, কাল প্রোমে চালান দিয়েছে। শীঘ্রই রেঙ্গুন হয়ে বোধ হয় ভারতবর্ষেই নিয়ে যাবে। কিন্তু তার পরে কোথায় নিয়ে যাবে কে জানে?'

অনেকক্ষণ পর্যন্ত আর কোন কথাবার্তা হয় না। সন্ধ্যার অন্ধকার নামে চারদিক ঘিরে। টেবিলের ওপর ফ্রেমে বাঁধানো মার্থার ছবিখানি আবছা দেখা যায়। সারা মুখে বিষণ্ণতার ছাপ, নীল দুটি চোখে কিসের স্বপ্ন কে জানে!

একদিন রাত্রে কড়া নাড়ার শব্দে বিছানায় উঠে বসে সীমাচলম। এতো রাত্রে আবার কে দরজা ঠেলে! বাতি জেলে দরজা খুলেই চমকে ওঠে। একি চেহারা হয়েছে ভবতারণবাবুর! উস্কো-খুস্কো চুল, লাল দুটি চোখ আর সারা মুখে গভীর চিন্তার ছাপ।

'একটু আসবেন সীমাচলমবাবু? আমার স্ত্রীর অবস্থা বড় খারাপ।'

'সে কি, কি হয়েছে তাঁর?'

'অন্তঃসত্ত্বা ছিল, ক'দিন ধরে বেশ একটু কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু আজ বিকাল থেকে কেবলই ফিট হচ্চে।'

'তাই নাকি, দাঁড়ান অগস্‌টিন সাহেবকেও ডাকি একবার, আমি এসব বিষয়ে একেবারে আনাড়ি।'

এক ডাকেই উত্তর পাওয়া যায় অগস্‌টিন সাহেবের। নৈশবাসের ওপর লম্বা কোট চড়িয়ে শশব্যস্তে ছুটে আসেন তিনি। 'কি ব্যাপার? বিপদ-আপদ ঘটল নাকি কিছু? তারপর সব শুনে ঘরের ভিতর থেকে স্মেলিং সল্টের শিশি বের করে আনেন, বলেন, 'আপনারা ততক্ষণ এটা ব্যবহার করুন, আমি এক্ষুনি ফিরছি ডাক্তার নিয়ে।'

ভবতারণবাবুর ঘরে তাঁর স্ত্রী আসার পরে এই প্রথম ঢোকে সীমাচলম। দরজা-জানলায় পর্দা এঁটে অস্বস্তিকর আবহাওয়া হয়েছে ঘরের। আলো-

বাতাস আসার কোন সুযোগই নেই। মেঝেতে ছোট অপরিচ্ছন্ন বিছানা, তার ওপর শুয়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে মেয়েটি।

'ঠিক এই রকম হচ্ছে বিকাল থেকে। একবার করে জ্ঞান হয়, আবার যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। কি মুস্কিলেই যে পড়েছি!'

সীমাচলম বসে থাকে চুপচাপ। যন্ত্রণায় নীল হয়ে যায় মেয়েটির মুখ, বিছানার চাদরটা শক্ত করে দুহাতে ধরে মুখের মধ্যে দেয় মেয়েটি, তবু মাঝে মাঝে দাঁতের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসে দুঃসহ চিৎকার। ভবতারণবাবু মাথার কাছে বসে একটা পাখা নিয়ে বাতাস করেন। যন্ত্রণার কোন উপশম হয় বলে মনে হয় না। বিশ্রী লাগে সীমাচলমের। এক মুহূর্তে নীড় বাঁধার সমস্ত স্বপ্ন হাওয়ায় মিশিয়ে যায়। সৃষ্টির বেদনার বীভৎস রূপে হতবাক হয়ে যায়।

সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজে উঠে পড়ে সীমাচলম। তখনো সমানে কাতরাচ্ছে মেয়েটি। মুষ্টিবদ্ধ দুটি হাতে সবেগে আঘাত করে নিজের বুকে। নিমীলিত দুটি চোখের পাশে জলের ধারা।

অগস্টিন সাহেব ফিরেছেন ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে। মিঃ উইলিয়ামস্ আকিয়াবের সিভিল সার্জন। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, ফিটফাট চেহারা, চলনে ভঙ্গিতে একটা আভিজাত্যের ছাপ। ঘরের মধ্যে পা দিয়েই চেঁচিয়ে ওঠেন তিনি, 'What is the big idea? এটা বাস করার ঘর না চাল রাখবার গুদাম?' জানলার পর্দাগুলো ফর ফর করে ছিঁড়ে ফেলেন টেনে, আর চিৎকার করে ওঠেন, 'You are going to kill her in this dungeon.'

হাঁটু গেড়ে বসে কিছুক্ষণ পরীক্ষা করেই দাঁড়িয়ে ওঠেন, 'কাছাকাছি টেলিফোন আছে কোথাও? Immediately ambulenceএর জন্য ফোন করে দিতে হবে। কেস অত্যন্ত খারাপ।'

মিলেই ফোন আছে। অগস্টিন সাহেব তখনই ফোন করে দেন

অ্যাম্বুলেন্সের জন্য। ডাঃ উইলিয়ামস্ সারাক্ষণ পায়চারী করেন বারান্দায় আর গজ গজ করেন নিজের মনে। দু একটা কথা স্পষ্টই ভেসে আসে ঘরের ভিতরে। বাল্যবিবাহ থেকে শুরু করে ভারতীয় আব্রুপ্রথার তীব্র নিন্দা করে চলেন ডাক্তার সাহেব। জাতকে স্বাধীন হবার আগে সুস্থ আর সবল হতে হবে। আলোবাতাসহীন বন্ধ ঘরে ক্ষীণায়ু সন্তান প্রসবের মানে হয় কোন ?

অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে ডাক্তার উইলিয়ামস্ আর ভবতারণবাবু দুজনেই রওনা হন। বারান্দায় পাশাপাশি চেয়ার পেতে চুপচাপ ব'সে থাকে সীমাচলম আর অগস্টিন সাহেব। বিশ্রী একটা আবহাওয়া। ভবতারণ-বাবুর স্ত্রীকে গাড়ীতে ওঠাবার পরে ডাক্তার উইলিয়ামস্ ভবতারণবাবুর দিকে ফিরে কঠোর গলায় বলেছিলেন, 'ঈশ্বর না করুন, এঁর যদি কিছু হয়, তবে সে জন্য আপনিই সর্বতোভাবে দায়ী। জানেন না এ সময়ে মেয়েদের শারীরিক পরিশ্রম করানোর দরকার আর তারা যে ঘরে থাকে সে ঘরে প্রচুর আলো বাতাসের প্রয়োজন ? তাদের এভাবে তিলে তিলে মারবার অধিকার কেউ আপনাদের দেয়নি।'

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন ভবতারণবাবু। একটি কথাও বলেন না। কিই বা বলবেন তিনি। সত্যিই তো, মেয়েটির চারপাশ ঘিরে যেভাবে বাধানিষেধের প্রাচীর তোলা হয়েছিল তাতে হাঁফ বন্ধ হ'য়ে আগেই যে মারা যায়নি মেয়েটি এই যথেষ্ট।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পরে ফোন আসে মিল থেকে। অগস্টিন উঠে যান আস্তে আস্তে, একটু পরে ফিরে এসে বলেন, 'তৈরী হয়ে নিন। হ'য়ে গেছে।'

ছোট্ট দুটি কথা। হ'য়ে গেছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছে মাথায় কাপড় দিয়ে স্বল্পপরিসর ঘরটির মধ্যে। কত শাসন

কত অনুশাসন কত বাধা আর নিষেধের গণ্ডি তাকে ঘিরে। অগস্টিন সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে পা ফেলে নিচে নামে সীমাচলম।

হাসপাতালের সামনেই দেখা হয় ভবতারণবাবুর সঙ্গে। চুপচাপ বসে আছেন শানবাঁধানো চাতালটার ওপরে। অগস্টিন সাহেব এগিয়ে এসে তাঁর কাঁধে হাত রাখেন, 'কখন হলো?'

'হাসপাতালে পৌঁছোবার আগেই। রাস্তাতেই শেষ হ'য়ে গেছে।'

'কিছু হ'য়েছিলো নাকি?'

'মরা ছেলে একটা।' নিঃশ্বাস ফেলেন ভবতারণবাবু।

একটু পরেই আরো কয়েকজন এসে জোটে। বরদাবাবু, কোর্টের মুহুরী, শান্তিবাবু, এখানকার কাস্টমসের কেরানী, আরো এদিকে ওদিকে দু' একজন।

সারাটা পথ মৃদু গলায় হরিধ্বনি দিয়ে চলেন ভবতারণবাবু। কিন্তু চিতায় ছোট ছেলেটিকে মায়ের কাছে শোয়াতেই চিৎকার করে ওঠেন। সীমাচলমের কাছে এসে সজোরে জড়িয়ে ধরেন তার একটা হাত। ভেউ ভেউ করে কেঁদে ওঠেন ছেলেমানুষের মত, 'সীমাচলমবাবু, আমার কি সর্বনাশ হ'য়ে গেলো! উঃ হু, হু, সব গেলো আমার। ডাক্তার সাহেব ঠিকই বলেছেন, আমিই মেরে ফেলেছি ওকে। ছোট্ট ঘরের মধ্যে আটকে রেখে একটু নড়াচড়া করতে না দিয়েই আমিই ওকে শেষ করেছি।'

সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে সীমাচলম। 'না, না, একি কথা, মানুষের জীবনমরণের কথা কেউ কি বলতে পারে? সবই নিয়তি বুঝলেন? কপালে মৃত্যু থাকলে কে খণ্ডাবে?'

বিশ্রী লাগে আবহাওয়াটা। নদীর ধারে এসে দাঁড়ায় সীমাচলম। নদীর একেবারে ধার ঘেঁষে কে একজন দাঁড়িয়ে আছে। কাছে যেতেই

চিনতে পারে। প্যান্টের পকেটে হাত দুটো ঢুকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন অগস্টিন সাহেব জলের দিকে চেয়ে।

'এখানে একলাটি দাঁড়িয়ে আছেন?'

মুখ ফেরান অগস্টিন সাহেব। ম্লান চাঁদের আলোতে স্পষ্ট দেখা যায় তাঁর দু-চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে জলের ধারা, আবেগে থর থর করে কাঁপছে দুটি ঠোঁট।

'একি কাঁদছেন আপনি?' একটু বিস্মিতই হয়ে যায় সীমাচলম। মাথাটা সজোরে ঝাঁকি দেন অগস্টিন সাহেব, 'না, না, এ বিশ্রী প্রথা, ভারি নিষ্ঠুর প্রথা। উঃ এভাবে পুড়িয়ে মারা! দেখেছেন কি ভাবে পুড়ে গেল গায়ের চমড়া আর চুলগুলো। না, না, এ প্রথার বদল হওয়া দরকার।'

বেশ কয়েক মাস কাটে।

টেবিলের ওপরে কাগজপত্র ছড়িয়ে চুপচাপ বসে থাকেন ভবতারণবাবু। উস্কোখুস্কো চুল আর উদাস ভাব। কষ্ট হয় সীমাচলমের। মাঝে মাঝে দু-একটা সান্ত্বনার কথাও শোনায়। কি আর করবেন বলুন? ভগবান দিয়েছিলেন তিনিই নিয়েছেন টেনে।

'ছেলেটাও যদি বেঁচে থাকতো সীমাচলমবাবু, তবু তার মুখ চেয়ে দুঃখ ভুলতে পারতাম কিছুটা। সেটাও চলে গেলো মায়ের সঙ্গে।' কাপড়ের খুঁটে চোখ দুটো মোছেন আর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

বিকালের দিকেও নিঃঝুম হয়ে বসে থাকেন ভবতারণবাবু সামনের দেয়ালে টাঙানো ম্যাপখানার দিকে চেয়ে। ওঁর মুখের দিকে চেয়ে কষ্ট হয় সীমাচলমের। যুদ্ধে হার হয়ে গেছে ভবতারণবাবুর। সমস্ত প্রদেশ হাতছাড়া হয়ে গেছে। ভগ্নস্তূপের ওপর বসে সারাজীবন দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কিই বা গতি আছে!

সেদিন অফিসে অগস্টিন সাহেব এসে দাঁড়ান সীমাচলমের সামনে, 'মিঃ সীমাচলম, আপনাকে দিনকতকের জন্য একবার বাইরে যেতে হবে।'

'বাইরে? কোথায় যেতে হবে বলুন?'

'রেঙ্গুনে যেতে হবে একবার। আমাদের একটা মেসিন এসে পড়ে রয়েছে সেখানে, আপনাকে গিয়ে তাগিদ দিয়ে সেটা পাঠাতে হবে এখানে। লড়াইয়ের হাঙ্গামে জাহাজে জিনিস 'বুক' করাই মুস্কিল হয়ে পড়েছে।'

'বেশতো তাতে আর কি, যাবো। কবে যেতে হবে বলুন।'

'কালই যেতে পারলে ভালো হয়। লড়াইয়ের বাজারে নতুন মেসিন কেনার তো উপায়ই নেই, পুরোনো একটা কিনেছিলাম ষ্টিন ব্রাদার্স থেকে, কিন্তু কিছুতেই ডেলিভারী পাচ্ছি না তার।'

'চিঠিপত্র যা দেবার দিয়ে দিন আমাকে। আমি কালই রওনা হবো।'

সে রাতে ভালো ঘুম হয় না সীমাচলমের। আবার যেতে হবে রেঙ্গুনে। মা পান আর আলিম, জুয়ার আড্ডা সেই হোটেল, স্বর্ণখচিত বিরাট সোয়ে ডাগন প্যাগোডা আর মজিদ সাহেবের কোয়ার্টার, টুকরো টুকরো সব ছবিগুলো ভেসে আসে চোখের সামনে। কতদিন কেটে গেছে তার পরে কত বিচিত্র অধ্যায় আর বিচিত্রতর জীবন।

রেঙ্গুনে পা দিয়েই আশ্চর্য হয়ে যায় সীমাচলম। অনেক পরিবর্তন হয়েছে শহরের। ফাঁকা জায়গাগুলোয় প্রকাণ্ড অট্টালিকা উঠেছে, আরও প্রশস্ততর হয়েছে দু'একটা রাস্তা। অনেক ঘুরে ঘুরে পুরানো সেই হোটেলটার সামনে এসে দাঁড়ায়। আলিম আর মা পানের সঙ্গে দেখা করে যাবে নাকি একবার। হোটেলের মধ্যে ঢুকে কিন্তু অবাক হয় সীমাচলম। ইংরাজী কায়দায় দরজার দুধারে পাম গাছের টব বসানো

হয়েছে। গোলটেবিল আর সারি সারি চেয়ার পাতা। তকমা-আঁটা বয় ঘোরাঘুরি করছে এদিক ওদিক।

ইঙ্গিতে একটা বয়কে কাছে ডাকে সীমাচলম, 'চীনাসাহেব কোথায় বলতে পারো? হোটেলের মালিক।'

'হোটেলের মালিক? হোটেলের মালিক তো ডি মেলো সাহেব। খাস পর্তুগীজ। চীনা-টীনা নেই এখানে।'

ফিরে আসতে শুরু করে সীমাচলম। সিঁড়ির কাছ বরাবর যেতেই কার চিৎকার শুনতে পায়, 'কালাজী, কালাজী।' ফিরে দাঁড়ায় সীমাচলম। তকমা-আঁটা বেঁটে গোছের একটি বয় ছুটতে ছুটতে এসে সেলাম করে দাঁড়ায়। কাছে আসতে চেনা যায় তাকে। পুরানো চাকর বা ছিট।

'কি খবর বা ছিট, তোমার মনিবরা গেলেন কোথায়?'

আলিম সাহেব মারা গেছেন বছর খানেক হলো। তারপর হোটেল এক সাহেবের কাছে বিক্রি করে কোথায় যে চলে গেছে মা পান, তা সে জানে না। সে কিন্তু ছাড়তে পারেনি হোটেলের মায়া, তাই এই নতুন সাহেবের কাছেই কাজ নিয়েছে আবার।

পকেট থেকে পাঁচ টাকার নোট বের করে তার হাতে গুঁজে দেয় সীমাচলম, তারপর সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে রাস্তায় নেমে আসে।

দিন দশেকের মধ্যেই কাজ শেষ হয়ে যায় সীমাচলমের। স্টীমারের ধার ঘেঁষে চুপ করে বসে থাকে অপস্রিয়মান জেটির দিকে চেয়ে। অনেকদূরে সোয়ে ডাগন প্যাগোডার সোনালী মুকুটটা ঝলমল করে। কর্মব্যস্ত শহরের পাশ কাটিয়ে মোড় ফেরে স্টীমার।

স্টীমারের আর এক কোণে তুমুল সোরগোল। আস্তে উঠে সেইদিকে পা চালায় সীমাচলম।

গুটি পাঁচ ছয় বাঙালী ভদ্রলোক বসেছেন গোল হয়ে। একজনের

হাতে একটি খবরের কাগজ। তারস্বরে চিৎকার করেন তিনি, 'দেখলেন হিটলারের কাণ্ডটা, একেবারে গোঁয়ার গোবিন্দ, একটু যদি বুঝে শুনে কাজ করে! খামখা রাশিয়ার পিছনে লাগবার দরকারটা কি ছিলো এখন?' দলের মধ্যে একটি ভদ্রলোক বলেন, 'কেন অন্যায়টা কি করেছে হিটলার?' উত্তরে যেন ফেটে পড়েন প্রথম ভদ্রলোকটি, 'হুঁ, আপনাদের রক্ত এখন গরম। বিচার-বিবেচনার ধার দিয়েও তো যাবেন না আপনারা। আমার একটি ভাই বুঝলেন, অবিকল হিটলারী মেজাজ। এক ভাইয়ের সঙ্গে জমির দখল নিয়ে মামলা বাধলো। সেই জমিতে বাগদী প্রজা ছিলো গোটাকতক। বারবার বললুম ওই বাগদীগুলোকে হাতে রাখো, অসময়ে দরকারে লাগবে। কিন্তু রক্ত গরম তখন, আমাদের কথা কানে যাবে কেন? লাগলো সেই বাগদীদের পিছনে। অন্য ভাইটিও ঠিক তাই চেয়েছিলো। বাগদীদের লেলিয়ে দিয়ে দিলে তাকে নিকেশ করে।'

'বলেন কি, শেষ করে দিলে একেবারে?' হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে যায় সীমাচলমের।

ভদ্রলোকটি পিছনে ফিরে দেখেন সীমাচলমের দিকে, তারপর বলেন, 'হুঁ, এসব তো প্রায়ই হয় আমাদের দেশে। পদ্মা নদীর নাম শুনেছেন, দুরন্ত পদ্মা? এক একটা চর জেগে ওঠে পদ্মার বুকে আর জনদশেক করে মানুষ খুন হয়। যে আগে দখল নিতে পারবে, চর তার। চর জাগার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে লাঠিয়ালের দল। রক্তে লাল হয়ে যায় চরের মাটি। যার কব্জির জোর বেশী, তার হয় মাটি।'

আবার জাহাজের ধারে এসে দাঁড়ায় সীমাচলম। অনেকদূরে মংকি পয়েন্টের সীমানা কালো বিন্দুর মতো দেখা যায়। চারিদিকে শুধু অথৈ জল, ঘোলাটে আর ফিকে সবুজ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে, যতো কিছু আগুন জ্বলে' ওঠে এই মাটিকে ঘিরে। এ যুদ্ধও তাই। মাটি

চায় জার্মানী, সে মাটি তাকে দেবে না বৃটেন, ব্যস, শুরু হয়ে গেলো লড়াই। কব্জির জোর যার বেশী সেই দখল নেবে মাটির। এই হয়ে আসছে যুদ্ধের ইতিহাস, আজও তাই।

জেটিতে অগস্টিন সাহেব নিজে এসেছিলেন। মেসিনটার ব্যাপারে একটু চিন্তিতই ছিলেন তিনি। সীমাচলম সঙ্গে করে আনতে পেরেছেন জেনে খুবই সুখী হলেন। মেসিনটা লরীতে চাপিয়ে দিয়ে হাঁটতে শুরু করে দুজনে।

'মিলে একটু গোলযোগ শুরু হয়েছে।' খুব গম্ভীর গলা অগস্টিন সাহেবের।

'গোলযোগ ? সে কি, কিসের গোলযোগ ?'

'আপনি চলে যাবার পরের দিনই চাকার তলায় পড়ে কুলি মারা যায় একটা। চাকাটা কিভাবে যেন লুঙ্গিতে আটকে গিয়েছিলো। চিৎকার শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সুইচ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো, কিন্তু মাথার খুলিতে চোট লাগায় কিছুতেই বাঁচানো গেলো না তাকে। তার মাকে গোটা পঞ্চাশেক টাকা দিয়ে মিটিয়ে ফেলা হয়েছিলো ব্যাপারটা। কিন্তু সারাটা দিন গুজগুজ ফুসফুস চলে মিলের কুলিদের মধ্যে। অসন্তোষের গুমট ভাব। পরের দিন সকালে একটি কুলিও কাজে এলো না, কিন্তু দল বেঁধে সব ব'সে রইলো গেটের দুপাশে। আমি যেতেই ঘিরে দাঁড়ালো আমাকে। কেন, গরীব বলে কি ওদের জীবনের দাম নেই। মেমসাহেবের প্রকাণ্ড লোমওয়ালা যে কুকুর ছিল তার দাম পঞ্চাশ টাকার ঢের বেশী ছিল তা কি জানেনা তারা!

'আমি বোঝাতে চেষ্টা করলাম তাদের। বললাম যে কর্তাদের লিখে আরও বেশী যাতে পেতে পার তার বন্দোবস্তও আমি করবো। কিন্তু আমার কথায় কানই দিল না ওরা, জোট পাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো

একপাশে আর মাঝে মাঝে চিৎকার করে উঠলো, সাদা চামড়া নিপাত যাক। আমাদের জীবনের দাম যারা কুকুর শেয়ালের চেয়েও কম মনে করে, তাদের অধীনে কাজ করবো না আমরা।'

'উপায় ? মিল তাহলে বন্ধ রয়েছে এখন ?'

'হ্যাঁ, একরকম বন্ধই বই কি। কিন্তু আমার মনে হয় ঠিক কুলিদের মুখের কথা এ নয়, পিছনে বড়গোছের কেউ রয়েছে। আমি তার করে দিয়েছি কাশিমভাইয়ের কাছে, তিনি নিজে একবার আসলেই ভালো হয়। কুলিদের মনে কে এই বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিয়েছে যে সাদা চামড়া ওদের শত্রু। কাজেই ভালোভাবে কিছু বোঝাতে গেলেও আমার ওপর ক্ষেপে ওঠে ওরা।'

'ভবতারণবাবুকে দিয়ে চেষ্টা করলে পারতেন একবার।'

'ভবতারণবাবুও তো নেই এখানে। পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে দেশে চলে গেছেন।'

'ও, মনটা খারাপ বলে বোধ হয় জায়গা বদলি করলেন কয়েক দিনের জন্য !'

'না মনের অবস্থার জন্য নয়, আমাকে বলে গেলেন, বিয়ের বুঝি সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে তাই গিয়ে বিয়েটা করে আসবেন চট্ করে।'

বেশ একটু চমকেই যায় সীমাচলম। বিয়ে করতে গেলেন ভবতারণ বাবু ? আবার বিয়ে আর এত শীগগির ! সেদিনের সে কান্নার কোনই মানে নেই বুঝি !

অগস্টিন সাহেবের কথাই ঠিক। মিলের গেটের দুপাশে ভিড় জমায় কুলির দল। শুধু ওদের মিলের কুলি নয়, আশেপাশের আরো দুএকটা মিলের কুলির পাল এসে জোটে। বেশ যেন উত্তেজিত মনে হয় ওদের। পিচবোর্ডের ওপর বড়ো বড়ো করে লাল কালিতে লেখা, 'জবাব চাই'। 'গরীবের জানের দাম চাই'।

সীমাচলম গেটের কাছ বরাবর যেতেই তাকে চারদিক থেকে ছেঁকে ধরে সবাই, 'বিচার করুন এর। গরীবের প্রাণের দাম পঞ্চাশ টাকা! কে দেখবে ফে মঙের কচি ছেলে আর বৌকে? বারবার বলেছি আমরা যে রাত্তির হয়ে গেলো, আজ আর দরকার নেই, কিন্তু ওই ফ্যাকাসে চামড়ার ম্যানেজার কানে তুলেছে আমাদের কথা? সারাদিনের খাটুনির পরে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলো ফে মঙ, তবু তাকে জোর করে মেসিনঘরে পাঠানো হয়েছিলো, বলুন তার মরার জন্য কে দায়ী?'

বিরাট একটা হট্টগোল। দুহাত তুলে বহুকষ্টে তাদের থামায় সীমাচলম। আস্তে আস্তে বলে, 'কোন একটা ব্যক্তিবিশেষকে দায়ী করলেই তো সমস্ত প্রশ্নের জবাব মিলবে না ভাই সব। যাতে ফে মঙের বৌ আর ছেলের সুবন্দোবস্ত হয়, আমি কথা দিচ্ছি, সে চেষ্টা আমি করবো।'

পিছন থেকে বুড়ো গোছের একজন এগিয়ে আসে জোরপায়ে। হাতে তার প্রকাণ্ড নিশান। সবুজ জমির ওপরে ময়ূরের ছবি। এদেশের জাতীয় নিশান। নিশানের লাঠিটা সজোরে ঠোকে মাটিতে আর বলে, 'কিন্তু আমাদের দেশের কলকারখানায় সাদা চামড়ার প্রভুত্ব আমরা মানবো কেন? কেন আমাদের ছেলেদের লোভ দেখিয়ে লড়াইয়ে ঢোকানো হচ্ছে? ওদের জন্যে কেন রক্ত দেবে আমাদের দেশের সন্তান?'

থমথমে আবহাওয়ায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সীমাচলম। কথাগুলো ঠিক কুলি মজুরদের কথা ব'লে মনে হয় না। অনেক নিচে গেছে এর শিকড়। পঞ্চাশ টাকার দাবী এ নয়, এর মূল গভীরতর কোন স্তরে। এ চেতনা আর এ জাগরণ কে আনলো এদের মধ্যে?

'বেশ যা অভিযোগ তোমাদের লিখে দাও আমাকে, আমি মনিবকে জানাবো। এর বেশী আর কি করতে পারি!'

'তাই হবে। তাই করবো আমরা।'

জনতা দুভাগ হ'য়ে সরে যায় দুপাশে, ভিতর দিয়ে মিলে গিয়ে ঢোকে সীমাচলম। চেয়ারে বসে কিন্তু উত্তেজনায় হাঁফাতে থাকে।

অগস্টিন সাহেব ছুটে আসেন তার পাশে, 'দেখলেন তো ব্যাপারটা? কি করা যায় বলুন তো এখন? আমি তো ভেবে কিছু কূলকিনারা পাচ্ছি না। কে এসব ঢোকাচ্ছে এদের মাথায় বলুন তো?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয় কোন একটা রাজনৈতিক দল কাজ করছে এদের পিছনে। পুলিশে খবর দেওয়া ছাড়া আর তো কিছু গতি দেখছি না।'

'কিন্তু ফল কি ভালো হবে তার? আগে আপোষে রফা করার চেষ্টা করুন একটা। এরা তো আমাকে দেখলেই জ্বলে ওঠে। আমি আর ঘাঁটাঘাঁটি করতে চাই না। যা করবার আপনিই করুন।'

সেদিন বিকেলেই মিলের মিস্ত্রী কো মং প্রকাণ্ড ফিরিস্তি দাখিল করে। মাইনে বাড়ানো, মাগ্‌গি ভাতা প্রভৃতি মিলিয়ে পঁচিশটে দফা। সেগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নেয় সীমাচলম, বলে, 'এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হলে কার সঙ্গে করবো আমি?'

'আলোচনা?' মাথাটা চুলকায় কো মং আর কি ভাবে মনে মনে। তারপর বলে, 'আপনি তা হলে অফিসেই চলুন আমাদের। শেয়াজীর সঙ্গে আলাপ করবেন।'

'শেয়াজী' এরা পণ্ডিত কিংবা নেতৃস্থানীয় কোন লোককে বলে।

'কিন্তু কে তোমাদের শেয়াজী? কোথায় থাকেন তিনি?'

'শেয়াজীর নাম জানি না। খুব পণ্ডিত লোক তিনি। আলাপ করলেই বুঝতে পারবেন। উপস্থিত তিনি আমাদের বস্তিতেই আছেন। কিন্তু কাল বিকেলের মধ্যেই দেখা করতে হবে তার সঙ্গে। পরশু তিনি আবার অন্য জায়গায় রওনা হবেন।'

ভারি কৌতূহল হয় সীমাচলমের। কে এই নেতা? শ্রমিকদের বস্তির মধ্যে আশ্রয় নিয়ে এমনি করে চেতনার আগুন জ্বালছেন শ্রমিকদের দুচোখে। সাদা চামড়ার প্রতি তীব্র বিদ্বেষের সৃষ্টি করছেন মজুর মহলে। দেখা করে আসতে আর ক্ষতিটা কি!

'বেশ তাই যাওয়া যাবে! তোমরা কেউ এসে নিয়ে যেও আমাকে।'

সেই পতাকাধারী বুড়ো লোকটি এসে দাঁড়ায় মিলের ফটকের ধারে। তার সঙ্গেই চলতে শুরু করে সীমাচলম। শহরতলী পার হ'য়ে ধানক্ষেতের আলের ওপর দিয়ে সাবধানে পা চালায় দুজনে। ধানক্ষেতের পরেই সারি সারি কাঠের বাড়ি। অপরিসর নোংরা গলি। মুরগী আর শুয়োরের পাল চরছে এখানে সেখানে। অনেকগুলো কাঠের বাড়ি পার হয়ে এক জায়গায় এসে থামে লোকটি। দর্মাঘেরা ছোট্ট একটা কুঠরি। সামনের কপাটে খুব বড়ো করে লেখা 'অন্ধ জাগো'।

বারান্দায় গোটাকয়েক মজুর বসে জটলা করে। তাদের পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢোকে সীমাচলম। ছোট্ট একটা ঘর। বর্মী প্রথায় খুব নিচু টেবিল পাতা মাঝখানে। সারা ঘরে চাটাই বিছানো। দু'একজন বুড়ো শ্রমিক বসে আছে জানলার কাছে।

'আপনি বসুন একটু। উনি বাইরে গেছেন, আসবেন এখনি।' চুপচাপ বসে থাকে সীমাচলম। বাইরের বারান্দায় কালো কুকুর একটা শুয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে। চারদিক ঘিরে থমথমে স্তব্ধতা। টেবিলের ওপরে রাখা "তুরিয়া" খবরের কাগজটা তুলে নেয় সীমাচলম। ভীম বিক্রমে আক্রমণ শুরু করেছে জার্মানী। বৃটেন আর রাশিয়া প্রবল দুই শত্রুকে নাস্তানাবুদ করে তুলেছে। প্রদেশের পর প্রদেশ পুড়ে ছাই, অনেক দিনের গড়া সভ্যতা আর শৃঙ্খলা গুঁড়িয়ে চুরমার।

বারান্দায় অনেকগুলো লোকের পায়ের শব্দ। কথাবার্তাও শোনা যায়।

প্রায় দশবারোজন লোক সশব্দে ঘরে ঢোকে। সকলকেই শ্রমিক শ্রেণীর বলে মনে হয়। পতাকাধারী বুড়োটি এগিয়ে যায়, আর কাকে উদ্দেশ ক'রে বলে, 'তেলের কলের কর্তার লোক এসে গেছেন, আপনার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে।'

'তাই নাকি, বসিয়েছো তো ভিতরে?' বাইরে থেকে গলার শব্দ শোনা যায়।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ঘরের ভিতর আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

'চলো।' কথার সঙ্গে সঙ্গেই ভিতরে ঢোকেন প্রৌঢ় ভদ্রলোক একটি। মুণ্ডিত মস্তক, গৈরিক বাস, হাতে একটি কাগজের ছাতা। ফুঙ্গী (পুরোহিত) বলেই মনে হয় তাঁকে।

এগিয়ে গিয়ে অভিবাদন করে সীমাচলম, 'আপনার কাছেই এসেছি।'

অনেকক্ষণ কোন কথা বলে না লোকটি। তীক্ষ্ণ আর উজ্জ্বল দুটি চোখ দিয়ে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে সীমাচলমের। ভারি অস্বস্তি বোধ করে সীমাচলম। চেয়ে চেয়ে কি এত দেখছে ফুঙ্গীটি! কাজের কথা শুরু করলেই তো পারে এবার, মজুরদের দাবীর কথা আর তাদের ছোটখাটো হাজারো অভিযোগের বিষয়।

'তোমার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে একথা কিন্তু ভাবিনি সীমাচলম।'

চমকে ওঠে সীমাচলম। এ গলার আওয়াজ তো ভোলবার নয়। আজও কাজকর্মের অন্তরালে এই কণ্ঠের প্রতিধ্বনি ভেসে আসে ওর কানে। চেয়ে চেয়ে দেখে সীমাচলম। ছদ্মবেশের আড়ালেও চিনতে ভুল হয় না আসল মানুষটিকে।

'আপনি আকো! আপনি এখানে?'

'আমার এখানে থাকাটা খুব অস্বাভাবিক নয় সীমাচলম, কিন্তু সাদা

চামড়ার ম্যানেজারের তরফ থেকে তোমার প্রতিনিধিত্ব, এটাই যেন আশ্চর্য লাগছে আমার কাছে।'

ওদের দু'জনকে ঘিরে দাঁড়ায় মজুরের দল। ব্যাপারটা ওদের কাছেও নতুন ঠেকছে। এত মোলায়েমভাবে কি কথা বলছেন শেয়াজী! সোজা কথার সোজা উত্তর। হয় দাবী মেটানো চাই আমাদের, নয়ত মিলের কাজ বন্ধ রাখতে হবে। ব্যস, সাফ কথা।

সীমাচলমের কাঁধে একটা হাত রাখেন আকো। আস্তে আস্তে বলেন, 'আমার সঙ্গে বাইরে আসবে একটু, অবশ্য যদি আপত্তি না থাকে কোন। এদের চোখের সামনে ব্যাপারটা বড্ড নাটকীয় হয়ে যাচ্ছে।'

আগাছার জঙ্গল পার হয়ে উঁচু একটা ঢিপির ওপরে বসেন আকো। সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকার। অনেকদূর থেকে ঝিঁঝিঁ পোকার অশ্রান্ত আওয়াজ ভেসে আসে। আকাশের কোণে পাণ্ডুর চাঁদের ফালি। আকোর পাশেই বসে পড়ে সীমাচলম।

'দল থেকে পালিয়ে আসার শাস্তি জানো সীমাচলম?' খুব গম্ভীর গলার আওয়াজ আকোর।

উত্তর দেয় না সীমাচলম। মাথা নিচু করে বসে থাকে।

'আমি জেল থেকে বেরিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি তোমাকে। ছোট বড় সমস্ত শহরে লোক পাঠিয়েছি তোমার জন্য। তুমি কেন বিনা আদেশে সরে এলে?'

সীমাচলমের গলার আওয়াজ কেঁপে ওঠে, সংশয় আর দ্বিধায় মেশানো কণ্ঠস্বর, 'আমায় মাপ করুন। এ পথে চলবার মত সাহস পাচ্ছি না আমি। এ পথ যেন আমার নয়।'

'সীমাচলম?' চিৎকার করে ওঠেন আকো, 'জুতোর ঠোক্করেও কি তোমাদের চেতনা হয় না? বোঝ না, এই হচ্ছে সময়? ইউরোপের বুকে

যে আগুন জ্বলে উঠেছে তার একটু ছোঁয়াচ কি লাগছে না তোমার বুকে ? এ সুযোগ যদি হারাই আমরা, তবে হাজার বছরের মধ্যেও বোধ হয় আর উঠতে পারবো না।'

ম্লান চাঁদের আলোয় চোখদুটো জ্বলে ওঠে আকোর। দৃঢ়সংবদ্ধ দুটি ঠোঁট, সমস্ত শরীর আবেগে দুলে ওঠে।

'ওদের আসন টলছে। হিটলার যে খেলা শুরু করেছে ও দেশে, তার শেষ যে এদেশেই করতে হবে আমাদের। পারস্য থেকে চীন-জাপান পর্যন্ত সব একজোট হতে হবে। শিকড় টেনে তুলে ফেলতে হবে সীমাচলম। না, দাসত্ব আর নয়।'

'কিন্তু সামান্য একটা প্রদেশে মুষ্টিমেয় কতকগুলো শ্রমিক নিয়ে কি করতে পারবেন আপনি ?'

'সবই করতে পারবো। প্রত্যেকটি লোকের মনে সাদা চামড়ার প্রতি তীব্র বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলতে হবে। বোঝাতে হবে, ওদের সঙ্গে কোন সংস্রব নেই আমাদের। আমাদের রসদে ওরা গোলাঘর ভরবে, আমাদের সৈন্য দিয়ে ওদের দেশ বাঁচাবে, এসব কিছুতেই চলবে না। আজ আর কোন দ্বিধা নয়, সংশয় নয়, একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে সবাইকে। এই বোধ হয় আমাদের শেষ চেষ্টা। তোমাকে আমার চাই সীমাচলম। এদেশের প্রবাসী ভারতীয়দের চোখের ঠুলি খুলে ফেলতে হবে তোমাকে। বুঝিয়ে বলতে হবে তাদের, এখানে আর কোন ভেদাভেদ নেই, কোন প্রদেশের বিচার নয়, কোন ধর্মের বিচার নয়, আমরা সকলেই শুধু পরাধীন, শিকল আমাদের ভাঙতেই হবে।'

এলোমেলো বাতাসে আকোর গৈরিক আচ্ছাদন ইতস্তত: উড়তে থাকে, দুটি চোখে অস্বাভাবিক দীপ্তি। সীমাচলমের ঘুমন্ত রক্তকণিকায় সাড়া জাগে। দূরে অস্ত গেছে সূর্য, সমস্ত পশ্চিম আকাশে গাঢ় রক্তের প্রলেপ।

রাত্রি নামবে, নিকষ কাজল রাত্রি, অনন্ত সুষুপ্তি হয়ত। কিন্তু শিকল ছেঁড়ার এ সংগ্রামে এগিয়ে যাবে সীমাচলম। কোন ক্লান্তি আর জড়তা নয়, নিশ্চিত পদবিক্ষেপে শুধু এগিয়ে যাওয়া।

'কি আমায় করতে হবে বলে দিন।'

'সীমাচলম, তুমি আমার সঙ্গে থাকো শুধু। সময় আমাদের খুবই অল্প। এই অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত এশিয়ার বুকে আগুন জ্বালাতে হবে আমাদের। গ্রাম থেকে গ্রামে, প্রদেশ থেকে প্রদেশান্তরে শুধু বিদ্বেষের মশাল জ্বালিয়ে বেড়াতে হবে।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। কি ভাবছেন আকো? সন্ধ্যাতারার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন, তারপর আস্তে আস্তে বলেন, 'সত্যিই আশ্চর্য্য লাগে, ভারতীয়েরা কিছুতেই কি সচেতন হবে না? বিশেষতঃ এদেশে যারা বাস করে, তারা যেন শাসকসম্প্রদায়ের সঙ্গেই একাত্ম হয়ে আছে। এদেশের লোকেদের দিকে কোনদিন চোখ ফিরিয়ে দেখে না। এদের সুখ দুঃখ, এদের ব্যথা বেদনা সম্বন্ধে যেন উদাসীন। এদের তোমাকে জাগাতে হবে সীমাচলম। ভারতীয় শ্রমিকেরা হয়ত একদিন হাত মেলাবে বর্মীদের সঙ্গে, কিন্তু চাকুরিজীবী মধ্যবিত্তরা কোনদিন ফিরেও চাইবে না এদের দিকে।'

'আপনি আমায় পথ বলে দিন, আপনার নির্দেশে আপনার কথামতই আমি চলবো।'

'কাল বিকালে এ জায়গা থেকে রওনা হবো। তুমি আমার সঙ্গে চলো সীমাচলম।'

একটু ইতস্ততঃ করে সীমাচলম। চলে যেতে হবে? কালই? কি ভাববেন অগস্টিন সাহেব? কাশিমভাই সাহেবই বা বলবেন কি? তার চেয়ে কিছুদিন থেকে বরং কাজে ইস্তফা দিয়ে গেলেই তো সবদিক থেকে ভালো হয়।

কিন্তু আকোর মত তা নয়। কে কি ভাবলো আর মনে করলো এইসব ছোটখাটো চিন্তা করবার সময় আজ নয়। পা ফেলে এগিয়ে যেতে হবে। পিছিয়ে থাকা মানেই মৃত্যু।

তবু ইতস্তত: করে সীমাচলম। অগস্টিন সাহেবের এতটা বিশ্বাসের বুঝি এই হবে প্রতিদান! কিন্তু মুখে আর কিছু বলে না। কেবল আস্তে জিজ্ঞাসা করে, 'বেশ, কাল আপনার সঙ্গে কোথায় দেখা হবে বলুন?'

'সন্ধ্যার পরে আমার লোক তোমার কাছে চিঠি নিয়ে যাবে, তার সঙ্গেই চলে এসো।'

'বিছানায় শুয়ে সেরাত্রে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুম আসে না সীমাচলমের। গুমট ভাব একটা। বাতাসও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বিছানা ছেড়ে সে উঠে পড়ে। চেয়ারটা টেনে নিয়ে জানলার ধারে গিয়ে বসে।

সব কিছু ছেড়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে নতুন পরিবেশে। নিশ্চিন্ত আরাম নয়, দুর্বার সংগ্রামে, যে সংগ্রামে একটা জাতির স্বপ্ন সফল হয়, কিম্বা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। কিন্তু এ রকম আবার হয় নাকি কখনও? চীন, জাপান, বর্মা, ভারতবর্ষ সমস্ত দাঁড়াবে পাশাপাশি, সাদা চামড়ার সঙ্গে সমানে করবে লড়াই? এ যেন বিশ্বাসই হতে চায় না। নিজেদের মধ্যে এত দলাদলি যাদের মধ্যে, তারা আবার একজোট হতে পারবে না কি কোনদিন? কে তাদের টেনে আনবে আর পাশাপাশি দাঁড় করাবে? আকোর কথা মনে পড়ে সীমাচলমের, অা ঠুনের কথাও মনে আসে। কিন্তু এরা পারবে কি সবাইকে এক করতে? কে শুনবে এদের কথা? গোটা কয়েক পিস্তল আর কিছু বারুদ, এই নিয়ে ইংরাজের মুখোমুখি দাঁড়ানো কি সম্ভব? সংশয় জাগে সীমাচলমের মনে, যদি ঘুরে যায় চাকা, গুপ্তচরের মারফৎ সব কিছু যদি জানাজানি হয়ে যায়! এদেশের ইতিহাসে এ তো

নতুন নয়। তখন, তখন কি হবে অবস্থা? নিশ্চিত মৃত্যু, এ ছাড়া আর কোন পথ নেই। ওদেরই বুলেটের গুলীতে ছিন্নভিন্ন হবে ওর শরীর। কিন্তু জয়ী যদি হয় ওরা, আর ভাবতে পারে না সীমাচলম, সামান্য চিন্তাতেও শিহরণ জাগে সারা দেহে।

জানলার কপাটে মাথাটা রেখে চুপ করে বসে থাকে সীমাচলম। আস্তে আস্তে চোখ দুটো বুজে আসে একসময়ে।

স্বপ্ন দেখে, তেজী ঘোড়ার পিঠের ওপর বসেছে। যতদূর দেখা যায় সশস্ত্র সৈন্যের সার। সমস্ত প্রাচ্যের লোক দাঁড়িয়েছে পাশাপাশি, ওর এক ইঙ্গিতে এখনই যেন ঝাঁপিয়ে পড়বে হুঙ্কার করে। ডানপাশে আর একটি ঘোড়ার ওপরে আকো। চক চক করে জ্বলছে দুটি চোখ। অনেক যুগের সঞ্চিত বিদ্বেষ সে দুটি চোখে। তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। কান পাতা যায় না মুমূর্ষুর বিলাপে আর উন্মত্ত জয়ধ্বনিতে। বারুদের কালো ধোঁয়ায় স্পষ্ট কিছু দেখা যায় না। চোখ দুটো কুঁচকে দেখে সীমাচলম, পিছু হটে যাচ্ছে ইংরাজেরা। কামান, বন্দুক, আর সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ফেলে পিছু হটছে তারা। দূরে সমুদ্রের নীল জলে সারি সারি জাহাজ। মাস্তলে মাস্তলে সাদা নিশান উড়ছে। সন্ধির প্রস্তাব করতে চায় ওরা! বেশ তো, আপত্তি কি? স্তিমিত হয়ে আসে আকোর চোখের দীপ্তি, সন্ধিই হোক তবে। আমাদের মাটি ছেড়ে চলে যাক ওরা। আমাদের মাঠ আর ফসল, আমাদের কলকারখানা আমাদেরই থাক।

বিরাট শঙ্খধ্বনি! কি বিকট শব্দ! চমকে ওঠে সীমাচলম। না, শঙ্খধ্বনি তো এ নয়, তেলের কলের বাঁশি বাজে ভোরবেলা। মিটে গেল নাকি ধর্মঘট! চোখদুটো জোর করে মুছে নেয় সীমাচলম। এখনো আবছা অন্ধকার, কালো দেখায় মিলের বিরাট কাঠামোটা, কিন্তু ওপরে

লাল হয়ে এসেছে সারা আকাশ। সূর্য উঠেছে, কিম্বা এখনি উঠবে, তারই আভাস পূবের আকাশে।

দরজা খুলতেই অগস্টিন সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। সীমাচলমকে দেখে ঘুরে দাঁড়ান, 'এই যে সীমাচলম। কাল রাতে একটা কাজে ব্যস্ত ছিলাম, অনেক রাত্রে ফিরেছি, আপনাকে আর তাই বিরক্ত করিনি। কালকে কি ঠিক হলো ?'

'এখনো ঠিক হয়নি কিছু। আজকে আর একবার যেতে হবে। কিন্তু আজ সকালে মিলের বাঁশী শুনে আমি ভাবলাম মিটে গেলো বুঝি ধর্মঘট। কুলি মিস্ত্রীরা কাজে বুঝি যোগই দিলো ?'

'না-না, অতো সহজে মাথা ওরা নোয়াবে না। বললাম না আপনাকে কোন একটা রাজনৈতিক দল ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছে ওদের। মিল আমি ঠিক চালাবো। কালই পুলিশ কমিশনার মিঃ ডেভিসের সঙ্গে পরামর্শ করে রাতারাতি নতুন মজুরের আমদানী করেছি নদীর ওপার থেকে। তাদের আমি মিলে রেখেছিলাম রাত্রিবেলা, আজ সকালে তারা কাজ শুরু করেছে।'

'সর্বনাশ, গোলমাল একটা নিশ্চয় হবে তাহলে। আপনি আবার নতুন লোক আনতে গেলেন কেন চুপিচুপি ? পুরানো মজুররা মিলের গেটে এলে নির্ঘাৎ একটা হাঙ্গামা বাধবে আজ।'

হাসেন মিঃ অগস্টিন, 'সে জন্য ভাববেন না। সেদিকটাও ভেবে সমস্ত বন্দোবস্ত করেছি আমি। ওই দেখুন।'

আলো-আঁধারের মধ্যে চেয়ে দেখে সীমাচলম। মিলের গেটের দু'পাশে লাঠি হাতে অনেকগুলো পুলিশ বসে আছে। মিলের আশে-পাশেও দেখা যায় দু'একজন পুলিশ। এমন অবিবেচকের মত কাজ কেন

করলেন মিঃ অগস্টিন ? বিশেষতঃ মিলের কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সীমাচলমই যখন চালাচ্ছিলো আলাপ আলোচনা।

সীমাচলমের মুখচোখের ভঙ্গিতে ব্যাপারটা কিছুটা আন্দাজ করেন মিঃ অগস্টিন, 'আপনি ভয় পাবেন না। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমাদের ইউরোপের অবস্থার সুযোগ নিয়ে কোন একটা দল নাস্তানাবুদ করতে চায় আমাদের। এখন থেকে ওদের সায়েস্তা করতে না পারলে, এদেশে বাস করা দায় হবে আমাদের।

মুখোসটা বুঝি খুলে পড়ে অগস্টিন সাহেবের। এইবার বুঝতে পারে সীমাচলম এই জায়গায় সব ইংরাজই এক। উপনিবেশ হাতছাড়া হবার সামান্য সম্ভাবনাতেই বিচলিত হয়ে ওঠে এরা। এতদিন কিন্তু অগস্টিন সাহেবকে অন্য সকলের থেকে আলাদা করেই ভেবেছিলো সীমাচলম। কিন্তু আজ মনে হয় এদের দয়া মায়া দাক্ষিণ্য সব কিছু পরে, প্রভুত্ব আর সাম্রাজ্যবাদের নিচে আর সব।

'কিন্তু আপনাদের তরফ থেকে যে আমি ওদের সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করেছিলাম, তার কি হবে ?'

'কথাবার্তা আপনি চালিয়ে যান, এদিকে মিল চালাতে থাকি আমি।'

আর কথা বাড়ায় না সীমাচলম। বিশ্রী একটা সংঘর্ষ শুরু হবে এবার মজুরে মজুরে। হয়ত লাঠি চালাবে পুলিশ। কেলেঙ্কারিই হবে একটা। তার চেয়ে এগিয়ে গিয়ে সব কথা খুলে বলাই ভালো আকোকে। অন্ততঃ কোনরকম গোলমালের সৃষ্টি না করে, বুঝিয়ে যদি শান্ত করা যায় মজুরদের।

ভোর থাকতেই বেরিয়ে পড়ে সীমাচলম। মিলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ায়। সত্যিই কাজ শুরু করেছে নতুন মজুর মিস্ত্রীরা। লুঙ্গি আর গেঞ্জি গায়ে, মাথায় তোয়ালে জড়ানো। গ্রাম থেকেই এদের আমদানি করা হয়েছে বোধ হয়। অগস্টিন সাহেব ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন

তাদের মধ্যে। কারুর কাঁধে হাত দিয়ে, কারুর পিঠ চাপড়ে উৎসাহিত করছেন।

এগিয়ে যেতে যেতে সীমাচলম ভাবে এমনি করে কাঁধে হাত দিয়ে আর পিঠ চাপড়ে অনেকদূর এগিয়েছে এরা। ভেদনীতি আর তোষামোদ এই বিরাট দুই পক্ষের ওপর নির্ভর করে নিঃশঙ্কভাবে উড়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কতদিন ? দিকে দিকে সত্যিই জাগছে মানুষ! কুয়াশার ঘোর কেটে যাচ্ছে।

আকোর সঙ্গে দেখা হয় ঠিক বাড়ির সামনেই। সঙ্গে খর্বকায় পীতবর্ণ একটি ভদ্রলোক, তার হাতে ফটো তোলবার সরঞ্জাম। হাত মুখ নেড়ে কি বোঝায় আকোকে। সীমাচলমকে এত সকালে দেখে একটু আশ্চর্যই হয়ে যান আকো, 'কি ব্যাপার এত সকালে ?'

'একটু কথা ছিল আপনার সঙ্গে।' সঙ্গের লোকটির দিকে চেয়ে বলে সীমাচলম।

'ও', লোকটির দিকে মুখ ফেরান আকো, 'বেশ মিঃ সুজুকী, তাই কথা রইলো, আপনি চেষ্টা করবেন যাতে ফটোগুলো আজ বিকেলেই পাই। আমি আবার আজকেই রওনা হবো কিনা।'

'বেশ, আমি বিকেলের আগেই ফটোগুলো দেখিয়ে যাবো আপনাকে।' লোকটি ধান ক্ষেত পার হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরে দাঁড়ান আকো, 'বলো, কি বলবে।'

সমস্ত কথা শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর মুখ ঘুরিয়ে ডাকেন, 'স মিয়া, স মিয়া।'

দু'তিনবার ডাকের পরে বারো তের বছরের মেয়ে বেরিয়ে আসে একটি, 'বাবা নেই বাড়িতে। মাঠে গেছে। কি দরকার গো তোমার ?'

'শোন, একটু এসো তো এদিকে।'

এগিয়ে এসে মেয়েটি আকোর গা ঘেঁষে দাঁড়ায়, 'কি বলবে বলো।

আমার রাত্রির কাজ পড়ে রয়েছে ঘরে, বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারবো না।'

'তোমার বাবাকে এখুনি ডেকে আনতে হবে। লক্ষ্মীটি, দৌড়ে চলে যাও মাঠে। আমার নাম করে বলো এখুনি একবার চলে আসতে।'

মেয়েটি তীরবেগে মাঠের ওপর দিয়ে বাগানের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

'আমি শুধু বলতে এসেছি, মজুররা যদি মিলের গেটে গিয়ে জোটে তবে নির্ঘাৎ মারামারি বাধবে একটা।'

'না, আজ মজুররা যাবে না মিলের দিকে। দশটার সময় প্যাগোডার চাতালে মিটিং আছে, সেইখানেই যাবে সবাই। তুমি আসছো তো বিকেলে ?'

আচমকা প্রশ্নে একটু থতমত খেয়ে যায় সীমাচলম। 'হ্যাঁ, আসবো বৈ কি, নিশ্চয় আসবো। আজ বিকেলে আপনার লোক যাবে তো আমার কাছে ?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়। তুমি তৈরী থেকো। আজই আমাদের এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হবে। আরো কিছুদিন এ জায়গায় থাকতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু উপায় নেই। কাজ রয়েছে নানাদিকে।'

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। ধানক্ষেতের ওপরে কালো দুটি বিন্দু দেখা যায়। দুটি মূর্তি। সেই মেয়েটি টেনে নিয়ে আসছে একটি লোককে। আকোর কাছে এসেই হাঁটু মুড়ে প্রণাম করে লোকটি, 'আপনি আমায় ডেকেছেন শেয়াজী ?'

'হ্যাঁ, স মিয়া, বসো, একটু কথা আছে।'

'বলুন।' আকোর সামনে মাটিতে উবু হয়ে বসে পড়ে লোকটি।

'নদীর ওপার থেকে নতুন মজুর আমদানি করেছে সাদা চামড়া, খবরটা শুনেছ নাকি ?'

দাঁতের পাটি বের করে সশব্দে হাসে লোকটি, 'হ্যাঁ, শুনেছি বৈ কি ? সে সময়ে চাউঠোতে আমি যে ছিলাম সাহেবের সঙ্গে।'

'তাই নাকি ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, মিটিংয়ের খবরটা দিয়ে ফিরে আসছি কাল সাঁঝের বেলা, পারের ঘাট বরাবর দেখি দুটো পুলিশ নিয়ে এগিয়ে আসছে মিলের সাহেব। আমাকে দেখে একটা সেপাই বললে, এই শোন্ এদিকে। তার ডাকের সঙ্গে সঙ্গে আমি একেবারে পাড়াগেঁয়ে মেড়া বনে গেলাম। দু'হাত এগোই তো তিন হাত পেছোই। মিলের সাহেব এগিয়ে এসে কড়কড়ে টাকা একটি রাখলেন আমার হাতে, বললেন, জোয়ান কুলি পাওয়া যাবে এখানে ? ভালো মাইনে দেবো। তাড়ি খাবার পয়সা দেবো, পোয়ে (নাচ দেখবার খরচাও দেবো হপ্তায় হপ্তায়। আমি বললাম নিশ্চয় পাওয়া যাবে হুজুর, তবে গাঁয়ের মধ্যে পুলিশ নিয়ে ঢুকলে মেয়েপুরুষ ইস্তক সবাই গাঁ ছেড়ে পালাবে। তার চেয়ে আপনি বসুন এই গাছের তলায়, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমি নিয়ে আসছি মজুর। কতজন চাই বলুন।'

'জন ত্রিশেক হলেই কাজ চলে যাবে।'

'ব্যস, ব্যস, নিশ্চিন্ত হয়ে বসুন আপনি।'

'তারপর যোগাড় হলো লোক ?' কপট গাম্ভীর্য আকোর গলায়।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে নিয়ে এলাম জুটিয়ে। বাইরে থেকে মজুররা তো হল্লা করুক, ভেতর থেকেও ওরা দরকার হলে ঠিক বেরিয়ে এসে যোগ দেবে। খালি হাতে আসবে না, মিলের মেসিনের কলকব্জা খুলেও নিয়ে আসতে পারবে।'

'আচ্ছা তুমি এখন এসো স মিয়া। বেলা দশটায় মিটিং মনে আছে তো ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, মনে আছে বৈ কি। আমি ঠিক সময়েই হাজির থাকবো



লোকটা চলে যাবার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত চুপ করে বসে থাকে সীমাচলম। তারপর এক সময়ে আস্তে আস্তে বলে, 'আচ্ছা বিরোধ তো আপনাদের সাদা চামড়ার সঙ্গে, কিন্তু কাশিমভাইয়ের মিলকে অচল করে লাভ কি?'

'লাভ এই যে, ব্যাপারটা বুঝে কাশিমভাই এদেশীয় কোন লোককে ম্যানেজারীতে বহাল করবেন। ইংরাজের তাঁবে কেউ কাজ করতে চায় না, এটা ওদের মত লোকের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া উচিত। এখনও যেসব শিল্প আর বাণিজ্য আমাদের হাতে রয়েছে, সেখানে এদের প্রভুত্ব কেন সইবো আমরা?'

'কিন্তু এখনও তো বড়ো বড়ো শিল্প আর বাণিজ্য ওদেরই হাতে রয়েছে।'

'চিরদিন থাকবে না। সমস্ত জায়গা থেকে হটতে হবে ওদের, তার আয়োজনই চলছে। আচ্ছা ওই কথা রইলো। আমি উঠি।'

উঠে পড়েন আকো। সীমাচলমও উঠে দাঁড়ায়। ইচ্ছা করেই একটু ঘুরপথে আসে প্যাগোডার পাশ দিয়ে। উঁচু চাতালের ওপরে মাচা বাঁধা হয়েছে। দু'একজন শ্রমিক ঘোরাঘুরি করছে এপাশে ওপাশে। মেয়েকুলিও রয়েছে দু'একজন।

মিলের গেটের সামনেই দেখা হয় অগস্টিন সাহেবের সঙ্গে, 'আজ আর পুরানো মজুর কেউ এসে জোটেনি তো এখানে?'

'কাল আপনার পুলিশের কাছে যাওয়ার খবর হয়ত পেয়ে থাকবে ওরা, তাই আর সাহস করেনি আসতে।'

তাই কি? কথাটা যেন ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারে না অগস্টিন সাহেব। মজুরদের উদ্ধত ভঙ্গি আর বিদ্বেষ-শাণিত দৃষ্টি তিনি কিছুতেই ভুলবেন না। পুলিশের ভয়ে পিছিয়ে যাবার মত কিন্তু মনে হয়নি তাদের।

'মিঃ সীমাচলম, আসুন না মিলের মধ্যে। কথা আছে আপনার সঙ্গে।'

অগস্‌টিন সাহেবের ভারি গলার আওয়াজে একটু আশ্চর্য হয়ে যায় সীমাচলম। গেটের ভিতর দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে বলে, 'চলুন। আমারও একটু দরকার আছে মিলের মধ্যে।' যন্ত্রপাতির আওয়াজ থেকে একেবারে কোণের দিকে সরে যায় দুজনে। একটা নিচু টুলের ওপরে পা রেখে দাঁড়ান অগস্‌টিন সাহেব, তারপর সীমাচলমের একটা হাত নেন নিজের হাতে। 'আপনি আমার কাছ থেকে কিছু একটা লুকোচ্ছেন মিঃ সীমাচলম। সত্যি বলুন?'

'লুকোচ্ছি? আপনার কাছ থেকে? সে কি?' মুখে আর গলার আওয়াজে একটা বিস্ময়ের ভাব আনে সীমাচলম। 'না-না, লুকোবার কি আছে আপনার কাছে?'

'কাল হঠাৎ মাথার ঠিক ছিল না আমার। খেয়ালের মাথায় একেবারে পুলিশ কমিশনারের কাছে চলে গিয়েছিলাম, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে বড়ো বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছে।'

'একবার কাশিমভাই সাহেবকে জানালে হতো।'

'কাশিমভাই সাহেবকে আমি অন্ততঃ তিনখানা চিঠি লিখেছি, তারও করেছি একটা, কিন্তু কোন উত্তর নেই। কিছুই বুঝতে পারছি না ব্যাপার।'

'আমার মনে হয় মজুরদের সঙ্গে মিটমাট করার একটা চেষ্টা করলে হতো।'

'হতো না মিঃ সীমাচলম। আমি ওদের সঙ্গে কথা বলেই বুঝেছিলাম যে এরা ঠিক পাঁচ দশ টাকা মাইনে বাড়ানোর কথা বলছে না। আরও গভীর ওদের মিশন। ওরা ওদের দেশ থেকে সরাতে চায় আমাদের। আমি মোটেই আশ্চর্য হবো না এই নিয়ে যদি সমস্ত বর্মায় বিদ্রোহের সৃষ্টি হয় একটা।'

'স্বাধীনতালাভের জন্য যদি বিদ্রোহই করে, সেটা কি অন্যায় হবে মিঃ অগস্টিন ?'

'হয়তো হবে না। কি জানি ঠিক কিছুই বুঝতে পারছি না। মার্থার চিঠিটা পাবার পর থেকে সমস্ত কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।'

'ও, তাঁর চিঠি পেয়েছেন বুঝি! এখন কোথায় আছেন তিনি ?'

'উপস্থিত কোথায় আছেন, তাতো বলতে পারবো না। মাসখানেক আগের লেখা চিঠি কাল পেয়েছি। এসেছে দেরাদুন থেকে। লিখেছে শীঘ্র অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হবে তাদের, আর ভবিষ্যতে কোনরকম পত্রব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হবে না।'

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন অগস্টিন সাহেব। সীমাচলমেরও একটা অস্বস্তি লাগে।

বিকেলের দিকে একটু চঞ্চল হ'য়ে ওঠে সীমাচলম। জিনিসপত্র বলতে বিশেষ কিছুই নেই তার। কিন্তু যা আছে তাই বা কি করে নিয়ে যাবে অগসটিন সাহেবের সামনে দিয়ে ? কোথায় যাচ্ছে যদি জিজ্ঞাসা করেন অগস্টিন সাহেব, কি বলবে সীমাচলম ? মুস্কিলেই পড়ে যায় সে।

'টেলিগ্রাম!'

টেলিগ্রাফ-পিয়ন। এতদিনে বুঝি অগস্টিন সাহেবের চিঠির উত্তর এলো। পিয়নের গলার আওয়াজে মেসিনঘরের পাশ থেকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসেন অগস্টিন সাহেব।

'দেখি, এদিকে দাও।' টেলিগ্রামটি হাতে নিয়েই কিন্তু ফিরিয়ে দেন অগস্টিন সাহেব, 'আপনার তার মিঃ সীমাচলম।'

ওর তার! ওকে আবার তার পাঠাবে কে ? পর পর অনেকগুলো চেনা লোকের ছবি ভেসে ওঠে চোখের সামনে। কিন্তু কে পাঠাবে তার ?

টেলিগ্রাম খুলেই কিন্তু থর থর করে হাতটা কেঁপে ওঠে সীমাচলমের। মাথাটা ঘুরে যায়। চেয়ারের ওপরে বসে পড়ে।

'কি ব্যাপার, খারাপ খবর নাকি কিছু? উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটে আসেন মিঃ অগস্টিন। সীমাচলমের হাত থেকে টেলিগ্রামটা নিয়ে পড়েন।

'আমি অত্যন্ত বিপন্ন, আপনি এই মুহূর্তে চলে আসুন।'—হামিদা বানু।

সীমাচলমের দিকে চেয়ে দেখেন মিঃ অগস্টিন, 'হামিদা বানু কে? আপনার কোন আত্মীয়া কি? তাই বা কি করে হবে, আপনি তো—'

'হামিদা বানু কাশিমভাইয়ের স্ত্রী। এই মুহূর্তে আমাকে রওনা হতে হবে।'

ব্যাপারটা তবুও যেন পরিষ্কার হয় না। কাশিমভাইয়ের স্ত্রী বিপন্না তো সীমাচলমকে ছুটে যেতে হবে কেন? কাশিমভাইয়ের অসংখ্য বিশ্বস্ত কর্মচারী রয়েছে সেখানে, সুযোগ্য ম্যানেজার রয়েছে, এতদূর থেকে আর একজন কর্মচারীর ডাক পড়বে কেন?

মিঃ অগস্টিনের দিকে ফিরে বলে, 'দয়া করে কোন প্রশ্ন করবেন না আমায়। ব্যাপারটা আমার কাছেও আশ্চর্য ঠেকছে, কিন্তু যেতে আমায় হবেই।'

উঠে দাঁড়ায় সীমাচলম, কিন্তু তারপরে মনে পড়ে রেঙ্গুন যাবার জাহাজ তো ছেড়ে গেছে আজ সকালে বেলা দশটায়। উপায়? মিঃ অগস্টিনকে বলতে উপায় একটা ঠিক করে দেন তিনি। ছ'টা নাগাদ মালের জাহাজ যাবে একটা। চেনা-জানা লোক আছে তাঁর সেই জাহাজে। অনায়াসেই সীমাচলমের যাওয়ার বন্দোবস্ত হতে পারে। এদিকের সমস্যা মিটতে ওদিকের একটা বড় সমস্যার কথা মনে হয় সীমাচলমের। বিকেলে আকোর সঙ্গে যাবার কথা যে তার! ওকে বিশ্বাসঘাতক ভাববেন আকো, ভাববেন সাহস নেই এ পথে আসবার তাই

ছল করে সরে দাঁড়িয়েছে। কিম্বা আরো কিছু অনায়াসেই ভাবতে পারেন তিনি। কিন্তু সমস্ত বাধা সরিয়ে হামিদা বানুর বিষাদম্লান মুখের ছবি ভেসে আসে। আয়ত দুটি চোখে করুণ ব্যথিত দৃষ্টি।

হঠাৎ একটা মতলব মনে আসে সীমাচলমের। এই নতুন মজুরদের কাউকে দিয়ে অনায়াসেই তো খবর দেওয়া যায় আকোকে। সামান্য দু'এক ছত্র লিখে দেওয়া যায়, অত্যন্ত জরুরী কাজে অন্য জায়গায় চলে যেতে হচ্ছে, কিন্তু সুযোগ পেলেই আবার মিলিত হবে তাঁর সঙ্গে। যে কাজের ভার তিনি দেবেন, তাই নেবে মাথায় তুলে।

কোণের মেসিনটার সামনে আধবুড়ো গোছের একজন মিস্ত্রী কাজ করছে। আস্তে আস্তে পাশে গিয়ে দাঁড়ায় সীমাচলম। 'চাউঠো থেকে আসছো তো তোমরা? আমি সব কথা জানি তোমাদের। আমি তোমাদের শেয়াজীর খুব পরিচিত। একটা কাজ করবে আমার?'

মেসিন থামিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে সীমাচলমের দিকে চেয়ে থাকে লোকটি। কথাগুলো যে বুঝতে পেরেছে, তা মনে হয় না তার মুখ দেখে।

'একটা চিঠি নিয়ে যেতে হবে শেয়াজীর কাছে, এখুনি। পারবে না?'

মাথা নাড়ে লোকটা। শেয়াজী আবার কে? ও নামে তো কাউকেই চেনে না। চাউঠো থেকে সাহেব নিয়ে এসেছে তাকে মিলের কাজ করতে। বলেছে মোটা মাইনে, তাই চলে এসেছে।

হতাশ হয় সীমাচলম। কিছুই স্বীকার করতে চায় না লোকটা। সমস্ত কিছু ব্যাপারে অজ্ঞতা প্রকাশ করে। একে দিয়ে কিছু হওয়া মোটেই সম্ভব নয়।

স্টেশনে নেমে সীমাচলম দেখে অচেনা স্টেশন মাস্টার। কর্মচারীর মধ্যেও অনেকে নতুন। পাশ কাটিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে। অসংখ্য চিন্তা

কিলবিল করে মাথার ভিতরে। কাশিমভাইয়ের বাড়ির সামনে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। একি চেহারা হয়েছে বাড়িটার। সামনের বাগানের অবস্থা হতশ্রী। ঘাস হয়েছে বড়ো বড়ো। বুনো গাছে সমস্তটা ছেয়ে ফেলেছে। লাল কাঁকরের পথের ওপরেও এখানে ওখানে গজিয়ে উঠেছে লজ্জাবতী লতা আর নাম-না-জানা গাছের সার।

সিঁড়ির সামনেই দেখা হয় মিঃ নায়ারের সঙ্গে। হন্তদন্ত অবস্থায় সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিলেন, হঠাৎ সীমাচলমকে দেখেই দাঁড়িয়ে পড়েন। বিবর্ণ হয়ে যায় তাঁর মুখ। কষ্টে উচ্চারণ করেন, 'একি—আপনি—আপনি এখানে মিঃ সীমাচলম?'

'হ্যাঁ, এইমাত্র এসে পৌঁছোলাম। কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো, সব যেন কেমন ছাড়া ছাড়া লাগছে।'

'আসুন আমার সঙ্গে। আমার বাড়িতেই উঠবেন। এখানে থাকার অসুবিধা রয়েছে অনেক।' হৃদ্যতার সঙ্গে সীমাচলমের হাতটা টেনে নেন মিঃ নায়ার।

এগোতে গিয়েই কিন্তু বাধা পায় সীমাচলম। ওপর থেকে ছোকরা চাকর নেমে এসে সামনে দাঁড়ায়, 'মা আপনাকে ওপরে ডাকছেন।'

মিঃ নায়ারের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে ওপরে উঠে আসে সীমাচলম। ঘরের চারপাশে কালো পর্দা টাঙানো। সমস্ত যেন অগোছাল। পর্দাটা নড়ে উঠতেই সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে ওঠে সীমাচলম। আপাদমস্তক কালো কাপড়ে ঢেকে ধীর পায়ে প্রবেশ করে হামিদা বানু। মুখ একটুখানি উন্মুক্ত। কালো কালো চুলের গোছা কপালে এসে পড়েছে, উড়ছে কানের পাশে। লাল দুটি চোখ। ইঙ্গিতে সীমাচলমকে বসতে বলে নিজে কৌচের এক কোণে বসে পড়ে।

'আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে শুনেছেন বোধহয়।'

'না কিছু শুনিনি তো ?'

'মিঃ নায়ার কিছু বলেননি আপনাকে ?'

'না।' খুব শুকনো গলায় কথা বলে সীমাচলম।

'কাশিমভাই মারা গেছেন।'

'তাই নাকি, কই আকিয়াবে আমরা কোন খবরই তো পাইনি।' গলায় কিন্তু বিস্ময়ের স্বর জমে না সীমাচলমের। কতকটা যেন আন্দাজ করতে পেরেছিলো সে। চারদিকে কালো পর্দার আচ্ছাদনে আর হামিদা বান্থর পোশাকের মধ্যে কোথায় যেন এই কথাটাই লুকিয়ে ছিল।

'ইচ্ছে করেই আপনাদের জানানো হয়নি কিছু। মিলে এখন গণ্ডগোল চলছে, এই সংবাদে হয়তো আরও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারে, সেইজন্মেই কোন খবর দেওয়া হয়নি।'

'কি হয়েছিলো তাঁর ?'

'জানি না।'

রীতিমত চমকে ওঠে সীমাচলম। সমস্ত ব্যাপার অস্পষ্ট আর রহস্তময় বোধ হয়। স্বামী কিসে মারা গেছে, জানে না হামিদা বান্থ ? তার মানে ? তার মুখের বিস্ময় চোখ এড়ায় না হামিদা বান্থর।

'ব্যাপারটা বোধ হয় একটু অদ্ভুত ঠেকছে ? মিঃ নায়ারের সঙ্গে পাইনের জঙ্গল দেখতে যান কাশিমভাই টাউনজীতে। আর ফিরে আসেননি। মিঃ নায়ার এসে বললেন, তিনি নাকি 'ক্র্যাগহিল' থেকে পা ফসকে নিচে পড়ে গিয়েছেন। এ ব্যাপারটায় অবশ্য আশ্চর্য হইনি বিশেষ, কারণ মানুষের মৃত্যু কতভাবেই না হতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য হলাম যখন কয়েকদিন পরে তাঁরই দেরাজ থেকে উইল বের করলেন মিঃ নায়ার। সেই উইলে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি—ব্যবসা-বাণিজ্য, টাকাকড়ি, ঘরবাড়ি, সমস্ত কিছু দিয়ে গেছেন ফতিমাকে। যে বাড়িতে

বসে আপনার সঙ্গে কথা বলছি, এটা পর্যন্ত ফতিমার। সে আমাকে পনেরো দিনের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে যাবার নোটিশ দিয়েছে।'

সীমাচলম কি একটা বলতে যেতেই বাধা দেয় হামিদা, 'মোটামুটি ব্যাপারটা সবই তো শুনলেন। এখন আর নয়। স্নান-আহার করে জিরিয়ে নিন একটু। তারপর বিকেলে আবার কথাবার্তা হবে।'

কৌচ ছেড়ে উঠে পড়ে হামিদা বানু। সঙ্গে সঙ্গেই আগের চাকরটি এসে দাঁড়ায়। তার নির্দেশে নিজের সেই পুরানো ঘরে এসে ঢোকে সীমাচলম। ধূলো জমেছে এধার-ওধার। টেবিলের ওপরে, চেয়ারগুলোয় বেশ কয়েকদিনের ধূলো। ঘরের কোণে কোণে মাকড়সার জাল।

খাওয়া-দাওয়া সেরে চেয়ারে চুপচাপ বসে থাকে সীমাচলম। সমস্ত অবাস্তব মনে হয়। হামিদা বানুকে এভাবে পথে বসাবার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে কাশিমভাইয়ের? ফতিমাকে সব কিছু দিয়ে যাবারই বা কি হেতু থাকতে পারে? চিন্তার যেন কূল-কিনারা নেই কোন। কোথায় গেলো কাশিমভাইয়ের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা?

তন্দ্রায় চোখ একটু জড়িয়ে আসতেই দরজায় মৃদু করাঘাতে সে চমকে উঠে বসে। ভেজানোই ছিলো দরজাটা। আস্তে দরজাটা ঠেলে ভিতরে ঢোকেন মিঃ নায়ার।

'খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে?'

ঘাড় নাড়ে সীমাচলম।

'আপনি হঠাৎ যে চলে এলেন কাজকর্ম সব ছেড়ে? বিশেষতঃ মিলের এই গণ্ডগোলের সময় আপনি চলে এসে অত্যন্ত অন্যায় করেছেন।'

মিঃ নায়ারের গলার সুরে কোথায় যেন একটু কর্তৃত্বের সুর ধ্বনিত হয়। কৈফিয়ৎ চান নাকি মিঃ নায়ার!

'কাশিমভাইয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছিলো একটু। সেই জন্য হঠাৎ চলে আসতে হলো।'

'তাহলেও আপনার দরখাস্ত করা উচিত ছিলো। এভাবে নিজের ইচ্ছায় যখন-তখন যেখানে-সেখানে যাওয়া-আসা করা যায় না বিনা হুকুমে, এতদিন কাজ করে অন্তত: এইটুকু আপনার জানবারই কথা।' স্বর একটু নরম হয়ে আসে মিঃ নায়ারের, 'যাক, যা করেছেন, তার তো আর চারা নেই। আপনি কাল ভোরের ট্রেনেই ফিরে যান। এ কয়দিন না-হয় ছুটি হিসেবেই ধরে নেবো।'

চেয়ারের হাতলটা শক্ত হাতে ধরে সীমাচলম। মাথাটা তুলে কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ে থাকে মিঃ নায়ারের দিকে, তারপর আস্তে আস্তে বলে, 'কাশিমভাইয়ের বিবিকে এই অবস্থায় ফেলে আমার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব।'

'প্রভুপত্নীর প্রতি অসীম করুণা দেখছি আপনার।' বিদ্রূপে কুঁচকে আসে মিঃ নায়ারের মুখের রেখা, 'কিন্তু মাত্রাটা একটু ছাড়িয়ে যাচ্ছেন না কি?'

'হবে, খুব উদাসীন মনে হয় সীমাচলমের গলা। কথা কাটাকাটি করার মোটেই ইচ্ছা নেই তার। কুৎসিত এই পাঁকের গন্ধ গায়ে মাখার সাধ নেই একটুও। কিন্তু তবু দৃঢ় হতে হবে। নইলে সব কিছু তলিয়ে যাবে চোখের সামনে। পায়ের তলায় চোরাবালি একটু একটু করে গ্রাস করার আগে শক্ত মাটির উপর দাঁড়াতে হবে তাকে।

'মিঃ সীমাচলম, ছাই দিয়ে আগুন চাপার কোন মানে হয় না। আপনার ব্যাপার সমস্তই জানি। কাশিমভাই সাহেবের এই মৃত্যুর কারণ আপনি। আপনার সঙ্গে বিবিসাহেবার সম্পর্কটা আবিষ্কার করার পর থেকেই মনের দিক থেকে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিলেন কাশিমভাই। কাজকর্মের মধ্যে কেবলই এই কথাটা খোঁচা দিত তাঁকে। অবশ্য মুখ ফুটে কোনদিনই কাউকে তিনি বলেননি এসব। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর

ডায়েরী থেকে এসব জেনেছি আমি। ক্র্যাগহিল থেকে পা পিছলে পড়ে যান যখন, তখন নিশ্চয় আপনাদের কথাই বিষক্রিয়ার মত সর্বাঙ্গ নিস্তেজ করে দিয়েছিলো তাঁর। সর্বদাই একটা অন্যমনস্ক ভাব, এ আমরা সকলেই লক্ষ্য করেছি। বিবিসাহেবার সঙ্গে আপনার আলাপ বুঝি অনেক দিনের? সেই মিলের গোলমালের দিনই আন্দাজ করেছিলাম একটু। মিসেস নায়ারও ঠিক ধরেছিলেন ব্যাপারটা। আজকে আপনার হঠাৎ চলে আসার ইতিহাসটাও আর রহস্যময় মনে হচ্ছে না। কাশিমভাই সাহেবের কথা ভাবতেই দুঃখ হচ্ছে, একটা নষ্ট মেয়েমানুষকে নিয়ে—

হুঙ্কার করে লাফিয়ে ওঠে সীমাচলম। সশব্দে চেয়ারটা পড়ে যায় মাটিতে। থর থর করে সমস্ত শরীর কাঁপে সীমাচলমের। কপালের দুপাশের শিরাগুলো উত্তেজনায় ওঠানামা করে, 'বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান। এই মুহূর্তে ঘরের চৌকাঠ পার হয়ে যান আপনি, নয়ত বিশ্রী একটা কাণ্ড হয়ে যাবে। ছোটলোক, ইতর কোথাকার—'

সীমাচলমের মুখের দিকে চেয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার সাহস হয় না মিঃ নায়ারের। পিছু হেঁটে চৌকাঠ পার হয়ে দরজার ওপাশে গিয়ে দাঁড়ান। তারপর বলেন, 'বাড়িঘর মিল কারখানা সমস্ত ফতিমা বিবির, আমি তাঁর এস্টেটের ম্যানেজার এবং অভিভাবক, কথাটা মনে রাখলে এ উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে আসতে দেরি হবে না।'

দরজাটা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের ওপর মাথা রেখে চুপচাপ বসে থাকে সীমাচলম। অসহ্য উত্তাপ কানের দুপাশে। মনে হয় শরীরের সমস্ত রক্ত অসম্ভব বেগে ছুটে আসছে সারা মুখে।

অনেকক্ষণ পরে মাথা তোলে সীমাচলম। প্রথমটা সব ঝাপসা ঠেকে, কালো তরল অন্ধকারের স্রোত, তারপর একটু একটু করে পরিষ্কার হয়ে আসে সব। ঠিক দরজার পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে হামিদা বানু।

একটা হাত দরজার পাল্লার ওপরে আলতোভাবে রাখা। ছলছল দুটি চোখ। কাঁপছে দুটি ঠোঁট।

'আপনি এখানে?'

উত্তর দেয় না হামিদা বানু। চুপ করে তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে থাকে। পাথরের প্রতিমার মত। কিন্তু নিস্পন্দ নয়, মনে হয় দুঃসহ ব্যাথায় চিড় খেয়ে বুঝি ফেটে যাবে পাথরের প্রতিমা।

'মাপ করবেন, একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম আমি—'

বাধা দেয় হামিদা বানু, 'আপনি ব্যস্ত হবেন না। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছিলাম আমি, সমস্তই আমার কানে গিয়েছে।'

'সব শুনেছেন আপনি?'

'না শুনে উপায় ছিলো না। মিঃ নায়ার কোন সময়েই আস্তে কথা বলেন না। আমার জন্য আপনার গায়ে ধূলোকাদা লাগছে, এইটিই আমার সবচেয়ে লজ্জার বিষয়।'

দুহাতের মধ্যে মাথাটা রেখে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে সীমাচলম। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপর বলে, 'কি করবেন আপনি এখন?'

'আমাদের এখানে আর একদণ্ড থাকা চলবে না।'

'আমাদের?'

'হ্যাঁ আমাদের। আপনার আর আমার।'

'কোথায় যাবো আমরা?'

'এ-বাড়ির চৌকাঠ না ডিঙিয়ে একথার উত্তর দেওয়া যাবে না। এত বড় একটা প্রদেশে কোথাও কি ঠাঁই হবে না দুজনের?'

ঠাঁই! এদেশের পাহাড় আর উপত্যকা, গঞ্জ আর শহর, প্রান্তর আর অরণ্য। হয়ত কোথাও মিলে যেতে পারে ঠাঁই। আর না-ই যদি

মেলে, সামনে প্রসারিত রয়েছে অনন্ত পথ, তাই ধরে যাত্রা শুরু হোক। যাযাবর জীবনের আরম্ভ।

বিকেলের দিকে ফতিমার সঙ্গে একবার দেখা করবার চেষ্টা করে সীমাচলম। কিন্তু চাকর এসে জানিয়ে দেয়, তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত, দেখা করার সময় হবে না। এ রহস্য কিন্তু ভেদ করতে পারে না সীমাচলম। কি ভাবে ফতিমাকে করায়ত্ত করলে মিঃ নায়ার? তার সমস্ত সম্পত্তির একচ্ছত্র পরিচালকের আসন কিভাবে সংগ্রহ করলে। জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় কিছুই আর অসম্ভব মনে হয় না। সবই হতে পারে সব সময়ে, এ নিয়ে মিছে মাথা ঘামানো।

ভোর রাতের দিকে বেরিয়ে পড়ে দুজনে। সীমাচলমের কাঁধে শানব্যাগে ঝোলানো টুকিটাকি জিনিসপত্র, আর হামিদার হাতে ছোট্ট অলঙ্কারের বাক্স। গেটের কাছে দারোয়ানটা উঠে সসম্ভ্রমে সেলাম ঠোকে, কিন্তু একটুও বিস্ময় প্রকাশ করে না। এ যেন জানা কথা, অতিমাত্রায় স্বচ্ছ আর পরিষ্কার।

স্টেশনে এসে গ্যাসের বাতির নিচে মুখোমুখি বসে দুজনে। কনকনে শীতের হাওয়া। চারপাশে কুহেলির হিম আস্তরণ, পিছনে রবার গাছের ওপরে শুকতারার অম্লান দীপ্তি। সামনে কুয়াশা ভেদ করে সিগন্যালের লাল রংয়ের আলো দেখা যায়। এখনও আধ ঘণ্টা দেরি আছে ট্রেনের।

'ফতিমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেছিলাম।'

'দেখা হলো?'

'না, খুব ব্যস্ত তিনি। দেখা হোল না।'

'ব্যস্ত বৈ কি! ঠোঁট মুচকে হাসে হামিদা, 'মিঃ গোপালন্ এসেছিলেন যে!'

'মিঃ গোপালম্! তিনি আবার কে?'

'শহরের ছোকরা আই-সি-এস। মিঃ নায়ারের দূর সম্পর্কের আত্মীয়।'

পরিষ্কার হয়ে আসে সমস্ত ব্যাপারটা। কুয়াশাও অনেকটা তরল। দূরের গাছপালা দেখা যায় দু'একটা। সিগন্যালের লাল আলো রূপান্তরিত হয়েছে গাঢ় সবুজ রংয়ে। ট্রেন আসবে এইবার। টিকেটঘরের দিকে এগিয়ে যায় দুজনে।

'কোথাকার টিকেট কেনা যায় বলুন তো?'

'জাহান্নামের।'

টিকেটঘরের লোহার জালের ফাঁক দিয়ে কতকগুলো আলোর রেখা এসে পড়ে হামিদা বানুর মুখে। অস্পষ্ট কয়েকটা আলোর আঁচড়। পাথরের মতন কঠিন মুখের ভাব। চোখ দুটো জ্বলছে নীলার মত। কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর সামলে নেয় হামিদা বানু। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা চেপে ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর খুব আস্তে বলে, 'রেঙ্গুনেই তো যাওয়া যাক প্রথমে।'

বিশেষ ভিড় নেই গাড়িতে। সালুইন নদীর পার দিয়ে চলে রেলের লাইন। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকটা কাঁটাগাছের ঝোপ আর ছোঠ ছোট শালের চারা। বিস্তীর্ণ প্রান্তর। অনেকদূরে আকাশের গায়ে ম্লান হয়ে আসে রবার গাছের সার।

বাইরে থেকে চোখ ফিরিয়ে আনে হামিদা বানু। একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে আছে সীমাচলম।

'কি দেখছেন?'

'দেখছি, নারী যখন সাজানো ঘর ফেলে বাইরে চলে আসে তখন কি চেহারা হয় তার মুখের?'

'সাজানো ঘরই বটে । যাক।'

সীমাচলমের চোখের সামনে ছবি ভেসে আসে। নববধূবেশে মোটরে চলেছিল হামিদা বানু, পাশে তার কাশিমভাই। প্রচুর ফুল আর আলো। উৎসব-সজ্জায় সমস্ত কিছু আলোকিত। আর আজ!

জানলার কপাটে হেলান দিয়ে চোখ বুজে থাকে সীমাচলম। গাড়ির চাকা আর ইস্পাতের লাইনের ঠোকাঠুকিতে অদ্ভুত শব্দ। সুন্দর ঐক্যতান। চোখ দুটো ঘুমে জড়িয়ে আসে।

আচমকা একটা ধাক্কায় জেগে ওঠে সীমাচলম। আস্তে আস্তে ওর হাত দুটো ঠেলছে হামিদা বানু ।

'কি ব্যাপার ? কি হলো ?'

মুচকে হাসে হামিদা বানু। 'হয়নি কিছু, কিন্তু এই ঝাঁ ঝাঁ দুপুর পর্যন্ত কিছু না খেয়ে থাকবেন নাকি ?'

ভারি লজ্জিত হ'য়ে পড়ে সীমাচলম। সত্যি, খেয়ালই হয়নি তার। গাড়ি থেমেছে কি একটা ইস্টিশনে। জানলা দিয়ে মুখ বের করে খাবারওয়ালাকে ডাকে সীমাচলম।

মধ্যে আর একটা মাত্র স্টেশন, তারপরেই রেঙ্গুনে পৌঁছাবে ওরা। কিন্তু উঠবে কোথায় গিয়ে ? জানাশোনা কারুর আশ্রয়ে নিশ্চয় উঠবে না হামিদা বানু।

প্রশ্নের উত্তরে হামিদা বানু আয়ত চোখদুটি তুলে শুধু চেয়ে থাকে সীমাচলমের দিকে। ভাবটা যেন, ওকে নির্ভর করেই তো ভেলা ভাসিয়েছে। স্রোতের টান আর চোরাবালি বাঁচিয়ে ওই তো নিয়ে তুলবে নিরাপদ উপকূলে।

অনেকগুলো আলোর মালা। খুব ভিড় লোকের। গাড়ি প্লাটফর্মে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই আওয়াজে কান পাতা যায় না। ভিড়ের মধ্যে একটু

ভয়ই পায় হামিদা বানু। আস্তে আস্তে সীমাচলমের পিছনে পিছনে নামে সন্তর্পণে। কেবলি পা জড়িয়ে আসে আর ধাক্কা লেগে যায় সীমাচলমের সঙ্গে। সমস্ত কুণ্ঠা দূরে সরিয়ে সবল হাতে হামিদা বানুর একটা হাত জড়িয়ে ধরে সীমাচলম। ভিড় কাটিয়ে যেতে পারলে হয়। বাইরে যাবার সিঁড়ির কাছে ভীষণ ভিড় এক খবরের কাগজওয়ালাকে ঘিরে। সবাই খুব উত্তেজিত। কি আবার হলো এখানে? সামনের বেঞ্চের ওপর প্রসারিত খবরের কাগজের আড়ালে বসেছিলেন যে লোকটি তার পিছনে গিয়ে দাঁড়ায় সীমাচলম। ঝুঁকে পড়ে দেখে কাগজের দিকে। বড় বড় শিরোনামা—"পার্ল হারবারে জাপানী বিমানের প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ।" চোখের সামনে ঘুরপাক খায় কালো কালো অক্ষরের সার। আকোর সেদিনের কথাগুলো মনে পড়ে। সমস্ত এশিয়া একজোট হবে, এই ধ্বংসযজ্ঞে কারো নিস্তার নেই। পুরানো সব কিছু ছাই করে দিয়ে নতুন জগৎ গড়বে নয়ত নিজেরা পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাবে। জাপান, চীন, বর্মা, ভারত থেকে সুদূর পারস্য, আরব। বিরাট এক অধ্যায়ের সূচনা মাত্র।

মুখ তুলে সীমাচলম দেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে হামিদা। খবরটা পড়েছে বোধ হয়।

'কি হবে?'

'কিসের কি হবে?'

'যুদ্ধ তো আমাদের দরজায় এসে গেলো!'

'তাতো আসবেই। চিরকাল কি পাঁচিলের বাইরে আর পরের দরজায় থাকবে!'

'ভুল বুঝবেন না আমায়। ভয় আমি পাইনি। আমি শুধু ভাবছি এরা কি তৈরী আছে এই বিরাট আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য? অর্ধমৃত এই জাতের মধ্যে স্পন্দনের আভাস কোথায়?'

হামিদা বানুর হাত ধরে মৃদু টান দেয় সীমাচলম, 'এটা প্লাটফর্ম ভুলে যাবেন না। চারিদিকে সজাগ কানের অভাব নেই। চলে আসুন।'

পুল পার হয়ে শহরের রাস্তায় এসে দাঁড়ায় দুজনে।

এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজির পর বাসা মেলে শহরের উপকণ্ঠে। কবে কোন্ সময়ে সুদূর মণিপুর থেকে পৌনা শ্রমণেরা এসে ডেরা বেঁধেছিলো সে খবর জানা যায় না। কারণ একঘর পৌনারও অস্তিত্ব নেই এখানে। তবুও জায়গাটার নাম পৌনাবস্তি। রয়েল লেকের পশ্চিম কোল ঘেঁষে ঘন সন্নিবিষ্ট বসতি। বেশীর ভাগই বাঙালী, মধ্যে মধ্যে ইতস্ততঃ ছড়ানো দু-একটা অবাঙালী পরিবার। যে ঘরে বাসা নেয় সীমাচলম, তার ওপরতলায় এক গুজরাটির বাস। কাপড়ের দোকান ছিলো স্থর্তিবাজারে। যুদ্ধের গোলমালে মালপত্তর আস্তে আস্তে গুটিয়ে ঘরে এনে ফেলেছে। সংসারী লোক, বে-হিসেবী নয়। মিছামিছি নিচের তিনখানা ঘর পড়ে থাকা মানে মাসে মাসে একমুঠো করে টাকা লোকসান, কাজেই ভাড়া দিয়ে দেওয়াই সমীচীন ভেবেছে।

খুঁজে পেতে জিনিসপত্তর কিনে ঘর গোছাতে দিন দশেক কেটে যায় সীমাচলমের। সাজানো গোছানো শেষ হ'লে বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে দুজনে। এতক্ষণে যেন হাঁফ ফেলবার সময় পায়, ভাববার অবসর পায় একটু।

'ঘরদোর গোছানো তো হ'লো, তারপর ?' হাতের খবরের কাগজটার দিকে চোখ রেখে সীমাচলম বলে।

'গোছানো ঘর অগোছাল হ'তে আর কতক্ষণ।' তীক্ষ্ণ গলার আওয়াজ হামিদার।

'মানে ? কে আবার অগোছাল করবে ?'

'কেন যারা বিদ্যুতের গতিতে এগিয়ে আসছে।'

হাতের খবরের কাগজটা মেলে ধরে সীমাচলম। পার্ল হারবার থেকে গুয়াম মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধান। সত্যিই বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে আসছে এরা। সমস্ত বাধা, সমস্ত নিষেধ গুঁড়িয়ে চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে এদের পায়ের তলায়। দুনিয়ার কোন শক্তিই বোধ হয় আর থামাতে পারবে না এদের। এখানেও আসবে না কি এরা! সামনে প্রসারিত খবরের কাগজে যেন আশ্বাসের বাণী শোনে সীমাচলম। সাধ্য কি দুর্বল, হীনবীর্য জাপানীদের বর্মার প্রবল প্রাকৃতিক বাধা লঙ্ঘন করে এগিয়ে আসার? নীল সমুদ্রে সিন্ধু শকুনের মত ওৎ পেতে আছে দুর্জয় সিঙ্গাপুর। আওতায় পেলে তীক্ষ্ণ নখরশক্তিতে খানখান করে ফেলবে শত্রুর অর্ণবপোত আর বিমানবহর।

ভোরের দিকে ওদেরই বাড়ির রোয়াকে জটলা হয়। পাড়ার ছেলেবুড়ো অনেকেই জড়ো হয় এসে। সকলেরই একটু শঙ্কিত মুখের ভাব। গুজরাটি ভদ্রলোকটি বলে, 'হু হু করে এগিয়ে আসছে। কই এরা তো বিশেষ ঠেকাতে পারছে না। এ যে একেবারে ঘরের পাশে এসে গেলো।'

'আরে না-না।' অভয় দেবার চেষ্টা করেন মনোজবাবু, রিটায়ার্ড রায় সাহেব। দুনিয়ার সব কিছু বোঝেন এমনি একটা মুখের ভাব, 'যেমন হু হু করে আসছে, অমনি হু হু করে পেছিয়ে যাবে। আরে ভায়া, হাতি কাদায় পড়লে ব্যাঙেও লাথি মারে। কিন্তু কাদা তো আর চিরকালের নয়। কাদা শুকোলেই দেখবে, হাতি হাতি আর ব্যাঙ ব্যাঙ।' নিজের রসিকতায় অনেকক্ষণ ধরে রসিয়ে রসিয়ে হাসেন মনোজবাবু। হাসতে অবশ্য তিনি পারেন, কারণ পার্ল হারবারের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ির মেয়েদের দেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কোন গোলমাল নেই। নিজেও প্রায় পা তুলেই আছেন। এমাসের পেনসনের টাকাটা হাতের মুঠোয় এলেই আর দেরী নয়।

পাড়ার দু'একজন ছোকরা বলে, 'কিন্তু কাজটা খুব সোজা হবে না

আর। একেবারে না ভেবে চিন্তে কি আর ইংরাজ-আমেরিকার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছে জাপান? নিশ্চয় খুব তৈরী হয়েছে।'

'তোমরাও যেমন, ক্ষেপেছো!' হাতের চুরোটটা ছাইদানিতে ঠুকেঠুকে ছাই ফেলেন মনোজবাবু, 'তৈরী থাকলে আর চীনের সঙ্গে লড়াইয়ে হাঁপিয়ে ওঠে বেচারীরা? ওদের দৌড় আমার জানা আছে।'

শুধু ওদের দৌড় নয়, আরো অনেকের দৌড় সম্বন্ধে খোঁজ রাখার চেষ্টা করেন মনোজবাবু। কথায় কথায় একদিন সীমাচলমকে বলে বসেন, 'যাই বলুন মশাই, আপনি কিন্তু খুব কাজের লোক। বেশ জিনিসটা হাত সাফাই করেছেন যা হোক। কোন্ বাগিচা থেকে জোটালেন বলুন তো!' চোখ দুটো কুঁচকে বিশ্রী করে হাসেন মনোজবাবু।

মাথায় রক্ত টগবগ করে ওঠে সীমাচলমের। ইচ্ছা হয় সার্টের কলারটা চেপে ধরে আচ্ছা করে দেয়ালে মাথা ঠুকে দেয় লোকটার। কিন্তু পারি-পার্শ্বিক অবস্থা ভেবে নিজেকে সামলে নেয়। আস্তে আস্তে বলে, 'ছি-ছি, কি যে বলেন আপনি তার ঠিক নেই। উনি যে আমার আত্মীয়া।'

হো হো করে হেসে ওঠেন মনোজবাবু। প্যান্টের দু' পকেটে হাত ঢুকিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়েন, 'আপনি আমায় ন্যাকা পেয়েছেন? যা ইচ্ছে তাই বোঝাবেন আর আমিও বুঝে যাবো? আপনি হ'লেন মাদ্রাজী, আর ওই জেরবাদী ছুঁড়ি আপনার আত্মীয়া? আরও কত কি শুনবো কালে কালে!'

নিজের ভুলটা বুঝতে পারে সীমাচলম। একটু থতমত খেয়ে তারপরেই সামলে নেয়। বলে, 'ভুল করছেন, রক্তের সম্বন্ধ না থাকলে বুঝি আর আত্মীয়া হ'তে পারে না? ওঁর স্বামী আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। মরবার সময় ওঁকে দেখাশোনার সব ভার আমার ওপর দিয়ে গেছেন। উনি আমার কাছে আত্মীয়ের চেয়েও বড়ো।'

হাতের ছড়িটা ঘোরাতে ঘোরাতে রাস্তায় নেমে পড়েন মনোজবাবু। নামতে নামতে বলেন, 'তা হলে তো মস্ত বড়ো সম্পর্ক মশাই! ওনার সমস্ত ভার যখন আপনার ওপরে! বেশ, বেশ, সম্পর্কটা খাড়া করেছেন মন্দ নয়। মামার ক্ষেতে বিয়েলো গাই, সেই সুবাদে মামাতো ভাই।'

মনোজবাবুর কথায় কিন্তু টনক নড়ে সীমাচলমের। জীবনের এ দিকটা সে ভেবেই দেখেনি এতদিন। সম্পর্কহীন ভিন্ন জাতির মেয়েকে নিয়ে আস্তানা বাঁধার পিছনে বিশ্রী ইঙ্গিত একটা লুকানো থাকে। আশেপাশের লোকেদের নজরে পড়াই স্বাভাবিক। কৈফিয়ৎ দেবার মতো সহজ সরল একটা সম্পর্ক গড়ে নেওয়া উচিত। ব্যাপারটা হামিদাকে বলে সীমাচলম। শুনে কিন্তু বিচলিত হয় না হামিদা। অল্প হেসে বলে, 'পুরুষমানুষ কিনা, একটুতেই ভড়কে যান। কোথায় কে এক মনোজবাবু কি একটু বলেছেন, তাতেই একেবারে মাথার ঠিক নেই আপনার। আর দিনের পর দিন আমার অবস্থা যদি শুনতেন! যে যতবার বাড়িতে বেড়াতে আসছে, তাকে একবার করে কৈফিয়ৎ দিতে হচ্ছে আপনার আমার সম্পর্ক সম্বন্ধে।'

'তাই না কি? কি কৈফিয়ৎ দিচ্ছেন আপনি?'

এবারে খুব জোরে হেসে ওঠে হামিদা। হাসির বেগে মাথার ওপর জড়ো করে বাঁধা চুলের রাশ খুলে সারা পিঠে ছড়িয়ে পড়ে। হাতের সোনার চুড়িগুলোয় ভারি মিঠে আওয়াজ সুরু হয়। অনেকক্ষণ ধরে হাসে হামিদা, তারপর বলে, 'কি বলি জানেন? বলি পালিয়ে এসেছি দুজনে। আপনি মাস্টার ছিলেন আমার। ইংরাজি আর ইতিহাস পড়াতেন দু'বেলা। তারপর যা হবার হলো। দিন ঠিক করে রাতের অন্ধকারে রেলে চাপলাম দু'জনে।'

সত্যিই এসব কথা বলেছে নাকি হামিদা? হতেও পারে। কিছুই অসাধ্য নেই হামিদার। সীমাচলম আড় চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে হামিদার

দিকে। তখনও হাসছে হামিদা, কিন্তু বাতির আলোয় দুটি চোখের কোণে চিক চিক করছে দু'ফোঁটা জল।

আস্তে আস্তে বারান্দায় চলে আসে সীমাচলম।

ওপরে গুজরাটির ঘরে রেডিও শুনতে জড়ো হতো আশেপাশের বাসিন্দারা। অন্য কোন খবর নয়, কেবল কতখানি এগুলো জাপানীরা। বর্মার মাটি ছুঁতে আর কত দেরী। হামিদা আর সীমাচলম গিয়ে বসতো এককোণে। মনোজবাবু নেই। জাপানীরা থাইল্যাণ্ডে নামার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দেশের দিকে পাড়ি দিয়েছেন। যাবার সময় হাতের চেরীর ছড়ি গাছটা তুলে বলে গেছেন, 'পিঁপড়ার পাখা ওঠে মরিবার তরে। শেষদিন ঘনিয়ে এসেছে বেটা জাপানীদের। বর্মায় কি রকম নাস্তানাবুদ হয় বেটারা একবার দেখে নিও।'

একদিন রেডিও খোলার সঙ্গে সঙ্গেই জলদগম্ভীর আওয়াজে গম গম করে ওঠে সারা ঘরটা।

"ব্যাঙ্কক। ব্যাঙ্কক। ব্যাঙ্কক।

আমরা সাগরপারের পীতসৈনিক। পৃথিবীর সমস্ত পরাধীন জাতির আমরা মুক্তিকামী। আমরা স্বাধীনতার সনদ আনছি বহন করে। যুগ-যুগান্তের অত্যাচার আর নিপীড়নের অবসান হবে। উৎপীড়নকারী দানব-শক্তি আজ মৃতপ্রায়। তার নাভিশ্বাস উঠেছে। আমাদের এ জয়যাত্রায় আপনারা হাত মেলান। বর্মীভাইরা দাঁড়ান আমাদের পাশে এসে। বর্বর শ্বেতশক্তির উচ্ছেদ সাধনে সহায়তা করুন।"

কিছুক্ষণ পর্যন্ত কোন শব্দ নেই ঘরে। নিঃশ্বাসের আওয়াজও পাওয়া যায় না। একটু পরেই আবার রেডিয়োর শব্দ।

"আপনারা আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন। আমি আপনাদের স্বজাতি।

সারা জীবন আমি বর্মার উন্নতিকল্পে কাটিয়েছি। বৈপ্লবিক কর্মধারার সঙ্গে যাঁরা জড়িত ছিলেন তাঁদের কাছে আমার কণ্ঠস্বর অপরিচিত ঠেকবে না। আমি ভগবান তথাগতের দোহাই দিয়ে আপনাদের বলছি, এশিয়ার সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি আজ বৈদেশিক শাসন থেকে দেশকে জাতিকে মুক্ত করার জন্য বদ্ধপরিকর। কল্পনা করুন আমাদের সোনার বর্মা আবার আমাদের হবে। ইরাবতী, সিটাং, সালুইন আমাদের পণ্য বহন করবে। আমাদের গ্রাম, শহর, পথঘাট, গাছপালা, মাটি-পাথর হবে আমাদের নিজস্ব। কোন কিছুতেই শ্বেতশক্তির কলঙ্কিত ছাপ পড়বে না। আমাদের শত শত প্যাগোডা শোভিত সুবর্ণভূমি শৃঙ্খলমুক্ত হবে।

"বাইরে থেকে যতটা সংঘাতের প্রয়োজন পশুশক্তিকে চূর্ণ করতে, আমাদের দিক থেকে তার অভাব হবে না। আপনারা ভিতর থেকে বৈদেশিক শাসনের পঙ্কিল ইমারতে আঘাতের পর আঘাত করুন। সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে ওদের নিস্তেজ, পঙ্গু, দুর্বল করে তুলুন। তারপর আসুন দুজনে হাত মিলিয়ে আমাদের দেশের নতুন ইতিহাস রচনা করি। জননীকে কলঙ্কমুক্ত করি। বলুন—ডোবামা। ডোবামা।"

ঘরের সকলেই অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করে, 'ডোবামা—ডোবামা—স্বাধীন বর্মা—বর্মা স্বাধীন।' শুধু টেবিলের ওপরে মাথা দিয়ে চুপচাপ বসে থাকে সীমাচলম। শরীরের সমস্ত রক্ত যেন প্রবল বেগে মাথার স্নায়ুতন্ত্রীতে নির্মমভাবে আঘাত করতে সুরু করে। সামনের নীল বালবটা মনে হয় হাজার ভোল্টের আলো ছড়িয়ে নিভে যায় দপ্ করে। সারা ঘরে অন্ধকার। গাঢ় জমাট কালো কুয়াশা।

এ গলার স্বর ভুল হবার নয়। কথা বলবার এ অনবদ্য ভঙ্গী আর সুদৃঢ় উচ্চারণ মজ্জায় মজ্জায় গাঁথা আছে সীমাচলমের। কিন্তু বিশ্বাস করতে কিছুতেই মন চায় না। আকিয়াব থেকে ব্যাঙ্কক অনেক মাইলের ব্যবধান।

কিন্তু তবু বার বার নিঃসন্দেহে মনে হয় আকো ছাড়া আর কেউ নয়। বর্মার জাগ্রত প্রাণশক্তি, স্বাধীনতার অগ্রদূত। কিছুই ওঁর অসাধ্য নয়।

সমস্ত ব্যাপারটা নতুন রূপ নেয়। দুটো দল হয়ে যায়। একদলের বিশ্বাস যে জাপানীরা সত্যিই এগিয়ে আসছে বর্মীর সঙ্গে হাত মেলাতে। ওদের সুখদুঃখের অংশ নিতে। বিদেশীদের হটিয়ে স্বাধীন করতে বর্মাকে। আর একদল ঘোর তর প্রতিবাদ করে। বলে ওই আনন্দেই থাকো। সমস্ত ধাপ্পা। বিরাট রাজনৈতিক ধাপ্পা। দেশ একবার দখল করলে জাপানী আর ইংরাজে কোন তফাৎ থাকবে না। এত দূর থেকে ঘরের কড়ি খরচ করে জাপানী আসছে বুঝি পরের দেশকে স্বাধীন করতে? ভাঁওতায় যারা ভুলবে তাদের সর্বনাশ।

'কিন্তু আমাদের দেশের লোকও তো রয়েছে ওদের সঙ্গে।' ছোকরা গোছের এক বর্মী প্রশ্ন করে বসে।

'ওসব ভুয়ো। কি করে জানছো তুমি তোমাদের লোক? তা ছাড়া হয়ত তাকে বন্দী করেই রেখেছে। বক্তৃতা দেবার সময় হয়তো দুপাশে জাপানী সঙীন উঁচিয়ে রাখা হয়েছিলো।'

এসব কথায় কিন্তু বিশ্বাস করে না সীমাচলম। লোকটা যে ভুয়ো নয় সেটা আর যে কেউ বিশ্বাস করুক সে অন্ততঃ করবে না। তা ছাড়া দুনিয়ায় এমন কোন শক্তি নেই যা আকোকে বাধ্য করাতে পারে কোন কথা বলাতে, যে কথা তিনি প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করেন না। ছটফট করে সীমাচলম। কোথায় একটা কাঁটা বিঁধে থাকে। প্রাণান্তকর যন্ত্রণা। কিন্তু মুখ বুজে সহ্য করা ছাড়া আর কি-ই বা উপায় আছে। মাঝে মাঝে মনে হয় সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে ছুটে বেরিয়ে যায়। মাঠে মাঠে, প্যাগোডার চাতালে চাতালে, বন্দরে বন্দরে লোক জড়ো করে চিৎকার করে বলে, 'ভাই সব, এ আহ্বান উপেক্ষা করো না। এ ডাকে সাড়া দাও। এই সুযোগ একবার

হাতছাড়া হলে আর কোন দিন মাথা তুলতে পারবে না তোমরা। অনেক বছরের ঘুম ছেড়ে উঠে দাঁড়াও, হাত মেলাও পীত সৈনিকদের সঙ্গে। পশুশক্তি পরাজিত হোক।'

কিন্তু কোথায় সামান্য একটু বাধা। নীড়ের নিশ্চিন্ত আরাম ওর রক্ত কণিকায় সঞ্চারিত হয়ে দুর্বল করে তোলে ওকে। গৃহের শান্ত পরিবেশ ওকে পঙ্গু করে ফেলে।

ওর এই অস্বস্তির ভাবটা চোখ এড়ায় না হামিদার। একদিন সে স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করে ফেলে, 'কি হয়েছে কদিন ধরে বলুন তো আপনার? রাত্তিরেও যেন ঘুম কমে গেছে। মাঝরাতে দেখি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন চুপচাপ। আমার জন্য যদি অসুবিধা হয়ে থাকে তো বলুন। কেন বোঝা হয়ে থাকবো? আমার পথ আমি খুঁজে দেখছি।'

বিব্রত হয়ে পড়ে সীমাচলম। ইতস্ততঃ করে একটু। সব কথা সবাইকে বলা যায় না। নিজের জীবনের অনেকখানি উন্মুক্ত করেছে হামিদার কাছে। পুরানো অভিজ্ঞতার কথা বলেছে একটু একটু করে। কিন্তু এড়িয়ে গেছে নিজের পরবর্তী দিনগুলোর কথা। কিভাবে উন্মাদের মতন ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে সে কথাগুলো চেপে গেছে। কিন্তু আজ কিছু লুকাতে ইচ্ছা করে না হামিদার কাছে। যা ছিল কেবল স্বপ্ন, তা আজ বাস্তব রূপ নিতে চলেছে। আজ আর শুধু বসে বসে কল্পনা বিলাস নয়, গ্রাম আর শহরের কোণে আত্মগোপন করে বিদ্রোহের সুর ছড়ানোই শেষ নয়, বিরাট গর্জনে এগিয়ে আসছে ঢেউ। তার ফেনিল উচ্ছ্বাস কানে পৌঁছেচে। উদ্দাম আবেগে তটের পর তট ভেঙে আসছে। আজ আর লুকোচুরি নয়।

আস্তে আস্তে সমস্ত কথা একটু একটু করে বলে সীমাচলম। মাথা নিচু করে এক মনে শোনে হামিদা। ওর চুলে গন্ধতেলের উগ্র সুরভি। খোঁপায় রজনীগন্ধার গোছা। ঘাড়ের কাছে চিকচিক করছে সোনার সরু

হায়। নিস্পন্দ হয়ে সমস্ত শোনে হামিদা। অনেকক্ষণ মাথা তোলে না। তারপর আস্তে আস্তে বলে, 'আমি অন্যায় করেছি সীমাচলম। আপনাকে ডেকে এনে সত্যিই অন্যায় করেছি। কিন্তু আপনিই বা কেন একটা মেয়ের জন্য সব কিছু ছেড়ে এলেন? আকিয়াব থেকে না এলেই পারতেন। আপনাকে পথভ্রষ্ট করেছি একথা আমি কোনদিনই ভুলতে পারবো না। কেন আপনি এলেন? আপনার ওপরে দাবী করার আমার কি অধিকার জন্মেছিলো?'

ঠোঁটদুটো কাঁপে হামিদার। সারা গালে রঙের আভাস। একি ওর আহত নারীত্বের অভিমান? সত্যিই কি কোন দাবীই ওর নেই সীমাচলমের ওপরে? প্রথম দেখা থেকে শুরু করে মিলের সেই রাত্রির ঘটনা কি একটু আঁচড়ও কাটেনি হামিদার মনে?

চোখদুটো তুলে সীমাচলমের দিকে চায় হামিদা। আয়ত দুটি চোখের পরিপূর্ণ দৃষ্টি। অনেক দূরে কোথাও কে গান গেয়ে চলেছে। বাইরে বাতাসের মৃদু মর্মর। টলটল করে জল হামিদার চোখে। নিজেকে হারিয়ে ফেলে সীমাচলম। হামিদার দুটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেয়। আজ সমস্ত লুকোচুরির অবসান হোক। মিথ্যা সামাজিকতার বালির চরে আর ঘর বাঁধা নয়। সব কিছু ভেঙে চুরমার হয়ে যাক।

'তুমি তো সবই জানো হামিদা। তোমার ডাক উপেক্ষা করার শক্তি আমার নেই। সব কিছু আমি ছাড়তে পারি তোমার জন্য। তোমার প্রথম দেখা থেকে সুরু করে বুকের মধ্যে দুর্বার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ছটফট করে বেড়িয়েছি। ভগবান তোমাকে আমার পাশে এনে দিয়েছেন। তুমি আমারই থাকো হামিদা।'

হাতদুটি টেনে নেয় না হামিদা। সীমাচলমের হাতটা জড়িয়ে ধরে নিজের গালের ওপর রেখে ও চোখ বোজে। তারপর আস্তে আস্তে বলে,

'কিন্তু আমার জন্য দেশের ডাকও তুমি উপেক্ষা করবে সীমাচলম? দেশের চেয়েও আমি তোমার কাছে বড়ো?'

একটু ইতস্তত: করে সীমাচলম, বলে, 'দেশের চেয়েও তুমি বড় কি না জানিনা হামিদা, কিন্তু দেশের চেয়েও তুমি কাছে। তাছাড়া দেশকে ভালবাসার পথে তুমিতো অন্তরায় নও। তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়াও হামিদা। আমাকে এগিয়ে চলবার সাহস দাও, শক্তি দাও। আমি বিদেশী। তুমি এদেশের মেয়ে। এদেশের কাছে তোমার ঋণ রয়েছে, সে ঋণ তুমি শোধ করো।'

'আমি কি করতে পারি?'

'অনেক কিছু পারো তুমি। তোমার দুর্জয় সাহস তোমার অনন্ত সম্পদ। সে রাত্রির কথা আমি জীবনে ভুলবো না হামিদা। কাশিমভাইয়ের প্রতিভূ হয়ে যেভাবে এগিয়ে এসেছিলে মিলের উন্মত্ত জনতার সামনে, নিজের ওপর অগাধ বিশ্বাস না থাকলে সেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়া যায় না।'

এবারে মুখ তোলে হামিদা। ওর এলোমেলো চুলের রাশ উড়ছে বাতাসে। কপালে আর কানের পাশে দু'একটা টুকরো চুল এসে পড়েছে। ঠোটদুটো অল্প কাঁপছে।

'সীমাচলম, শুধু কি কাশিমভাইয়ের প্রতিভূ হয়েই গিয়েছিলাম? তুমি ডাকোনি টেলিফোনে? তোমার আহ্বান উপেক্ষা করার শক্তি আমার নেই। তোমার বিপদ ভেবেই নিজের আভিজাত্যের খোলস পিছনে রেখে ছুটে গিয়েছিলাম সেখানে।'

'তা জানি হামিদা। সে রাত্রে মশালের আলোয় আবার নতুন করে চিনলাম তোমাকে।'

আরো এগিয়ে আসে হামিদা। মাথাটা রাখে সীমাচলমের বুকের ওপর। দু'হাতে তাকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে সীমাচলম।

অনেকদিনের ঘুমন্ত কামনা যেন ফণা বিস্তার করে। অনেকদিনের উপবাসী মনের খোরাক মেলে বুঝি।

'কিন্তু এ আমি চাই না সীমাচলম। রক্তমাংসের লোভে তুমি তোমার আদর্শ ভুলে যাবে। আমার কেবলই মনে হচ্ছে আমি যেন অপরাধী। অনেক ওপর থেকে টেনে এনে তোমায় পথের ধূলোয় নামিয়েছি।'

হামিদার মুখটা তুলে ধরে নিজের মুখটা এগিয়ে আনতে গিয়েই চমকে ওঠে সীমাচলম।

"সাইগন—সাইগন—সাইগন।

স্বপ্নবিলাসের আজ অবসান। কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়ান সকলে। আমাদের মাটিতে ওদের ছায়া পর্যন্ত সহ্য করবো না। প্রাচ্য থেকে, এশিয়া থেকে ওদের বিতাড়িত করবো। আরো এগিয়ে আসছি আমরা। খিড়কির দুয়ার দিয়ে নয়, সিঙ্গাপুরের সিংহদ্বার দিয়ে। আপনারা প্রস্তুত থাকুন। আজ আমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়েছি প্রাচ্যের সমস্ত জাতি। এক আমাদের লক্ষ্য, এক আমাদের পণ। সমস্ত বাধা সবল হাতে অপসারিত করুন। জাগ্রতে, নিদ্রায়, কর্মে, অবসরে একমাত্র চিন্তা আপনার সঙ্গী হোক দেশের স্বাধীনতা। বলুন, প্রাণ পর্যন্ত পণ, দেশকে কলঙ্কমুক্ত করবো। বিদেশীর নির্যাতন আর নিপীড়ন থেকে উদ্ধার করবো আমার দেশের মাটি। এ দেশ আমার। আমি এর ফলে জলে পুষ্ট, এরই বায়ুতে আমার নিঃশ্বাসের জন্ম। আপনারা প্রস্তুত থাকুন। আমরা আসছি। আপনাদের শুভ কামনা নিয়ে আপনাদের দেশের দিকে অগ্রসর হচ্ছি আমরা। সমস্ত শক্তি দিয়ে সাহায্য করুন। প্রত্যেকে আপনারা স্বাধীনতার সৈনিক। আপনাদের আর কোন সত্তা নেই। দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোন চিন্তার অবসর নেই।"

আলিঙ্গন শিথিল হয়ে আসে।

উঠতে বেশ একটু দেরী হযে যায়। কাঁচের সার্সি দিয়ে রোদ এসে পড়ে বিছানার ওপরে। চন্দনে রোদ। গায়ের চাদরটা ফেলে উঠে পড়ে সীমাচলম। পাশের ভেজানো দরজায় আস্তে আস্তে টোকা মারে। একটু ঠেলা দিতেই খুলে যায় দরজাটা।

বিছানায় নেই হামিদা বানু। মুখ-হাত ধুতে গিয়েছে বোধ হয়। বালিশের পাশে রজনীগন্ধা ফুল কয়েকটা. কাল রাতে হামিদার চুলে জড়ানো ছিলো। এগিয়ে এসে ফুলগুলো নেবার লোভ সম্বরণ করতে পারে না। কিন্তু কিছুটা এগিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। বিছানার পাশে টেবিলের ওপরে ছোট্ট একটি চিঠি। চিঠিটা তুলে নেয় সীমাচলম। একবার দু'বার করে অনেকবার পড়ে, তারপর ঝাপসা হয়ে আসে অক্ষরগুলো। চিঠিটা মুঠোর মধ্যে নিয়ে বিছানার ওপরেই বসে পড়ে।

কয়েক লাইনের চিঠি। ইংরাজীতে।

সীমাচলম,

আমি চললাম। দেশকে আড়াল করে দাঁড়াবার আমার কোন অধিকার নেই। আমি অন্তরাল থেকে তোমার জয় কামনা করবো।

তোমাকে এত কাছে পেয়েও কি দুঃখে ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছি তা তুমি বুঝবে আমি জানি।

আমায় ভুল বুঝো না। প্রণাম নাও।

—'তোমার হামিদা'।

জানলার গরাদ দিয়ে বিছানার ওপর রোদ এসে পড়াতে চমক ভাঙে সীমাচলমের। প্রায় দু'ঘন্টারও বেশী চুপচাপ একভাবে বসেছিলো সে। আস্তে আস্তে উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

সারি সারি ঘোড়ার গাড়ি আর মোটর চলেছে মালপত্তর বোঝাই করে। অনেকেই চলে যাচ্ছে এখান থেকে। কেউ যাচ্ছে উত্তর বর্মার নিষ্কণ্টক অঞ্চলে, কেউ সাগর পাড়ি দিয়ে ভারতবর্ষে সরে যাচ্ছে। আর এখানে থাকা চলে না। বড় কাছাকাছি এসে গিয়েছে জাপানীরা।

ফুটপাথের ওপর দিয়ে কাতারে কাতারে লোক হেঁটে চলেছে। এরা অপেক্ষাকৃত গরীব শ্রেণীর লোক। নিজের পোঁটলাপুঁটলি নিজেরাই ঘাড়ে পিঠে করে নিয়েছে। পিছন ফিরে তাকাবার মত কিছু নেই এদের, আঁকড়ে থাকার মতও কিছু নেই। এরা অনেকটা শেওলার মত, জলের স্রোতের সঙ্গে এঘাট আর ওঘাট করে বেড়ায়। কিন্তু এই অবিশ্রাম জনস্রোতের ফাঁকে কোথায় পাওয়া যাবে হামিদাকে? তবু খোঁজ একবার করতেই হবে। যে ক'রেই হোক, ফিরিয়ে তাকে আনতেই হবে।

সীমাচলম কোট গায়ে দিয়ে তৈরী হয়ে নেয়। হামিদার জিনিসপত্র সব ঠিকই আছে। গহনার বাক্সও রয়েছে পড়ে। দু'একটা পরনের কাপড় ছাড়া আর বোধ হয় কিছু নিয়ে যায়নি সঙ্গে। ছোকরা চাকরটাকে দরজা বন্ধ করতে বলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে সীমাচলম।

জনতার সঙ্গে পথ চলতে মন্দ লাগে না। আজগুবি গল্প শুনতে শুনতে এগিয়ে যায়। অদ্ভুত সব গল্প। জাপানীরা নাকি কচি ছেলেও খায়। পা দুটো দড়ি দিয়ে বেঁধে আগুনে ঝলসে নেয় প্রথমে, তারপর গোল হয়ে বসে সবাই একসঙ্গে ছুরি দিয়ে কেটে কেটে নেয় খানিকটা করে। আরো অনেক সব গল্প।

'আমাদের কি দরকার ভাই ঝক্কি পোহাবার। যাদের দেশ তারা বুঝবে। এখন তো সরে পড়ি। টাকা রোজগার করতে এসেছিলুম। দু'পয়সা কামিয়েও নিয়েছি। ব্যস, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই।'

ওরা দুজনে মোড়ের সেলুনের বাঙালী নাপিত। কর্ণফুলীর আশেপাশে

কোথাও বাড়ি। সত্যি, বেশ মোটা রোজগার করেছে ক'বছরে। দেশের রূপাই নিয়েছে, দেশকে ভালোবাসতে পারেনি। দেশের লোকদের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেনি।

অন্য সময় হলে হয়ত ঘুরে দাঁড়াতো সীমাচলম। তর্ক করতো ওদের সঙ্গে। শৃগাল মনোবৃত্তির নিন্দা করতো। কিন্তু আজ তার মনের অবস্থা এসবের অনুকূল নয়।

ঘুরে জেটির দিকে চলতে শুরু করে সীমাচলম। আজ মঙ্গলবার। কলকাতার দিকে মেলবাহী জাহাজের যাবার কথা। একবার দেখেই আসবে জেটিটা ঘুরে ফিরে।

ভিড় ক্রমেই বাড়ে। বেশীর ভাগই বাঙালী আর বিহারী। মোটরে, ঘোড়ার গাড়িতে, পদব্রজে, কাতারে কাতারে চলেছে লোক। এক-একজন গোটা সংসারই উঠিয়ে নিয়ে চলেছে, অন্ততঃ মালের বহর দেখে তাই মনে হয়। লাইট পোস্টের ধারে দাঁড়ায় সীমাচলম। এই অগণিত জনস্রোতের মধ্যে কোন পরিচিত লোককে খুঁজে বের করা দুসাধ্য। কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে সীমাচলম স্টেশনের দিকে এগিয়ে যায়।

এখানে ভিড় বিশেষ নেই বললেই হয়। দু'একজন সাধারণ যাত্রী চলেছে শুধু। পাশাপাশি কয়েকটা লোক্যাল ট্রেন দাঁড়িয়ে। আস্তে আস্তে পায়চারী করে সীমাচলম। আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে গাড়ির ভিতরে। না, বেশীর ভাগ যাত্রীই বাজারের শাকসবজি বিক্রেতা। কাছাকাছি জায়গা থেকে মাল নিয়ে আসে শহরের বাজারে। বিক্রি শেষ করে ফিরে যায়। এদের মধ্যে কোন চেতনা নেই, বর্মার সীমারেখার পাশ ঘেঁষে কি দাপাদাপি চলেছে, তা জানবারও কোন স্পৃহা দেখা যায় না। ওরা কেবল জানে লড়াই চলেছে। দেশের জিনিসপত্তর সব চালান যাচ্ছে। তাই ওদের

অবস্থা ক্রমে খারাপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, নিজেদের সওদার দাম ডবলের ওপর চড়িয়েও কূলকিনারা পাচ্ছে না।

বাঁশী বাজিয়ে একটা ট্রেন ছেড়ে দিতেই লাফিয়ে তার পাদানিতে উঠে পড়ে সীমাচলম। বাড়ির দিকে ফিরতে ওর ভালোই লাগে না। তার চেয়ে কাছাকাছি একটু ঘুরে আসা ভালো। কিছুটা সময় তবু তো কাটবে। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে মুগ্ধ হয়ে যায়। নীল আকাশের বুকে ঝলমল করছে সোয়ে ডাগন প্যাগোডোর রৌদ্রদৃপ্ত সোনার মুকুট। নেমে পড়ে সীমাচলম। সোজা রাস্তা দিয়ে একেবারে প্যাগোডোর চাতালে গিয়ে থামে। প্রশস্ত সিঁড়ির ধাপ। দু-পাশে মেয়েরা বসেছে ফুল আর মোমবাতি নিয়ে। কোন আড়ম্বর নেই। ভিখারীর ঝামেলা নেই, পুরুত-পাণ্ডার ভিড় নেই। সিঁড়ি দিয়ে সোজা উঠে পড়ে সীমাচলম।

বিরাট বুদ্ধমূর্তির সামনে কালো পোশাক-পরা কে একটি মেয়ে বসে আছে পা মুড়ে। সামনে একরাশ ফুলের তোড়া। চূড়া করে বাঁধা ঘন কালো চুলের রাশ। সীমাচলমের মনে হয়েছিলো বার বার যে ঠিক এমনি কোন জায়গাতেই দেখা পাবে হামিদার।

কোন সাড়া নেই। তন্ময় হয়ে রয়েছে মেয়েটি। বাইরে অপেক্ষা করে সীমাচলম। ওর আত্মনিবেদন শেষ হোক, বুকের বোঝা নামিয়ে রাখুক তথাগতের পায়ে, তারপর মুখোমুখি দাঁড়াবে দুজনে। বোঝাপড়া করবে সব কিছুর। হামিদাকে ছাড়া ওর যে কিছুতেই চলবে না, সেকথা বোঝাবে সীমাচলম। ফিরে ওকে যেতেই হবে। একসঙ্গে ডিঙি ভাসিয়েছে যখন-তখন ভয় করবে নাকি তুফানকে? নাই বা দেখা গেলো তটের রেখা, আকাশে বিদ্যুতের ঝিলিক দেখা দিক, মাঝপথে থামলে চলবে কেন?

মেয়েটি একটু নড়তেই এগিয়ে যায় সীমাচলম। ফুলের তোড়াটি মূর্তির সামনে রেখে আর একবার প্রণাম করে মেয়েটি, তারপর ঘুরে দাঁড়ায়।

দাঁড়িয়ে পড়ে সীমাচলম। না, হামিদাবাঈ তো নয়। সুগৌর রং, কিন্তু চ্যাপ্টা ধরণের চোখ-মুখ। এ মেয়েটিকেও জেরবাদী বলে মনে হয়।

মেয়েটি নেমে যাবার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সীমাচলম। মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করে ওঠে। সামনের বুদ্ধমূর্তি অন্ধকারে মিশে একাকার হয়ে যায়। ঝাপসা ঠেকে চারপাশ। মাতালের মত টলতে টলতে বুদ্ধমূর্তির সামনে হাঁটু মুড়ে বসে সীমাচলম। অনেকক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকে। তারপর চোখ খুলে দেখে রোদ কমে এসেছে। বোধ হয় মেঘে ঢাকা পড়েছে সূর্য। অন্ধকার হয়ে এসেছে চারদিক। ভালো করে দেখা যায় না কিছু। প্রশান্ত মূর্তির মুখে কোথায় বরাভয়ের আভাস? শুধু অন্ধকারে ঝকঝক করে জ্বলে তথাগতের ললাটের উজ্জ্বল টিকা। অনেক বছর আগে খুব দামী পাথর হয়ত বসানো ছিলো এখানে। বর্মার ভাগ্য-পরিবর্তনের সঙ্গে মহার্ঘ পাথরের বদলে কাঁচের টুকরো লাগানো হয়েছে। কিন্তু সীমাচলমের মনে হয়, এত দ্যুতি বোধ হয় কোন কাঁচেরই নেই। দপদপ করে জ্বলছে ললাটের টিকা। নটরাজনের তৃতীয় নয়নের মত দীপ্তি বিচ্ছুরিত হয়। দীপ্তি নয় দাহ। ওর মনে হয় এই দাহের আভাই বুঝি প্রতিফলিত হয়েছিলো অা ঠুন আর আকোর চোখে। দিকে দিকে যে আগুন জ্বলে উঠেছে তারই করাল ইঙ্গিত।

মাথা হেঁট করে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে সীমাচলম। নিশ্চেতনের মতন অনেকক্ষণ শুয়ে থাকে। যখন মাথা তোলে তখন শান্ত হয়ে এসেছে মন।

বেড়াতে বেড়াতে পশ্চিম দিকের চাতালে গিয়ে দাঁড়ায় সীমাচলম। অশ্বত্থগাছের তলায় বেদী করা হয়েছে। কাগজের গেট সামনে। সবুজ নিশান টাঙানো। মধ্যে ময়ূরের প্রতিকৃতি। এদেশের জাতীয় পতাকা। বোধ হয় কোন মিটিং হবে এখানে।

এতক্ষণ পরে আহারের কথা মনে হয় সীমাচলমের। সকাল থেকে কিছু পড়েনি পেটে। মাথাটাও ঘুরছে একটু। কিন্তু বাড়ি ফিরতে ওর মোটেই ইচ্ছা নেই। সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তার পাশে একটা দোকানে ঢোকে সীমাচলম। দোকানের এক কোণে বসে দুটি ছেলে। হাতে জলন্ত চুরুট, সামনে প্রসারিত সেদিনের 'ডিডক' কাগজ। পোশাকে-আশাকে কলেজের ছেলে বলেই মনে হয়। ওদের টেবিলের কাছে বসে সীমাচলম কান পেতে কথাবার্তা শোনে ওদের। এরাই তো এদেশের শিক্ষিত ছেলে, জাতির ভবিষ্যৎও বলা যেতে পারে। এদের কি মনোভাব? লড়াইকে কি চোখে দেখছে এরা?

চশমা চোখে ছেলেটিকে একটু উত্তেজিত বলে মনে হয়, 'ওসব একেবারে বাজে কথা। জাপানীদের কাজ আদায়ের ফন্দী। সমস্ত প্রাচ্য দেশকে যদি সম্মিলিত করাই ওদের উদ্দেশ্য হয়, তবে চীনদেশে এরকম বীভৎস অভিযান চালানোর কি অর্থ হতে পারে?'

টেবিলের ওপাশের ছেলেটি আরো গম্ভীর প্রকৃতির, 'চীন হয়ত হাত মেলাতে চায় না ওদের সঙ্গে, তাও তো হতে পারে?'

'চীনের লাভ এই লোকক্ষয়ে?'

'লাভ-লোকসান খালি চোখে চট করে হিসাব করা যায় না ভাই। পুতুল নাচে, আমরা ভাবি পুতুলের এই নাচে লাভ কি? অদৃশ্য সুতোর কথা ভুলে যাই, যার সাহায্যে পুতুলনাচওয়ালার কসরৎ চলে।'

'তার মানে?'

এ কথার উত্তর দেয় না অপর ছেলেটি। ঠোঁট মুচকে হাসে। কাগজটা হাতে করে নিয়ে বলে, 'কলেজের হলঘর ছেড়ে হঠাৎ প্যাগোডার চাতালে মিটিংয়ের আয়োজন যে?'

'উপায় কি? শহর থেকে কলেজ ছ'-সাত মাইলের ধাক্কা, লোকের

যাওয়াই তো মুশকিল। তাছাড়া এ তো শুধু ছাত্রদের সভা নয়, সকলের মতামত চাই আমরা।'

আরেকটা করে চুরুট ধরিয়ে উঠে পড়ে দুজনে। পিছনে পিছনে সীমাচলমও উঠে যায়।

এখনও আরম্ভ হয়নি মিটিং; তবে লোক ঘোরাফেরা করে এখানে-ওখানে। বেশীর ভাগই কলেজের ছেলে আর মেয়ে। দু-একটা ছুটকো লোকও জুটেছে সীমাচলমের মতন। এক কোণে একটা চ্যাটাইয়ের ওপর বসে পড়ে সীমাচলম। ছেলে দুটি এগিয়ে যায় ভিড়ের মধ্যে।

একটু পরেই শুরু হয় মিটিং। মোটা গোছের প্রৌঢ় একটি ভদ্রলোক বেদীর ওপর গিয়ে বসেন। ভারিক্কি ধরনের গম্ভীর চেহারা। কলেজের অধ্যাপক হবেন, আন্দাজ করে সীমাচলম। একটি ছোকরা হাত-মুখ নেড়ে বিশ্ব-পরিস্থিতি বুঝিয়ে দেয়। তারপরই আসল মিটিং আরম্ভ হয়। একটি ছেলে বোঝাতে চেষ্টা করে, বর্মীদের জাপানীদের সঙ্গে হাত মেলাবার বিষময় ফল। বর্বর জাতির আনুগত্য স্বীকার বর্মীদের পক্ষে আত্মহত্যা করার সামিল হবে। আজ ইউরোপীয় যুদ্ধে ইংরাজদের অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা পিছন থেকে মানুষকে আক্রমণ করারই নামান্তর। মঞ্চের অভিজ্ঞ বক্তা বলেই মনে হয়। কখনও গলা উচ্চ গ্রামে তুলে, কখনো খাদে নামিয়ে শ্রোতাদের মধ্যে চমৎকার একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। তার বক্তৃতা থেমে যাওয়ার পরে অনেকক্ষণ মৃদু গুঞ্জন চলে। হঠাৎ জনতা মন্ত্রমুগ্ধের মত স্তব্ধ হয়ে যায়। কোন কোলাহল নেই। ভিড়ের মধ্যে পথ করে একটি যুবা এগিয়ে আসে। মুণ্ডিত মস্তক, অঙ্গে গৈরিক কাষায়, উজ্জ্বল গৌর বর্ণ। প্যাগোডার দেয়ালে আঁকা তরুণ সিদ্ধার্থই যেন রূপ নেয়। সীমাচলমের সামনে বসা বৃদ্ধটি নিচু হয়ে প্রণাম করে লোকটিকে, তারপর ফিসফিস করে পাশের লোকটিকে বলে,

'থাকিন মিয়া। খুব বড়লোকের ছেলে, সব ছেড়ে ফুঙ্গী (শ্রমণ) হয়েছে।'

বেদীর ওপর গিয়ে দাঁড়ায় থাকিন মিয়া। অশ্বত্থের পাতার ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়ে মুখে-চোখে। বাতাসে গৈরিক বাস অল্প অল্প ওড়ে। প্রথমে খুব আস্তে, তারপর ধীরে ধীরে উচ্চতর হয় গলার আওয়াজ।

'গৃহী ভাই-বোনেরা,

আপনারা আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। এতক্ষণ আপনাদের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শুনে এই কথাই বার বার আমার মনে হচ্ছিল যে, সত্যিই কি আপনাদের কথাই বলছেন আপনারা, কিম্বা আর কারো সাজানো শেখানো কথা উচ্চারিত হচ্ছে আপনাদের মুখ দিয়ে। এটুকু স্বীকার করবো আমি যে, একটা দেশকে শোষণ করার জন্য যেটুকু উন্নত তাকে করা প্রয়োজন আমাদের শাসকরা তা করেছে। কিন্তু তাদের আসার আগের ইতিহাসও কি তমসাচ্ছন্ন? একদিকে ভারতবর্ষ, একদিকে চীন, প্রাচ্যের মহা-সংস্কৃতিশালী দুটি প্রাচীন দেশের মধ্যে আমাদের স্বুবর্ণভূমি। আমাদের শহর, অমরাপুর, হংসবতী, প্রোম, চাউঠো এ সমস্ত কি কেবল ইংরাজ বণিকের সহানুভূতিপুষ্ট? আমাদের নৃপতি চানশিটা, মিন্ ডন মিন্, মহাবাণ্ডুলা কি রাজ্য বিস্তারে সক্ষম হননি কোনদিন? জাপানী আমাদের বন্ধু কি শত্রু সে কথা আজ বড় নয়। রাজনীতির ক্ষেত্রে আত্মীয়তার স্থান নেই। আমরা যদি বুঝি জাপানের সাহায্যে আমরা আমাদের বহু বছরের পরাধীনতা দূর করতে পারবো, তবে কেন আমরা হাত মেলাবো না তাদের সঙ্গে? আবার যদি বুঝি যে, জাপান আমাদের স্বাধীনতার বিরোধী, তবে যে শক্তিতে আমরা শ্বেতশক্তিকে দূর করতে পারবো, সেই শক্তিতেই আমরা ঠেকাতে পারবো জাপানীকে। আমি আপনাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। চিন্তা করুন আপনারা। আমরা পরের পদানত হয়ে ভিক্ষুকের'

জীবনযাপন করবো কিম্বা যুগান্তের শিকল ভেঙে ফেলে বিশ্বের স্বাধীন দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবো ?'

জনতার মধ্যে মৃদু কোলাহল। স্পষ্ট কিছুই শোনা যায় না, কিন্তু মনে হয় থাকিন মিয়ার কথাগুলো একটা আলোড়নের সৃষ্টি করে। কোণের দিকে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে ওঠে, 'এ সময় কি আমাদের কর্তব্য ? কি করবো আমরা ?'

মুখ ফেরায় থাকিন মিয়া। আস্তে আস্তে বলে, 'আমাদের কর্তব্য মিলিত হওয়া। সব রকম জাতিভেদ, দলগত অনৈক্য ত্যাগ করে এই মহাসংগ্রামে যোগদান করা। গ্রামে গ্রামে গিয়ে আপনারা জনমত গঠন করুন। বোঝান লোকদের যে, এভাবে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পালিয়ে বেড়ানোতে কোনই কাজ হবে না। আমাদের মাঠের ধান আমাদেরই গোলায় তুলতে হবে। সকলে একজোট হ'য়ে বলতে হবে, ইংরাজ, তোমাকে আমরা চাই না। অনেক শোষণ করেছ, আর নয়। ব্রিটিশ দ্বীপের স্বাধীনতা রক্ষা যদি তোমার কাম্য হয়, তবে এদেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করাও আমাদের একমাত্র সাধনা।'

বেদী থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে থাকিন মিয়া। ভিড়ের মধ্যে পথ করে এগিয়ে আসে। সীমাচলম একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। পাশ কাটিয়ে যাবার সময় প্রণাম করে মুখোমুখি দাঁড়ায়, 'একটা কথা।'

'কি ?' সীমাচলমের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে থাকিন মিয়া।

'কোথায় কখন দেখা হতে পারে আপনার সঙ্গে ?'

চোখ কুঁচকে আসে থাকিন মিয়ার। সন্দেহের ছায়া ভাসে মুখের রেখায়, 'বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে ?'

'একটু আলোচনা করতাম আপনার সঙ্গে।'

থাকিন মিয়া পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যায়। চুপচাপ

এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকে সীমাচলম। ওকে বোধ হয় সন্দেহই করলো।

যে মেয়েটির কাছে পায়ের জুতো জোড়া খুলে রেখেছিলো, সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই মেয়েটি জুতো এগিয়ে দেয়। জুতো পরে চলতে শুরু করতে মিষ্টি হাসে মেয়েটি, ডাকে, 'শুনুন ?'

'আমাকে বলছো ?'

'হ্যাঁ, সামনের শনিবার আসতে পারবেন এখানে ?'

বিস্মিত হয় সীমাচলম, 'কেন বলো তো ?'

'আপনি থাকিন মিয়ার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন, ওই দিনে এই সময়ে তিনি আপনার জন্য থাকবেন এখানে।'

আশ্চর্য হয়ে যায় সীমাচলম, 'তার মানে ?'

গম্ভীর হয়ে যায় মেয়েটি, বলে, 'ব্যস, এর বেশী একটি কথাও আমি বলতে পারবো না। যদি দেখা করতে চান, আসবেন শনিবারে।'

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে হতাশ হয়ে নেমে আসে সীমাচলম। সন্ধ্যা হয়ে আসে। লেকের দিকে আস্তে আস্তে পা চালায়।

বাড়িতে ভালো লাগে না সীমাচলমের। সব কিছুতে হামিদার স্মৃতি ভেসে আসে। কেন এমন করলো হামিদা! ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখে। ছোট টেবিলের ওপরে স্তূপাকার পর্দার কাপড়। জানলায় পর্দা টাঙাবে বলে নিজে পছন্দ করে কিনে এনেছিলো হামিদা। কোণের বিলাতী পাম গাছ দুটিও তারই পছন্দ করা। ওর পথ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে হামিদা। ও আদর্শচ্যুত হোক এটা চায়নি, তাই নিঃশব্দে সরিয়ে নিয়েছে নিজেকে। জানলা দিয়ে সীমাচলম চেয়ে দেখে বাইরে। অগণিত লোকের স্রোত চলেছে। নিরবচ্ছিন্ন একটানা গতি, বিরতি নেই একটুও। এইসব ভীড়

জনতাকে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে, মোড় ফেরাতে হবে এদের। সোজা কাজ নয় মোটেই। যুগে যুগে, অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত জনতার এই তো ইতিহাস। প্রত্যেক অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে পঙ্গু জনতার আত্মগোপন আর পলায়নের পঙ্কিল কাহিনী। ভাববার শক্তি থাকে না এদের, বোঝবার শক্তি থাকে না, ফেরুপালের মতন কেবল একদিক থেকে অন্যদিকে ছড়িয়ে ছিটকে পড়তে চায়।

কিন্তু একবার যদি মোড় ফিরে দাঁড়ায় এরা, একবার যদি শক্ত করে আঁকড়ে ধরে পায়ের তলার মাটি। তবে! আর ভাবতে পারে না সীমাচলম। আকো আর আ ঠুনের স্বপ্ন রূপ নেবে এদের মধ্যে। আবার ফিরে আসবে এদেশের স্বর্ণগর্ভ দিন।

দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ হয়। চটিটা পায়ে গলিয়ে উঠে আসে সীমাচলম। বাড়িওয়ালা গুজরা'টি ভদ্রলোকটি দাঁড়িয়ে দরজার ওপাশে। সামনে ঘোড়ার গাড়ির ওপরে মালপত্তর চাপানো।

'নমস্কার মিঃ সীমাচলম। আপনি আপনার আত্মীয়াকে সরিয়ে ফেলে ভালোই করেছেন।'

এই কথাই অবশ্য আশেপাশের লোককে বলেছে সীমাচলম। রাতারাতি একটা লোকের উধাও হয়ে যাওয়া সম্বন্ধে আর কি কৈফিয়ৎই বা দেওয়া যেতে পারে?

'কালকে রেডিও শুনেছেন?'

'না, কাল শুনিনি। বাইরে একটু কাজে ব্যস্ত ছিলাম। কি বলেছে কাল?'

কব্জিতে বাঁধা ঘড়িতে একবার চোখ বুলিয়ে নেয় গুজরাটি ভদ্রলোক, 'বলেছে শহর থেকে সবাই যেন সরে যায়। কিছুদিনের মধ্যে প্রচণ্ড

বোমাবর্ষণ শুরু হবে। ইংরাজদের গড়া শহর ছাতু করে দেবে। আমার মনে হয় এই সময়ে শহরে না থাকাই ভালো।'

'আপনি যাচ্ছেন কোথায়?'

'আমার শালী রয়েছে ম্যাণ্ডেলেতে। সেখানেই গিয়ে উঠবো।'

'কিন্তু সেও তো শহর।'

একটু দমে যায় গুজরাটি ভদ্রলোক। জিভ দিয়ে নিচের ঠোঁটটা চাটে আস্তে আস্তে, 'মানে, চট্ করে এখন অত দূরে যাবে না বোধ হয়। যদি সে রকম দেখি, তবে আরো ভেতরে না হয় সরে যাবো, শোয়ে বো, কাথা কিম্বা অন্য কোথাও। কিন্তু আপনি কি করছেন? এখানে নিশ্চয় থাকবেন না?'

'কোথায় আর যাবো? আমার বোধ হয় যাওয়া হবে না এখন।'

সীমাচলমের কথায় কিন্তু মনে মনে পুলকিত হয় গুজরাটি ভদ্রলোক। না যদি কোথাও যায়, তবে তো ভালোই হয়। ওর ঘরবাড়ি দেখবার জন্য তবু তো থাকবে একটা লোক। তদ্বির-তদারক করবে, চোরছ্যাঁচড়ের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে ফেলে-যাওয়া দু'একটা জিনিস।

'সত্যিই আপনি যাবেন না কোথাও?'

'অবস্থা খুব খারাপ না হলে নড়বো না।'

'তাহ'লে,' একটু অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করে ভদ্রলোক। চৌকাঠ পার হ'য়ে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ায়, 'আপনি যদি থাকেন মিঃ সীমাচলম, তবে একটা অনুরোধ আপনাকে রাখতে হবে।'

বিস্মিত হয় সীমাচলম, 'কি ব্যাপার বলুন তো?'

'না, মানে, আমার বাড়ি তো খালিই পড়ে থাকবে, আপনি যদি থাকেন, তবে নিচেয় না থেকে ওপরেই থাকতে পারেন। আমার চেয়ার টেবিল সবই তো রইল, আপনার কোনই অসুবিধা হবে না। আপনি দয়া

করে থাকলে, আমিও বাড়িটার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। অবশ্য নিতান্ত স্বার্থপরের মতন অনুরোধ করছি, মনে করবেন না কিছু।'

'না, না, মনে করবার কি আছে? আমার দ্বারা আপনার যদি কোন উপকার হয়, আমি নিশ্চয় করবো।'

'ব্যস, ব্যস, মহৎ লোক আপনি।' উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে গুজরাটি ভদ্রলোক। কোমর থেকে চাবির থোলো খুলে একটি চাবি বের করে দেয় সীমাচলমের হাতে। 'এই নিন চাবি। ঘর-দোর সব রেখে গেলুম আপনার হেপাজতে। দয়া করে দেখবেন একটু। এই আমার ঠিকানা। দরকার হলে চিঠিপত্রও লেখা চলতে পারে।' পকেট থেকে কার্ড বের করে দেয়। ট্রেনের সময় হয়ে এসেছে। হাত দুটো জোড় করে নমস্কার করে গুজরাটি ভদ্রলোক নেমে যায় সিঁড়ি বেয়ে।

চুপচাপ বসে থাকে সীমাচলম। টুকরো টুকরো অজস্র চিন্তা ঘোরা-ফেরা করে মাথার মধ্যে। যত নীড়ের মায়া কাটিয়ে উঠতে চায়, ততই যেন দৃঢ় বাহুবন্ধনে আকর্ষণ করে সংসার। অক্টোপাসের মতন সহস্র বাহুবেষ্টনে আঁকড়ে ধরে। অন্য লোকের সাজানো ঘরে গৃহস্থালী পাতবে বুঝি এবার।

ওপরে উঠে আসে সীমাচলম। বাইরের ঘরটা প্রায় খালি। কোণে একটা টেবিল, এপাশে বেতের ছোট চেয়ার। জানলায় জানলায় নেটের পর্দা। কোনদিন কি ভেবেছিলো গুজরাটি ভদ্রলোকটি যে এমন সাজানো সংসার ফেলে পথে বেরোতে হবে একদিন? সীমাচলমও কি ভেবেছিলো কোনদিন যে সমুদ্রপারের মাটিতে ছড়ানো থাকবে তার জীবন?

বিকালের আলো থাকতে থাকতে প্যাগোডার চাতালে গিয়ে পৌঁছায় সীমাচলম। রাস্তাঘাট খালি খালি। যে ক'টা লোক এখানে-ওখানে, তাদের মুখ বিষণ্ণ। মাঝে মাঝে তারা মুখ তুলে চায় আকাশের দিকে। বিপদ যে ওপর থেকেই আসবে, সে বিষয়ে যেন ওরা স্থিরনিশ্চয়।

সিঁড়ির ধাপে বসা সারি সারি মেয়েদের দিকে আলগোছা নজর চালায় সীমাচলম। সেদিনের সে মেয়েটিকে ঠিক ঠাওর করে উঠতে পারে না। আসেনি বোধ হয় মেয়েটি, কিম্বা হয়ত গা ঢাকা দিয়েছে এদিকে-ওদিকে। ধরা-ছোঁয়া দিতে চায় না।

একেবারে ওপরে উঠে সেদিনের মিটিংয়ের জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ ভিড় নেই। এখানে-ওখানে রয়েছে কয়েকটি বর্মী মেয়ে-পুরুষ। অশ্বত্থগাছের তলায় গিয়ে বসে সীমাচলম। এখান থেকে সারা শহরটা দেখা যায়। চিক্ চিক্ করে ইরাবতীর জল। ছোট প্যাগোডার ঝালরটাও রোদে জলে ওঠে।

এলোমেলো চিন্তার রাশ। সত্যিই কি গুঁড়িয়ে ধূলো করে দেবে এই শহর? বিশাল অট্টালিকা আর বৌদ্ধ মন্দির বোমার ঘায়ে ধূলিসাৎ করে দেবে? জাপানীরা কি তাই চায়? আকোরও কি তাই ইচ্ছা? অনেকদিন আগে নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে একদিন বলেছিলেন আকো, 'আমার দেশের লোক আমার নিজের পাঁজরের চেয়েও বেশী। একজন দেশের লোকের ওপর অত্যাচার হ'লে আমার পাঁজর টন টন করে ওঠে।' সেই আকো পারবেন এই নির্মম ধ্বংসযজ্ঞের পুরোহিত হতে?

বেলা পড়ে আসে।

অনেকদূরে ইরাবতীর শাখানদী লেইংএর বুকে ঢলে পড়ে সূর্য। তেরচাভাবে রোদটা প্যাগোডার পাঁচিলের ওপর এসে পড়ে। ঠাণ্ডা শিরশিরে হাওয়া। বেশ লাগে। সংসারের কোলাহল থেকে অনেক উঁচুতে, নিজেকে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়।

হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে সীমাচলম দেখে পাঁচিলের আর একধারে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে থাকিন মিয়া। হাতদুটি আড়াআড়িভাবে বুকের ওপর রাখা। নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সূর্যাস্তের দিকে। লাল

আভা মুখে-চোখে এসে পড়ে' অদ্ভুত শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছে সারা মুখ।

সীমাচলম এগিয়ে যেতেই আস্তে তার দিকে চোখ ফেরায় থাকিন মিয়া, 'কতক্ষণ এসেছেন ?'

'অনেকক্ষণ হলো।'

'আমার একটু দেরী হয়ে গেলো। রাস্তায় আটকে পড়েছিলুম। আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন কেন ?'

'একটু আলোচনা করার আছে।'

উত্তর দেয় না থাকিন মিয়া। অশ্বত্থ গাছের তলায় এসে বসে' ইঙ্গিতে সীমাচলমকেও বসতে বলে পাশে।

'সেদিন আমার ব্যবহারে বোধ হয় আপনি ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু অতি সাবধান না হয়ে আমাদের উপায় নেই। পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। একটু সাবধান না হলেই ফাঁদে পড়ে যাবো।'

'হাঁ, তা বুঝতে পেরেছি। আপনাদের চলাফেরার ধরন আমার অজানা নয়।'

'কি রকম ?' ওর জলন্ত দৃষ্টির সামনে সঙ্কুচিত হয়ে আসে সীমাচলম।

'আমি নিজেও একসময়ে এই দলে ছিলাম কি-না ?'

'কোন্ দলে ?' সন্দেহ ঘোচে না থাকিন মিয়ার।

'কোন একটা বিপ্লবী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত ছিলাম।

'আপনি তো পৌনাবস্তিতে কয়েক মাস হ'ল এসে উঠেছেন। সঙ্গে একটি স্ত্রীলোক ছিল, বর্তমানে তাঁকেও কোথায় পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

এইবার রীতিমত চমকে ওঠে সীমাচলম। আরও কিছু খবর জোগাড় করেছে নাকি থাকিন মিয়া ? ওর বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাসের কোন অধ্যায় ? জেনেছে নাকি ওর সম্পর্কের নিবিড়ত্ব সেই স্ত্রীলোকের সঙ্গে ?

মৃদু গলায় বলে সীমাচলম, 'আপনি কতটুকু জানেন আমার সম্বন্ধে জানি না, কিন্তু যতটুকুই জেনে থাকুন, দয়া করে তার বেশী আর জানতে চাইবেন না। যদি আমাকে আপনার অবিশ্বাস হয়ে থাকে তবে আপনি ফিরে যান, আমিও চলে যাচ্ছি এখান থেকে।'

'আপনাকে বিশ্বাসের উপযুক্ত মনে না করলে, আমার দেখা আজ পেতেন না এখানে। সূর্যাস্ত দেখেই ফিরে যেতে হতো আপনাকে। যাক্ সময় আমার অত্যন্ত কম। কি জিজ্ঞাসা করতে চান আপনি বলুন ?'

'জাপানীকে মিত্র বলে কেন মনে করছেন আপনারা ?' প্রস্তুত হয়েই যেন এসেছে সীমাচলম।

'আমি সেদিনও সভায় বলেছি, রাজনীতিক্ষেত্রে আত্মপর, শত্রুমিত্র কেউ নেই। যে শিকল ভাঙতে সাহায্য করে সেই মিত্র, আর যে বিরোধিতা করে সেই শত্রু।'

'শ্বেতশক্তির বদলে পীতশক্তি অধিষ্ঠিত হবে না তার নিশ্চয়তা আছে কিছু ?'

'না, কিছুই নেই। যদি তাই হয় দেশের জাগ্রত প্রাণশক্তি তাদের বাধা দেবে। একজনের পরিবর্তে আরেকজনের অধীনতা স্বীকার করবার মত মনোবৃত্তি এদের হবে না। যাই কিছু হোক, সব চেয়ে বড় কথা প্রস্তুত থাকতে হবে দেশের সবাইকে।'

'কিন্তু এরা কি প্রস্তুত আছে ? আমার জানলার সামনে দিয়ে দলে দলে যেভাবে রোজ লোক পালাতে শুরু করেছে, তাতে মনে হয় না যে আত্মরক্ষা ছাড়া আর কোন চিন্তা তাদের আছে।'

'তাই তো হয়। আসল বিপদের চেয়েও বিপদের ভয়টাকেই মানুষ বড়ো করে দেখে। কিন্তু আগুনের মুখোমুখি দাঁড়ালে নিজের থেকে সাহস

আসে মানুষের। তখন মনে হয় মরাটা যত কঠিন মনে হয়েছিলো, তা হয়ত নয়।'

'শ্বেতশক্তিকে হঠানো কি খুব সহজ ব্যাপার হবে বলে মনে করেন?'

'দোকানে রঙচঙ করা সাজানো পুতুলগুলোকে দেখলে একবারও কি মনে হয় যে এদের ভেতরে মাটি? জানেন গতকাল থাইল্যাণ্ড দিয়ে জাপ সৈন্যরা ভিক্টোরিয়া পয়েণ্ট প্রবেশ করেছে? আজকে এতক্ষণে হয়ত প্রত্যেকটি বৃটিশ সৈন্য ভিক্টোরিয়া পয়েণ্ট থেকে সরে এসেছে।'

এত কাছে এসে গেছে জাপানীরা।

'তবে তো সময় আপনাদের খুব কম?'

'কম বৈ কি। তবে একেবারে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই আমরা। শহরে নানা মতের লোকের বাস। চট করে কিছু করে ওঠা মুশকিল। কিন্তু গ্রামে আমাদের যথেষ্ট কাজ হয়েছে। একটি লোকও যে কর্তব্য করতে ভুলবে তা মনে হয় না আমাদের। তবে পালাবার যারা তারা ঠিক পালাবে, তাদের কেউ রুখতে পারবে না। তারা বহুপুরুষ ধরেই পালিয়ে বাঁচাচ্ছে নিজেদের প্রাণ।'

'কিন্তু বোমায় কত লোকের প্রাণ যেতে পারে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে কত পরিবার।'

'পারে বৈ কি। বছর পাঁচ ছয় আগে মিনজানে একবার কলেরায় বহুলোক মারা গিয়েছিলো, গত বছর প্রোমে প্লেগে বড় কম লোক মারা যায়নি। মরা এদেশের লোকের পক্ষে মোটেই নতুন কথা নয়। অনবরত মরছে এরা। পেগুতে ভূমিকম্পেও মারা গিয়েছিলো অনেক লোক। সেই রকম একটা মহামারী হয়েছে বলেই মনে করবো। ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকেই নতুন জীবন উঠবে।'

এরপরে আর কথা বলা চলে না। উন্মত্ত বৈরাগী তার চঞ্চল পদবিক্ষেপে

অশিব অসুন্দর সবকিছু চূর্ণ করে দিক। দিকে দিকে তার জটা পড়ুক খুলে। হাতের ত্রিশূল জলে উঠুক প্রখর সূর্যকিরণে। ডমরুর তালে তালে ভীষণ নর্তন শুরু হোক। আরম্ভ হোক নটরাজের ধ্বংসলীলা। এ হলো ইতিহাসের আদিম কথা।

'আপনি কি করেন এখানে ?'

থাকিন মিয়ার প্রশ্নে বিব্রত হয়ে পড়ে সীমাচলম। কি উত্তর দেবে ঠিক করতে পারে না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বলে, 'উপস্থিত কিছু করি না। ব্যবসা-বাণিজ্যের চেষ্টায় এসেছি।'

হেসে ওঠে থাকিন মিয়া, 'বলেন কি ? সবাই যখন ব্যবসা গুটোবার তালে আছে, সেই সময় আপনি ব্যবসা ফাঁদতে এসেছেন ?'

'সবাই যখন গুটোয়, আমরা তখন শুরু করি, এই তো আমাদের কাজ।' কথাগুলো হঠাৎ সীমাচলমের মুখ থেকে বেরিয়ে যায়।

একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তার দিকে চেয়ে থাকে থাকিন মিয়া। আবছা অন্ধকার নেমেছে। বাতাসও একটু জোর। প্যাগোডার মৃদু ঘণ্টার শব্দ মিলিয়ে আসে। অনেক দূরে কোথাও বৌদ্ধ শ্রমণ পালিভাষায় বোধিসত্ত্বের বন্দনাগান গেয়ে চলে।

'সামনের সোমবার আসতে পারবেন এখানে ?' উঠতে উঠতে সীমাচলমকে প্রশ্ন করে থাকিন মিয়া।

'যদি বিরাট বাধা কিছু না আসে তো নিশ্চয় আসবো।'

'আচ্ছা, আজ আপনি যান তাহলে। আমার একটু কাজ আছে।' পশ্চিমদিকের সিঁড়ির দিকে পা চালায় থাকিন মিয়া।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ থেমে যায় সীমাচলম। সেদিনের সেই মেয়েটি বসে আছে ফুল আর মোমবাতি নিয়ে। চুড়ো করে বাঁধা ঘন

চুলের রাশ। নিবিড় কালো দুটি চোখ মমতায় যেন টলটল করে। মুচকি হাসে ওকে দেখে।

সাহস পায় সীমাচলম। এগিয়ে গিয়ে বসে ওর পাশে

'কি খবর?' হাসে মেয়েটি।

'জুতোজোড়া কোথায় খুলেছি মনে পড়ছে না। তোমাদের সবাইকেই আবার একরকম দেখতে কিনা, ভারি গোলমাল হয়ে যায়।'

'তাই নাকি?' হাসি থামায় না মেয়েটি, 'আচ্ছা বসো একটু, খোঁজ করে দেখি।'

খোঁজ আর করতে হয় না বেশীদূর। পাশের মেয়েটিকে বলে, 'এই, মা তানের কাছে বাবুজীর জুতো আছে, পাঠিয়ে দিতে বলতো।'

কিন্তু জুতোর সম্বন্ধে খুব আগ্রহ দেখা যায় না সীমাচলমের। গলাটা বাড়িয়ে আস্তে আস্তে বলে, 'তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার। থাকিন মিয়ার সঙ্গে জুটিয়ে দিতে হবে আমাকে।'

কথাগুলো মেয়েটির কানে যায় বলে মনে হয় না। ভুরু দুটো তুলে কৃত্রিম রাগে ফেটে পড়ে মেয়েটি, 'ভালো আপদ। পথ চিনে যদি যেতে পারবে না, তবে রাত-বিরেতে আসো কেন বেজায়গায়? দোকান ফেলে কি করে তোমার সঙ্গে যাই বলো তো?'

পাশের মেয়েটি ঝুঁকে পড়ে বলে, 'আহা, যা যা, বাবুজী পথ হারিয়ে ফেলেছে, একটু এগিয়ে দিয়ে আয়। তোর দোকান না হয় আমি আগলাবো। দেখিস বিপথে যেন ঠেলে ফেলিসনি বাবুজীকে।' আশেপাশের অনেকগুলো মেয়ে হেসে ওঠে খিল খিল করে।

মেয়েটি পয়সার বাক্সে চাবি দিয়ে উঠে দাঁড়ায়, তারপর বলে, 'চলো বাবুজী, ছেলেমানুষ, শেষকালে ছেলেধরায় নিয়ে যাবে তোমায়, একটু সঙ্গেই যাই না হয়!'

সোজাসুজি ট্রামলাইন না ধরে বাঁদিকে ঘোরে তারা। অপেক্ষাকৃত নির্জন পথ। রাস্তার বাতিগুলোরও জোর নেই তেমন।

'আমাকে থাকিন মিয়ার সঙ্গে জুটিয়ে দাও তুমি। দেবে ?'

'ওমা, আমি কি করে জুটিয়ে দেবো ? তোমার সঙ্গে কথাবার্তা হলো এতক্ষণ। যা বলবার তুমিই তো বলতে পারতে '

'আমি বলেছি। তোমাকেও বলতে হবে আমার হয়ে। না যদি পারো, তবে থাকিন মিয়ার আস্তানার খোঁজ দাও আমাকে।'

'ওঁর আস্তানার খোঁজ আমি জানবো কি করে ? উনি প্যাগোডায় আসেন, ফুল বাতি কেনেন, তাইতেই যা একটু মুখের আলাপ।' কেবলই পিছলে পিছলে বেড়ায় মেয়েটি, 'তাছাড়া ওঁদের আবার আস্তানা কি ? যে কোন ফুঙ্গী-চাউঙএ (শ্রমণ-নিবাস) রাত কাটালেই হলো।'

কথা আর বাড়ায় না সীমাচলম। ওকে দিয়ে কিছু হবার আশা নেই। যা কিছু করতে হয়, নিজেই করতে হবে। একেবারে অন্য কথায় চলে আসে সীমাচলম, 'তোমরা পালাবে না কোথাও ? শহরে বোমা পড়বে যে !'

'এই তো আমাদের দেশ। এই শহরেই আমার জন্ম-কর্ম সব কিছু। এখান ছেড়ে যাবো কোথায় ? তা'ছাড়া, বোমায় কি আর সব শহরটা গুঁড়িয়ে যাবে ?'

হাসে সীমাচলম, 'সে বোমার সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা নেই কোন। জানো, এক একটা বোমার ঘায়ে বড় বড় চার পাঁচতলা বাড়ি গুড়িয়ে ছাতু হয়ে যেতে পারে ?'

'ওমা তাই নাকি !' চোখ দুটো কপালে তোলে মেয়েটি, 'সে কি কথা, তা হলে তো ফুলের বাগান সব তচনচ হয়ে যাবে। ফুল তুলবো কি করে ? ফুল না পেলে পেট চালাবো বা কি করে ?'

দাঁড়িয়ে পড়ে সীমাচলম। রসিকতা করছে মেয়েটি ? ওর ফুলবাগানের

চিন্তাটাই বড় হয়ে দাঁড়ালো বুঝি! ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। একটা ঘোলাটে অস্পষ্টতা, মেয়েটিকে ঘিরে এক প্রাচীর। থাকিন মিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের একটা সূত্র আছে এ কথাও ঠিক। বাইরের রূপ মেয়েটির ছদ্মবেশ। কিন্তু সেই ছদ্মবেশ ছিঁড়ে ওর আসল রূপকে প্রকাশ করা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়।

'তোমাদের দেশের লোক কিন্তু পিঁপড়ের সারের মতন লাইন দিয়েছে।'

'শুধু আমাদের দেশের লোক কেন, তোমাদের দেশের লোকও পালাচ্ছে দিকবিদিকে; তাদের কথা বলছো না যে?' ধার আছে মেয়েটির কথায়।

'আমাদের দেশের লোকেদের কথা ছেড়ে দাও। তাদের আর কি মমতা আছে তোমাদের দেশের ওপর! যখন যেদিকে হাওয়া সেদিকেই দাঁড় বাইবে তারা।'

'এইজন্যই তো মেলে না তোমাদের সঙ্গে। যেখানেই তোমরা যাও, নিজেদের বড় আলাদা রাখো।'

বারবার এ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে সীমাচলমকে। নানাদিক থেকে এই অভিযোগ এসেছে। এদেশে চাকরিবাকরি চায় ভারতীয়েরা, সুখসুবিধা চায়, পরিষদের সদস্যপদের ওপরও লোভ আছে। কিন্তু ওই পর্যন্ত। দেশের দুঃখবেদনার খোঁজখবর রাখা প্রয়োজন মনে করে না। এ নালিশের উত্তর নেই। তাই আস্তে আস্তে বলে, 'তা বলে কি সবাই ওই রকম? এমন অনেকে আছে যারা এ দেশকে নিজের বলেই ভাবে। ছেলেবেলা থেকে এদেশেই মানুষ, এদেশের সঙ্গেই মিশিয়ে দিয়েছে নিজেদের, এমন অনেক লোক আমি নিজে চোখে দেখেছি।'

'আমার চোখে কিন্তু এমন ধরনের কেউ পড়েনি আজো। আচ্ছা আসি। বেঁচে থাকি তো দেখা হবে আবার।' হঠাৎ পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করে মেয়েটি। অন্ধকারে মিশে যায় অস্পষ্ট ছায়া। আর দেখা যায়

না। জোরে জোরে পা ফেলে চলতে শুরু করে সীমাচলম। মেয়েটি যে ঠিক মোমবাতি আর ফুলের বেসাতি নিয়ে বসে থাকে না প্যাগোডার চাতালে একথা বুঝতে দেরী হয় না। গভীর কোন কাজে ওতপ্রোতভাবে জড়িত মেয়েটি। তাহ'লে সত্যিই কি জেগেছে বর্মার ঘুমন্ত জনশক্তি? এই দেশের বুকের ভেতরে লাভার যে আগুন জ্বলছে ধিকিধিকি, তার ছোঁয়াচ কি পৌঁছেচে এদেশের লোকের বুকে?

রয়েল লেকের কাছে তীব্র আলোর সমাবেশ। বোট ক্লাব। সামরিক পোশাক পরা অনেকগুলি বিদেশী সৈন্য বসে আছে বাইরের লনে। এদের পোশাকে বা চেহারায় এমন কোন চিহ্ন নেই, যাতে বোঝা যায় শত্রু দরজায় এসে পড়েছে, এখনই হয়ত দরজা চূর্ণ করে ঢুকে পড়বে ভিতরে। সত্যিই বুঝি ভাঙন ধরেছে এদের মধ্যে। বিরাট ঋণ পরিশোধের সময় এসেছে। হিসেব-নিকেশ, বোঝাপড়া হবে এইবার। বহু বছরের গড়া ইমারত ভেঙে পড়েছে।

কোনাকুনি লেকের জলের পাশ দিয়ে চলতে আরম্ভ করে সীমাচলম। হঠাৎ ঝোপের পাশ থেকে ফিসফাস শব্দ কানে আসতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। জুতোর ফিতা বাঁধবার ছল করে একটু দেরী করে, তারপর ঘাসের ওপর বসে পড়ে রুমাল পেতে।

কতকগুলো পাতাবাহার আর ক্রোটন গাছের ঝোপ। দু'জনের গলা শোনা যায়। একটি পুরুষ কণ্ঠ আর একটি নারীর। একটু শুনেই উঠে পড়ে সীমাচলম। নতুন কিছু নয়, পুরাতন প্রেমনিবেদন আর আত্মসমর্পণের ভাষা। হাসি পায় সীমাচলমের। প্রেম অমর, মৃত্যু নেই প্রেমের, লয় নেই। বোমাবারুদের তিক্তকর পরিবেশেও মাথা তুলে দাঁড়ায় প্রেম। ফেলে আসা জীবনের কথা মনে পড়ে যায়। মাদ্রাজের শহরতলীতে শুভলক্ষ্মী আর তার অর্থহীন গুঞ্জন, যা এক সময়ে পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় সত্য বলে মনে হয়েছিলো।

বাড়ির কাছ বরাবর এসেই দাঁড়িয়ে পড়ে সীমাচলম। ওর বাড়ির রকে মোটঘাট জড়ো করা, তার ফাঁকে ফাঁকে অনেকগুলো লোকও শুয়ে আছে বলে মনে হয়। কিন্তু এরা কারা? বলা নেই কওয়া নেই, এভাবে ঘর চড়াও করেছে। কাছে যেতেই কিছুটা বুঝতে পারে সীমাচলম। পালাচ্ছে এরা। চোখেমুখে শঙ্কার ভাব; ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখের রং। ছোট ছেলেপুলে বুকে করে জন্তুর মতন পড়ে আছে গাদাগাদি করে।

টর্চের আলো মুখে পড়তেই ধড়মড় করে উঠে পড়ে কয়েকজন। বেশীর ভাগই কুলিকামিনের দল। অন্ধ্রদেশীয়। মালয়ের রবার বাগানের কুলি এরা। অবস্থা বিপর্যয়ে বৌ-ছেলেমেয়ের হাত ধরে বেরিয়ে পড়েছে সবকিছু ছেড়ে। কে জানে সারা পথ হয়ত হেঁটেই এসেছে এরা।

'এখানে শুয়ে কেন? ঘর খুলে দিচ্ছি, ভেতরে গিয়ে শোও।' মুখ চাওয়াচাওয়ি করে লোকগুলো। মেয়েগুলো কাপড় সামলে উঠে বসে একদৃষ্টে চেয়ে দেখে ওর দিকে। পাকাবাড়ির মালিকদের সম্বন্ধে ঠিক এরকম ধারণা নেই ওদের। তারা তো সরিয়ে দেয় বাড়ির ত্রিসীমানা থেকে। আদর করে আবার ঘরে ডাকে নাকি কেউ?

পাশ কাটিয়ে ঘুমন্ত ছেলেমেয়েদের সন্তর্পণে ডিঙিয়ে নিচের ঘরের তালা খুলে দেয় সীমাচলম। বাইরে ডিসেম্বরের শীতের আমেজ। খুব কনকনে ঠাণ্ডা এদেশে না পড়লেও, মাঝে মাঝে উত্তুরে বাতাসে শীতের জানানি দেয়। ছেলেমেয়েদের টেনে টেনে ঘরের ভিতরে নিয়ে আসে ওরা। প্রায় জন পনেরো হবে। লম্বালম্বিভাবে শুয়ে আছে। এত ক্লান্ত যে চোখ খুলে চেয়েও দেখে না কয়েকজন।

শুধু প্রৌঢ় গোছের একজন হাতদুটো জোড় করে বলে, 'আমাদের কি হবে বাবু?'

এই লোকটাই বোধ হয় দলের সর্দার। সারা দেহে একটা অবসাদের

ছাপ। কিন্তু নুয়ে পড়েনি লোকটা। এরই মুখের দিকে চেয়ে হয়ত এগিয়ে এসেছে দলের অন্য লোকেরা। সাহস পেয়েছে এর কথাবার্তায়। কাজেই সবকিছু ঠেলে ফেলে বুকে সাহস আনতে হয়েছে এর।

'কিসের কি হবে?' কথাটা ভাল বুঝতে পারে না সীমাচলম।

'এই আমাদের চাকরির? সাহেবরা সব ছেড়েছুড়ে আগেই সরে পড়েছে বাবু। আমাদের বলে গেছে, কোন ভয় নেই। কেউ পালিয়ে যেও না যেন। তারপর বোমার আগুনে বস্তিকে বস্তি যখন জ্বলে উঠলো, তখন ছুটোছুটি ক'রে সাহেবদের বাংলোয় গিয়ে দেখি সব ফাঁকা। কয়েকদিন আগেই তল্পিতল্পা নিয়ে সরে পড়েছে তারা। একবার জানতেও দেয়নি বাবু আমাদের।'

হতাশ হয় সীমাচলম। এই কথাটাই বুঝি আগে মনে আসলো সর্দারের, তার চাকরির কি হবে। এই বিষ ওদের রক্ত-অস্থি-মজ্জায় কতদূর সঞ্চারিত হয়ে গেছে ধারণাও করা যায় না।

কঠিন হয়ে ওঠে সীমাচলম, 'চাকরি যাবে কেন তোমাদের? জাপানীরা এগিয়ে আসছে, থেকে গেলেই পারতে, তারা কাজে নিয়ে নিতো তোমাদের।'

গলার স্বরটা বোধ হয় একটু অস্বাভাবিক রূঢ় হয়ে যায়। গলার আওয়াজে কিম্বা হয়ত জাপানীদের নাম শুনে ধড়মড় করে উঠে পড়ে কয়েকজন। মেয়েদের মধ্যে দু'একজন অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে। আচমকা কেঁদে ওঠে ছোট ছেলেমেয়ে দু'একটা।

'কি হ'লো তোদের? চেঁচামেচি করিসনি। নে শুয়ে পড়।' গলার আওয়াজে প্রভুত্বের আভাস। মেষ আর মেষপালকের সম্বন্ধ। শুয়ে পড়ে সব ক'জন। মেয়েরা আস্তে আস্তে থাবড়ায় ছোট ছেলেগুলোকে। একটু পড়েই ঘুমিয়ে পড়ে সবাই।

'কিন্তু ওদের কাছে কাজ করবো কি হুজুর? শুনেছি ওরা শয়তানের জাত। একটু কিছু হ'লে জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে নেয়।'

'খুব বেশী তফাৎ নাকি?'

কথাটা একটুও বুঝতে পারে না সর্দার। হাত কানের পাশে দিয়ে ঝুঁকে পড়ে সীমাচলমের দিকে, 'আজ্ঞে, কি বললেন?'

'বলছি, খুব বেশী তফাৎ নাকি দুজনের মধ্যে। ওরা নেয় ছাল ছাড়িয়ে, আর এরা নেয় রক্ত শুষে, কেমন?'

'রক্ত শুষে নেয়? কারা?'

'এই তোমাদের সাদা চামড়ার মনিবেরা।'

শিউরে ওঠে সর্দার। এসব কথা শোনাও যেন পাপ।

'কি ভালো লাগলো না কথাটা? বিপদের মুখে তোমাদের ফেলে দিয়ে ওদের সরে পড়তে একটুও বাধলো না তো? তোমাদের জীবনের বুঝি কোনই দাম নেই! খোঁজ করে দেখো, ওদের পোষা কুকুরগুলোকে ঠিক নিয়ে গেছে যত্ন করে। কিন্তু তোমাদের কথা মনেও হয়নি ওদের।

অনেকক্ষণ বসে বসে ভাবে সর্দার। দু'হাঁটুর ওপরে মুখটা রেখে চুপ করে বসে থাকে। অনেকদিনের গড়ে তোলা একটা ধারণা যেন ধ্বসে ধ্বসে পড়ছে। কোথায় একটা অবিশ্বাসের সুর। উদয়াস্ত খাটিয়ে ঘামের বদলে টাকা দিয়েছে মনিবেরা। ব্যস, এই দেয়া-নেয়ার সম্পর্ক। কোনদিন খোঁজখবর পর্যন্ত করেনি ওরা বাঁচলো কি মরলো। মনে পড়ে সর্দারের, কতদিন তিন চার ডিগ্রি জ্বর নিয়ে কাজ করতে হয়েছে তাদের। কোন দয়া নেই, সহানুভূতি নেই, যাই কিছু হোক না, বরাদ্দ কাজ করে তবে মিলবে ছুটি। সত্যিই তো, ওরা আর কি এমন আপনজন? কম নিষ্ঠুরই বা কি!

'আমরা তাহ'লে কি করবো বলুন?'

'কোথায় পালাবে ঠিক করেছো?'

'কোন জায়গা তো ঠিক করিনি। হাঁটতে হাঁটতে মৌলমিনে এসে পৌঁছলাম। সেখানে এসে দেখলাম সবাই পালাচ্ছে। শহর একেবারে ফাঁকা। কেবল টহল দিচ্ছে সৈন্যরা। থাকতে ভরসা হ'লো না। কিছুটা রেলে, কিছুটা পায়ে হেঁটে চলে এলাম এখানে। কিন্তু এখান থেকেও দলে দলে পালাচ্ছে লোক!'

'ভারতবর্ষে ফিরে যাবার চেষ্টা করবে নাকি?'

'চেষ্টা হয়ত করবো, কিন্তু সেতো অনেক পয়সার খেলা। যা টিকেটের দাম তার চার পাঁচগুণ দিয়ে তবে টিকেট মিলবে। আমাদের সামর্থ্যে তো কুলোবে না।'

'ভারতে যাবার জায়গা আছে? দানাপানি মিলে যাবে সেখানে?'

ম্লান হাসে সর্দার, 'সবই তো বোঝেন। সেখানে আস্তানা থাকলে দেশ ছেড়ে কি আর সাগর পার হ'য়ে বিদেশে আসে কেউ? আজ ত্রিশ বছর দেশছাড়া। কি আছে সেখানে আর কি নেই কিছুই জানিনা।'

একটু নড়েচড়ে ঠিক হয়ে বসে সীমাচলম। রাত বেড়ে চলে। অনেকদূরে কোথাও কাদের ঘড়িতে অবিশ্রান্ত টিক টিক শব্দ আসে। সময় হাতে খুবই কম। যেটুকু কাজ, আজ থেকেই শুরু হোক।

কেসে গলাটা পরিষ্কার করে নেয়, 'আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তোমাকে। যদি সব সাদা চামড়া চলে যায় এদেশ থেকে, রবারের বন, রবারের কারখানা, মিল খনি সমস্ত আমাদের হাতে চলে আসে? বর্মীরা আর আমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সব কাজ আবার নতুন করে শুরু করি। তোমাদের কাজের টাইম বেঁধে দিই? অসুখ-বিসুখ হ'লে কারখানার মুনাফা থেকে ওষুধ আর ডাক্তারের খরচ চালানো হয়? মেয়েদের কারখানায় কাজ করতে না দিয়ে তাদের দিয়ে অন্য ধরনের কাজ করাই, যেমন ধরো ঝুড়ি বোনা, চুরুট তৈরী করা এইসব? তোমাদের ছেলেদের স্কুলে

ভর্তি করে লেখাপড়া শেখাই কারখানার তহবিল থেকে ? কেমন হয় তাহলে ?'

আবিষ্ট হ'য়ে শোনে সর্দার। কিন্তু কোথায় একটা সন্দেহ লুকানো থাকে, 'এদেশ তো আমাদের নয় বাবু, এদেশ তো বর্মীদের। ওরা চাইবে কেন আমাদের ?'

'তোমরা ওদের চাইলেই ওরা তোমাদের চাইবে। তোমরা শুধু ওদের দেশে টাকা লুটতে আসো। জমিজমা কেড়ে নাও ওদের কাছ থেকে। কোনদিন কি মিশেছ ওদের সঙ্গে ভালো করে ? ওদের বস্তির ভেতর ঢুকে খোঁজ নিয়েছো ওদের সুখসুবিধার ?'

'ওদের সঙ্গে মেলামেশা করাও একটু মুশকিল। যা তা খায় ওরা, ওদের ধরন-ধারণও আলাদা।'

'সাহেবরাও তো যা তা খায়, তাদের বিধি-ব্যবস্থাও তো মেলে না আমাদের সঙ্গে, কিন্তু তাদের পা চাটবার জন্য এত লালায়িত কেন আমরা ?'

চুপ করে থাকে সর্দার। নিঃসাড়ে বসে থাকে অনেকক্ষণ।

'আমরা তাহলে এখন কি করবো বাবু ?'

'তোমরা পালাবে না।'

'পালাবো না ? মরে যাবো যে !'

'পালিয়ে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচা যায় না সর্দার। তাছাড়া একটা লড়াইয়ে সবাই কি আর মারা যায় ? দশজনের মধ্যে ছ'জন মারা যায়, কিন্তু চারজন বেঁচে থাকে। যারা বাঁচে তারা নতুন দেশ গড়ে তোলে।'

'কিন্তু জাপানীদের সঙ্গে কি নিয়ে আমরা লড়বো বলুন ? কি আছে আমাদের ?'

'আমাদের হাত আছে সর্দার। হাত থাকলে হাতিয়ারের অভাব হয় না। তাছাড়া জাপানীদের সঙ্গে আমরা লড়বো না।'

'লড়বো না আমরা ?'

'না, ওদের সঙ্গে মিলে সাদা চামড়াকে আমরা কালাপানি পার করে দেবো।'

কথাটা আর কিছুদিন আগে হয়ত বিশ্বাস করতো না সর্দার। সাহেবদের কেউ হটাতে পারে একথা মনের কোণেও ঠাঁই দিতো না। আজ কিন্তু ঘুরে গেছে চাকা। মিঃ মুরের কথা মনে পড়ে যায়। রবার বাগানের ম্যানেজার মিঃ বেন মুর। লাল টকটকে গায়ের চামড়া। কথায় কথায় চড়-চাপড়। একটু মাত্রা ছাড়ালে চাবুকের ওপর চাবুক, পিঠের ছাল খুলে নেবে এমনি একটা ভাব। সেই সাহেবেরও শেষ দিকটা ফ্যাকাশে হ'য়ে গিয়েছিলো মুখ। গলার আওয়াজও নিস্তেজ। মাঝে মাঝে চাইতো আকাশের দিকে, আর দাঁত কিড়মিড় করে বলতো, Bloody Jpas! আরো একদিনের কথা মনে পড়ে। সাইরেন বাজতেই ছুটে যে যার বস্তির দিকে পালিয়েছিলো মেয়ে-মদ্দ সবাই। বোমা পড়েনি সেদিন। প্রায় আধঘণ্টা পরে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা খুলেই আশ্চর্য হ'য়ে গিয়েছিলো সর্দার। কোণের দিকে জড়ো করা চাটাইগুলোর পাশ থেকে সন্তর্পণে বেরিয়ে এসেছিলো মিঃ মুর। সারা শরীর ভিজে উঠেছে ঘামে। ঘোলাটে দুটি চোখ। ঠোঁট দুটো তখনো কেঁপে কেঁপে উঠছে। কপালের ঘাম মুছে আবার চেয়েছিলো আকাশের দিকে, হাতটা মুঠো করে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিলো, Bloody Japs! আজ আর বিশ্বাস করতে অসুবিধা হয় না। হটে যাবে সাদা চামড়া। জাপানীদের কেউ রুখতে পারবে না। কিন্তু জাপানীরা যদি এসে দখল করে সবকিছু? মালিক হয়ে বসে কলকারখানা আর জমিজমার? তারাও হুকুম করবে এদের মতন ?

'সবই নির্ভর করছে তোমাদের ওপর। বর্মীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ

মিলিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াও তোমরা, সাধ্য কি জাপানীদের সেই শক্ত পাঁচিল পার হ'য়ে ভেতরে ঢোকায় ?'

কিছুক্ষণ কি সব ভাবে সর্দার। চোখদুটো কুঁচকে অনেকক্ষণ বসে থাকে বাইরে জানলার দিকে চেয়ে। তারপর বলে, 'আমি থাকবো এখানে। দেশ বলতে আমার কিছুই নেই। এই আমার দেশ। অনেক নুন খেয়েছি এদেশের, কিছুটা শোধ অন্ততঃ করে দেওয়া দরকার।'

'চট করে কিছু বলবার দরকার নেই। তুমি ভেবে নাও দু'দিন, সঙ্গীদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে নাও, তারপর ঠিক কোরো।'

'শলাপরামর্শ ? এদের সঙ্গে ?' মুখটা বেঁকিয়ে হাসে সর্দার, 'এদের ভাবনা-চিন্তার ভার সব আমাকেই নিতে হয়।'

অনেকদূরে কোথাও পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজে। চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে পড়ে সীমাচলম। তাইতো, সারাটা রাত বসেই কাটলো এইভাবে ? নিজেও ঘুমালো না, পরিশ্রান্ত একটা লোককেও জাগিয়ে রাখলো সারাটা রাত !

'তুমি ঘুমিয়ে পড়ো সর্দার। বসে বসেই আমরা রাত কাবার করে দিলাম।'

হাসে সর্দার, 'একটা রাত জাগা আর কি বাবু ? প্রথম প্রথম টিনের কারখানায় কত রাত জেগে কাজ করতে হয়েছে ঠিক-ঠিকানা নেই। অবশ্য রক্তের জোর ছিলো তখন, জোয়ান বয়স ছিলো। আজকাল একটু কাবু করে ফেলে।' কথার সঙ্গে সঙ্গেই হাই তোলে সর্দার। সঙ্গীদের মধ্যে একটু জায়গা করে নিয়ে শুয়ে পড়ে ঝপ করে।

দরজা খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়ায় সীমাচলম। কোকোপিন আর কৃষ্ণচূড়া গাছের ওপাশে লাল হয়ে উঠেছে আকাশ। ভোর হচ্ছে বলে মনে হয় না, মনে হয় রক্তাক্ত পৃথিবীর প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে আকাশে। ধ্বংসের দেবতা আসছে এগিয়ে, তারই নিষ্ঠুর পদক্ষেপে চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে সবকিছু।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসে সীমাচলম। চোকাঠের এপাশে ঘুমাচ্ছে ছোকরা চাকর। বেচারী অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে পরিশ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে বোধ হয়। সন্তর্পণে পাশ কাটিয়ে দরজা খুলে ভিতরে ঢোকে।

অনেক বেলায় ঘুম ভাঙে সীমাচলমের। চনচনে রোদ উঠেছে। ধড়মড় করে উঠে পড়ে বিছানা ছেড়ে। অনেকগুলো লোকের খাওয়া দাওয়ার জোগাড় করতে হবে ওকে। যে ভাবেই হোক, ওর আশ্রয়ে এসে জুটেছে যখন ওরা, তখন ওকেই তদ্বির-তদারক করতে হবে বৈ কি।

মুখ হাত ধুয়ে সন্তর্পণে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে সীমাচলম। ভেজানো দরজাটা আস্তে আস্তে খোলে। পথশ্রমের ক্লান্তিতে নির্জীবের মত ঘুমাচ্ছে হয়ত বেচারীরা। দরজা খুলে প্রথমে কিছু নজরে পড়ে না, তারপরেই অবাক হয়ে যায়। সারা ঘর খালি। কেউ নেই কোথাও। মোটঘাট মালপত্তর কিছুই নেই। গেলো কোথায় সব ?

ফটক পার হয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায় সীমাচলম। কখন চলে গিয়েছে কে জানে ? এখনও রাস্তা ধরে অগণিত জনতার স্রোত চলেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে সীমাচলম, সাধ্য কি ওর বাঁধভাঙা প্রচণ্ড এই জনস্রোতের গতি রোধ করে ? সারারাত ধরে এত কথাবার্তা, এত আলাপ-আলোচনা সর্দারের সঙ্গে, সবই বৃথা। ভয় পেয়েছে সর্দার। চক্ষুলজ্জায় ওর সঙ্গে দেখা করে যেতে বোধ হয় বাধো বাধো ঠেকেছে। এই তো জনতার রূপ, যুক্তি, তর্ক, অনুনয়, বিনয় কিছু মানতে চায় না এরা। বিরাট ভয়ের সংস্পর্শ থেকে শুধু পালিয়ে বেড়াতে চায়।

কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে আবার ওপরে উঠে আসে সীমাচলম। অনেকদিন পরে ছোট ক্যাশবাক্সটা খুলে বসে। টাকাপয়সা সাজিয়ে রাখে টেবিলের ওপরে। বেশ একটু চিন্তিত হ'য়ে পড়ে। ওর আর্থিক অবস্থার দিকে খেয়াল করেনি এতদিন। প্রয়োজনই হয়নি। কিন্তু এই বুঝি অবশিষ্ট!

সঞ্চয়ের শেষ ধাপে এসে পৌঁছেচে। কুলিকামিনরা চলে গেছে, একরকম ভালোই হয়েছে। নয়ত অতগুলো লোকের খোরাক জোটাবার মত রসদ পেতো কোথায় ?

দরজার কাছে আওয়াজ হ'তেই মুখ তুলে চায় সীমাচলম। পর্দার পাশে ছোকরা চাকরটি দাঁড়িয়ে। কি বুঝি বলতে চায়।

'কি খবর, ভেতরে এসো।'

ভিতরে এসে ঢোকে ছোকরাটি। কোন কথা বলে না, মাথা নিচু করে এক পা দিয়ে আরেক পায়ের নখ খোঁটে।

'বলবে নাকি কিছু ?'

'হ্যাঁ বাবুজী, আমার ছুটি চাই।'

'এ বেলার মত ? বেশতো রান্নাবাড়া করে চলে যেও তুমি।'

'না, এ বেলার মত নয়, একেবারে ছুটি চাই।'

'একেবারে ছুটি ! কেন, কি হলো ?'

'আমার দিদিমার খুব অসুখ, চিঠি এসেছে কাল রাত্রে। আমাকে একবার দেখতে চায়।'

মনে মনে হাসে সীমাচলম। সরে যেতে চায় ছোকরা। সাহসের পারা ক্রমেই নেমে আসছে। চোখের সামনে এতগুলো লোককে পালাতে দেখে মাথা ঠিক রাখা সত্যিই মুশকিল। সোজা কথাটা বলতে চায় না ওর কাছে। ভয়ে পালাচ্ছে বলতে বোধ হয় পৌরুষে বাধে।

'বেশতো, যদি যেতে চাও, খাওয়া-দাওয়া সেরে অনায়াসেই চলে যেতে পারো।'

খাওয়া-দাওয়ার পর চুপচাপ শুয়ে তন্দ্রার ভাব আসে একটু। কড়া নাড়ার শব্দে লাফিয়ে উঠে পড়ে। চোখ মুছে দরজা খুলে দেয়। কি ব্যাপার ! সর্দার ফিরে এসেছে, সঙ্গে বছর বারো বয়সের একটি মেয়ে।

'একি তুমি কোত্থেকে? চলে যাওনি তোমরা?'

ঘরের ভিতর ঢোকে সর্দার। সারা মুখ কালো হয়ে উঠেছে। দরদর করে গড়ায় ঘামের ধারা। দুপুরের সমস্ত রোদটা মাথায় করে বেড়িয়েছে। মেয়েটির অবস্থা আরও মারাত্মক। চোখ দু'টো লাল হ'য়ে উঠেছে। বেচারী বসে বসে হাঁপায় তখনো।

ছেঁড়া কাপড়ের ফালি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে খেতে সর্দার বলে, 'ওদের সব জাহাজে তুলে দিয়ে এলাম। সকালের দিকে বোঝালাম অনেক করে। এ দেশের অনেক নেমক খেয়েছিস, দুদিন থেকে না হয় কিছুটা শোধ দিয়ে যা। বললাম আপনার কথা। বাবু বলেছে যে দুনিয়া পাল্টে যাচ্ছে। ঘুরে যাচ্ছে চাকা। এতদিন যারা ওপরে ছিলো, এবার সব চলে আসবে চাকার তলায়। আমাদের দেশ আমাদের হবে। আয়, থেকে যাই বাবুর সঙ্গে। দু'একজন যা-ও বা একটু দোমনা হ'লো, কিন্তু মেয়ে-ছেলেগুলোর কান্নাগোলে সব গুলিয়ে গেলো। কোন কথা শুনতে চায় না মেয়েছেলেরা। ভেউ ভেউ করে কাঁদে আর বলে, সর্বনাশ করো না সর্দার। ঘরের মানুষকে এমনি করে বিপদের মুখে টেনে নিয়ে যেও না। কি আর করি বলুন, বললাম, জোর তো আর নেই কারুর ওপরে। যার খুশি থাকো, যার খুশি চলে যাও। একদিন এই বুড়োর কথা সবাই শুনতো মাথা নিচু ক'রে, কেউ টুঁ শব্দটি করতো না কথার ওপরে, কিন্তু হুজুর আপনি যা বলেছেন, ভয় পেলে মানুষ সব ভুলে যায়। গুটগুট ক'রে সবাই গিয়ে উঠলো জাহাজে।'

একটু থেমে হাতের কাপড়ের ফালিটা দিয়ে মুখটা মুছে নেয়, মেয়েটির চোখ আর মুখ মুছিয়ে দেয় যত্ন করে, তারপর বলে, 'আমার এক রকম তিনকুলে কেউ নেই হুজুর। আমি রয়ে গেলুম। সাদা চামড়ার অনেক অত্যাচার সহ্য করেছি, অনেক ধমকানি হজম করেছি, বড্ড ইচ্ছা মনে, সেই

রকম করে ওদের ধমকাবো আর মুখ-খিস্তি করবো। রবারের জঙ্গলে উদয়াস্ত খাটাবো ওদের ছেলেবুড়োকে।'

জ্বলে ওঠে সর্দারের চোখ দুটো। চেয়ে চেয়ে দেখে সীমাচলম। আর ভয় নেই। মেঘ জমেছে ঈশান কোণে। টুকরো ছোট্ট মেঘ। কিন্তু দেরী নেই আর। পুঞ্জপুঞ্জ মেঘের চাপে ছেয়ে যাবে সমস্ত আকাশ। টলমল করছে ওদের নৌকা। উন্মত্ত ঝড়ের বেগে খানচাল হ'য়ে যাবে। বেশী দূরে নয় সেদিন।

মেয়েটি বড় বড় চোখ করে তাকায়। বয়সের চেয়েও সরল বলে মনে হয়। মেয়েটির দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে সীমাচলম। সর্দারকে বলে, 'এটি বুঝি তোমার মেয়ে?'

কথাটা বলে মেয়েটির দিকে চেয়ে চেয়ে মিল খোঁজে সর্দারের সঙ্গে। কোথাও মিল নেই একটুও। সর্দারের তামাটে রংয়ের পাশে মেয়েটির সুগৌর বর্ণ বেশ একটু বেমানান। তাছাড়া মুখচোখও প্রাচ্য ধরনের একটু চাপা চাপা। এদেশের কোন মেয়েকেই হয়ত সঙ্গিনী করে থাকবে সর্দার।

'হ্যাঁ বাবু আমারই মেয়ে।' সস্নেহে মেয়েটির মাথায় হাত রাখে সর্দার, 'এত করে বোঝালাম তুই চলে যা এদের সঙ্গে। বিপদ মাথায় করে তুই কোথায় থাকবি আমার কাছে? কিন্তু শুনলো না কিছুতেই। সেই যে হাত আঁকড়ে ধরে রইলো আমার, লোকের হাজার টানাটানিতে কিছুতে ছাড়লে না হাত।'

সীমাচলম বলে, 'কিন্তু এখানে তো তোমাদের বড় কষ্ট হবে সর্দার। আজ আবার আমার চাকরটা ছুটি নিলো।'

'এই কথা!' হেসে ফেলে সর্দার। তারপর মেয়ের দিকে চেয়ে বলে, 'রাংগাম্মা, পারবি না দু'জনের রান্না করতে?'

হেসে ঘাড় নাড়ে মেয়েটি। আড়চোখে চায় সীমাচলমের দিকে।

'ব্যস, তাহ'লে আর ভাবনা কি?' নিশ্চিন্ত হওয়ার ভান করে সীমাচলম, 'কাল থেকেই রান্নাঘরের ভার নাও তাহলে, কেমন?'

মাথা নিচু করে মুখ টিপে হাসে মেয়েটি।

'যা মা, মুখ হাত ধুয়ে আয়। সারা দিনটা রোদে টো টো করে কি চেহারাই হয়েছে।' সর্দারের গলার আওয়াজ বেশ একটু মোলায়েম।

মেয়েটি উঠে যেতেই এগিয়ে আসে সর্দার। একেবারে গা ঘেঁষে বসে সীমাচলমের, 'মেয়েটাকে নিয়ে বড্ড মুশকিলে পড়েছি। এমন একটা মায়া পড়ে গেছে মেয়েটার ওপরে।'

'অস্বাভাবিক আর কি হয়েছে? নিজের মেয়ের ওপরে মায়া তো হবেই।'

'নিজের মেয়ে নয় বাবু। সেইজন্যেই তো হয়েছে মুশকিল।'

'সে কি, তোমার মেয়ে নয়?'

'না।' হাসে সর্দার, 'আমি বিয়ে-থা করিনি। ছেলেবয়সে এদেশে এসেছিলাম, হৈ-চৈ করে কাটিয়ে দিলাম একরকম। ঝক্কি-ঝামেলা কোথায় এড়াতে চেয়েছিলাম, আর দেখুন না কোথা থেকে কার বোঝা এসে চাপলো ঘাড়ে।'

'কুড়িয়ে পেয়েছিলে বুঝি?'

পিছন দিকে চেয়ে দেখে সর্দার। চেয়ে দেখে এদিক-ওদিক। শুনে ফেলবে না তো কেউ। বিশেষতঃ মেয়েটির কানে একটি টুকরো কথা গেলেই সর্বনাশ, 'ঠিক ধরেছেন আপনি। কুড়িয়ে পেয়েছি ওকে আমি। তবে ওর মা আর বাপ দু'জনকেই চিনি।' চোখদুটো ছোট করে হাসে সর্দার।

'কি রকম?'

'আমাদের রবার বাগানের ছোট ম্যানেজার সাহেবের মেয়ে ও, দেখছেন না রংয়ের জেল্লা। ওর মাকেও জানি। মালয় দেশের মেয়ে, হাটে ডিম বিক্রি করতে আসতো। সাহেবের বাড়িতে সপ্তাহে দু'দিন ধরে বরাদ্দ ছিলো। পাহাড়ের আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে কতদিন বেড়াতে দেখেছি দু'জনকে। হাত ধরাধরি করে হাসাহাসি, কত রকমের ব্যাপার। লজ্জায় আমরা ঝোপের পিছনে লুকিয়ে পড়েছি। তারপর অনেকদিন পরে রবার জঙ্গলের একধারে পাতা আর কাপড়ে জড়ানো অবস্থায় কুড়িয়ে পেলাম ওকে। বাঁচাতে কি কম কষ্ট পেয়েছি? সেই সময়ে আমাদের দলের একজনের মেয়ে মারা গিয়েছিলো, ওকে তুলে নিয়ে এসে তার কোলে ফেলে দিয়েছিলাম। সেই প্রাণ দিয়ে মানুষ করে তুলেছিলো। খরচপত্তর সবই অবশ্য আমিই জুগিয়েছিলাম। সে হঠাৎ মারা গেছে বছর কয়েক, সেই থেকে ও আমার কাছেই আছে। দেখাশোনা সবকিছু আমিই করতুম কি-না। শুরু থেকে তাই ও জানে আমিই ওর বাবা।'

'তোমাদের ছোট ম্যানেজার সাহেব জানতে পারেননি কথাটা?'

'পারেনি আবার? আমার কোলে ওকে দেখে চমকে উঠেছিল। হাজার হোক রক্তের টান তো বটে। ওর হাতে নোট গুঁজে দিয়ে বলেছিলো, বাঃ, বেশ মেয়েটি তো! চুপি চুপি আমাকে ডেকে বলেছিলো একদিন, মেয়েটিকে ওকে দিয়ে দিতে। মেয়েটিকে নাকি ভারি ভাল লেগেছে ওর। কিন্তু আমার সাহস হলো না। ওরা সব পারে, বিশেষতঃ এইসব ব্যাপারে। হয়ত গুম খুন করে ফেলবে, নয়ত নদীতে ফেলে দিয়ে আসবে গলায় পাথর বেঁধে। নিজের পাপ আর কে না ঢাকতে চায়? বছর দুয়েক পরেই সাহেব হঠাৎ চলে গেলো বিলেতে। কোন কারণ ঘটেনি। কিন্তু আমি জানি হুজুর, এ ছাড়া ওর আর উপায়ই ছিলো না। নিজের মেয়ে চোখের সামনে ঘোরাফেরা করবে এমনিভাবে, এ কিছুতেই সহ্য করতে পারেনি।'

মেয়েটির পায়ের আওয়াজ হতেই থেমে যায় সর্দার। ইতিমধ্যেই মুখ হাত ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে এসেছে মেয়েটি। আরও যেন আরক্তিম দেখায় ওর বর্ণ। গোল গোল কটা রংয়ের চোখ। আঁটসাঁট মজবুত শরীর। প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের অপূর্ব সংমিশ্রণ।

'তুমি গেলেই পারতে রাংগাম্মা। এত গোলমালের মধ্যে মেয়েদের না থাকাই তো ভালো।' ভাঙা তেলেগুতে আলাপ করে সীমাচলম।

চমৎকার হেসে রাংগাম্মা, 'বারে! বাবাকে কে দেখবে তাহ'লে?'

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা একরকম চালিয়ে নেয় রাংগাম্মা, কিন্তু পয়সাকড়ির ব্যাপারে নাজেহাল হ'য়ে পড়ে সীমাচলম। আর উপায় নেই। ক্যাশবাক্সে যা রয়েছে, বড়ো জোর দিন পাঁচেকের ব্যবস্থা চলতে পারে। কিন্তু তারপর? শেষকালে হাত পাততে হবে নাকি সর্দারের কাছে? ছি ছি! তার চেয়ে যে রকম করে হোক কিছু একটা জুটিয়ে নিতে হবে। যে ধরনের চাকরিই হোক।

ঘুরতে ঘুরতে প্যাগোডার চাতালে গিয়ে পৌঁছায় সীমাচলম। ঠিক সিঁড়ির মুখেই দেখা হ'য়ে যায় থাকিন মিয়ার সঙ্গে। সঙ্গে আর একটি লোক। খুব ব্যস্তভাবে নেমে যাচ্ছে দুজনে। সামনে গিয়ে দাঁড়ায় সীমাচলম। অগাধ জলের মাঝখানে চরের আভাস পায়। থাকিন মিয়াকে ধরলে নিশ্চয় কিছু একটা বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। থাকিন মিয়াও বোধ হয় দেখতে পেয়েছিল তাকে। সঙ্গের লোকটিকে দাঁড় করিয়ে দ্রুতপায়ে নেমে আসে তার কাছে।

'কি ব্যাপার, অনেকদিন দেখিনি আপনাকে?'

'বড় বিপদে পড়েছি।' আদ্যোপান্ত সবকিছু বলে যায় সীমাচলম। থাকিন মিয়ার কাছে কোনরকম সঙ্কোচ আর লজ্জা করে না। নিজের আর্থিক অবস্থার কথাটাও জানিয়ে দেয়। সর্দার আর তার মেয়ে এসে জুটেছে, সে কথাও বলে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে থাকিন মিয়া। কি ভাবে মনে মনে। তারপর সীমাচলমের কাঁধে হাত রাখে, 'চাকরি একটা হয়ে যাবে। সেজন্য বিশেষ ভাবনার নেই কিছু। আমরা শহরের বাইরে একটা সেবাকেন্দ্র খুলেছি, সেখানে লোকের দরকার হবে।'

'সেবাকেন্দ্র ?'

'হ্যাঁ, বাইরের রূপ তাই, কিন্তু ভেতরে ঢুকলে আসল কাজের সন্ধান পাবেন। যদি আপত্তি না থাকে বলুন, আমি বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।'

'না, আপত্তি আর কি ? কিন্তু থাকার ব্যবস্থা ?'

'সবই আছে, তবে রাজকীয় ব্যবস্থার সুবিধে নেই। কর্মীরা যে ধরনের রিলিফ ক্যাম্পে থাকে সচরাচর, তা পাবেন।'

'খাওয়া-দাওয়া ?'

'ওখান থেকেই পাবেন, তবে নিছক প্রাণ-ধারণের জন্য যেটুকু দরকার সেটুকুই, তার বেশী কিছু নয়।'

'বেশ, আমি রাজি আছি।'

ইঙ্গিতে সঙ্গের লোকটিকে কাছে ডাকে থাকিন মিয়া। বেঁটে হলদে রংয়ের ভদ্রলোক। মুখ-চোখের চেহারায় সংসার সম্বন্ধে বীতস্পৃহ মনে হয়। দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখের গড়ন। কোনদিন লোকটি হেসেছে বলে মনে হয় না।

'মিঃ লিয়ং, আমাদের ওচিনের সেবাকেন্দ্রে এঁকে পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করতে হবে। ইনি আমার অত্যন্ত পরিচিত লোক।'

চোখ তুলে চায় মিঃ লিয়ং, সীমাচলমের দিকে নয়, সীমাচলমের মাথার ওপর দিয়ে অনেকদূরের ঝাউ গাছের আগার দিকে। লোকটাকে দেখবার প্রয়োজন নেই কোন। আদেশ হয়েছে এই তো যথেষ্ট।

'একটা কথা।' সীমাচলমের দিকে এগিয়ে আসে থাকিন মিয়া।

'আপনাকে আজই সরে যেতে হবে এখান থেকে। কাল হয়ত যাবার অসুবিধা হতে পারে।'

'কাল কি অসুবিধা হবে?'

'তা কি বলা যায়। যুদ্ধের সময় হাজার রকমের অসুবিধা এসে জুটতে পারে। দেরী না করে আজ রাত্রেই রওনা হয়ে যান। স্টেশনের পাশেই আমাদের সেবাকেন্দ্র, চিনতে অসুবিধা হবে না।'

সীমাচলমকে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে লিয়ংএর সঙ্গে নেমে যায় থাকিন মিয়া। যেতে যেতে প্রায় অস্ফুটস্বরে বলে, 'আমি থাকবো ওখানে। আবার দেখা হবে আপনার সঙ্গে।'

থাকিন মিয়া চলে যাবার পরও চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সীমাচলম, তারপর আস্তে আস্তে প্যাগোডার দিকে উঠতে শুরু করে।

থামে থামে কাগজ লটকানো। খবরের কাগজের ওপর লালকালি দিয়ে বড়ো বড়ো হরফে লেখা, সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক। শ্বেতশক্তি ধ্বংস হোক। মুক্তি-স্নান করুক সোনার বর্মা।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে সীমাচলম। ঘুণ ধরেছে সাম্রাজ্যবাদের সিংহাসনের তলায়, ঔপনিবেশিক শাসনের খিলানে খিলানে উই এসে জুটেছে। সতর্কতম চোখের অন্তরালে নিজের কাজ করে চলেছে তারা। সহসা সশব্দে মাটিতে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাবে সবকিছু।

প্যাগোডায় ভিড় নেই মোটেই। ভারতীয়েরা তো নেইই, এদেশীয় লোকের সংখ্যাও খুব কম।

সীমাচলম সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসে। চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে খোঁজে সেই মেয়েটিকে। কিন্তু কোথাও নেই মেয়েটি। তার জায়গায় বুড়ীগোছের একটি মেয়েছেলে বসে রয়েছে।

বাড়িতে ফিরেই সর্দারকে ডেকে সব কথা বলে সীমাচলম। এখানকার আস্তানা গুটিয়ে সেবাকেন্দ্রে যাওয়াই সমীচীন।

'কিন্তু আজ রাত্রেই এইটুকু সময়ের মধ্যে গুছিয়ে উঠতে পারবো সব ?'

'গুছিয়ে ওঠা আর কি! তিনটি তো লোক আমরা। খাওয়া-দাওয়া করে বেরিয়ে পড়লেই হলো।'

'কিন্তু এসব জিনিসপত্তর ?'

হাসে সীমাচলম, 'এসব জিনিসপত্তর আমার নয় বাড়িওয়ালার। আমার যা দু'একটা কাঠের টুকরো নিচের ঘরে পড়ে আছে। ঘরগুলোয় তালা দিয়ে গেলেই চলবে। মাঝে মাঝে এসে খোঁজখবর নিতে হবে।'

সেবাকেন্দ্র খুঁজে নিতে মোটেই অসুবিধা হয় না। স্টেশনের গায়েই ইঁটের দেয়াল আর টিনের ছাদ দেওয়া সারি সারি ঘর। সামনে ছোট একটুখানি জায়গা। বাঁশের আলনায় গেরুয়া কাপড় শুকোয় কয়েকটা।

গেটের মধ্যে ঢুকতেই মিঃ লিয়ংয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। চশমা পরা একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলছিলো মিঃ লিয়ং। সীমাচলমদের দেখে দুজনেই এগিয়ে আসে।

'আসুন আপনাদের অপেক্ষাই করছি। থাকিন মিয়া জরুরী কাজে বাইরে গেছেন। আজ আর দেখা হবে না তাঁর সঙ্গে। আসুন আপনাদের থাকার জায়গা দেখিয়ে দিই।'

পিছনের দিকে স্বতন্ত্র কয়েকটা ঘরের সার। তারই একটা ঘরের তালা খোলে মিঃ মিয়ং। ছোট অপরিসর ঘর। প্রকাণ্ড দুটি জানলা থাকায় প্রচুর পরিমাণে বায়ু চলাচলের সুবিধা আছে।

'এই ঘর আপনাদের। খাওয়া-দাওয়া সেরে এসেছেন বোধ হয় ?'

'হ্যাঁ। ঠিক আছে। যথেষ্ট ধন্যবাদ। আপনাকে আর কষ্ট দেবো না।'

ঘরের মধ্যে ঢুকে মেঝেয় বিছানা পাতে রাংগাম্মা। কাপড়-চোপড় গুছিয়ে রাখে আলনায়। একটু জল ভরে রাখতে হবে কুঁজোয়। মাঝ রাতে সর্দারের জল খাওয়ার একটা বদভ্যাস আছে। হঠাৎ দরজায় ঠক ঠক শব্দ, 'কে? দরজা খোলা আছে ভেতরে আসুন।'

দরজাটা খুলে যায়, কিন্তু ঘরের মধ্যে কেউ ঢোকে না। বাইরে থেকে নারীকণ্ঠের আওয়াজ আসে, 'একটু বাইরে আসবেন?'

বাইরে আসে সীমাচলম। চশমা পরা সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি। বলে, 'ওই মেয়েটিকে আসতে বলুন আমার সঙ্গে। ওকে মেয়েদের বিভাগে থাকতে হবে। এটা পুরুষদের মহল।'

আপনা থেকেই বেরিয়ে আসে রাংগাম্মা। কথাবার্তা বোধ হয় শুনতে পেয়েছিলো ভিতর থেকে, 'একটু দাঁড়ান। আমি এঁদের শোবার বন্দোবস্ত করে আসছি এখনি।'

ইচ্ছা ক'রে দেরী করে রাংগাম্মা। এমন ভাব করে যেন সর্দারকে ছেড়ে অনেকদিনের জন্য অনেকদূরে চলে যাচ্ছে। ভোরের দিকে কম্বল গায়ে দেবার উপদেশ দেয়, চট করে বাইরে গিয়ে এ বয়সে ঠাণ্ডা না লাগায় সর্দার। কুঁজোটা শিয়রে এনে রাখে। মাঝরাতে জল গড়িয়ে খেতে কোন অসুবিধা না হয়।

নিজের বিছানায় বসে বসে চুপ করে দেখে সীমাচলম। রাংগাম্মা বেরিয়ে যাবার পর আস্তে আস্তে বলে, 'সর্দার, তোমাকে হিংসে হচ্ছে আমার।'

হাসে সর্দার। ও যে খুব খুশী হয়েছে তা ওকে দেখলেই বোঝা যায়। মুখে বলে, 'কেন বলুন তো?'

'দেখাশোনা করবার এমন মেয়ে যার, তার আবার ভাবনা!'

'তা যা বলেছেন। রাংগাম্মা না থাকলে কি হ'তো তাই ভাবি। এ

'বয়সে কে আগলে নিয়ে বেড়াতো আমাকে ? মাঝে মাঝে মনে হয় ওর আসল পরিচয়টা বলে ফেলি ওকে। সারা জীবন ওর সঙ্গে লুকোচুরি খেলে লাভ কি ? কিন্তু কিছুতেই পারি না। ওর চোখের দিকে চাইলেই সব গোলমাল হয়ে যায়।'

'ওর বিয়ে-থা দেবে না সর্দার ?'

'হ্যাঁ, দেবো বৈ কি। মরবার আগে সেই তো আমার একমাত্র ভাবনা। তবে ওকে মানুষের মতন মানুষের হাতে দেবো হুজুর। এই ভেড়ার পালের মতন যারা ছুটে বেড়াচ্ছে এখানে-ওখানে, তাদের কারুর হাতে দিয়ে নষ্ট করবো না ওকে।'

কোণের মোমবাতিটা নিভে আসে একসময়ে। নিঃঝুম নিঃসাড় চারদিক। জানলায় গিয়ে দাঁড়ায় সীমাচলম। অনেক দূরে অস্পষ্ট দেখা যায় সৈন্যদের ছাউনি। মাঝে মাঝে চলন্ত জীপ গাড়ির শব্দ। টহল দিচ্ছে সৈন্যরা। অগ্নিপরীক্ষা সামনে। এতদিনের গড়া সাম্রাজ্য টলমল করছে আজ। ষড়যন্ত্রের গুপ্ত সুরঙ্গমুখে যারা ঢুকেছিলো, আজ শক্তির পরখ হবে তাদের। বাইশে ডিসেম্বরের রাত্রি। অন্য বছর এ সময় হৈ-হল্লা চলে—ফূর্তি চলে বড়দিনের। অনেক রাত পর্যন্ত বাতাসে গানবাজনা আর মাতলামির সুর ভাসে। কোন এক বিস্মৃত যুগে পশুশক্তির ওপরে প্রেমের জয়ের বার্তা বহন করে এনেছিলো পরমপুরুষ। লাঞ্ছনাক্লিষ্ট ক্রুশবিদ্ধ মানবাত্মা অমৃতের পরশ দিয়েছিলো পথভ্রষ্ট জনতাকে। আজ আবার জাগ্রত পশুশক্তি। দানবাত্মার করাল বাহু দিকে দিকে প্রসারিত। ধ্বংসের দামামা-নির্ঘোষে পৃথিবী আজ বধির। পরমপুরুষের আবির্ভাব হোক। জাগ্রত হোক জনশক্তি। অন্যায়, অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াক নিপীড়িত মানুষ। যীশুর অমর আত্মার আহ্বানে চূর্ণ হোক অসত্য, অশিব আর অসুন্দর।

বিছানায় ফিরে আসে সীমাচলম। ঘুম আসে না অনেক রাত পর্যন্ত।

অনেক রকমের কথা মনে আসে। আদিম বর্বর যুগ থেকে কতটুকু আর এগিয়েছে মানুষ? বাস্তব সংঘাতে যখন সভ্যতার খোলস খসে পড়ে, আদিম জন্তুটা আত্মপ্রকাশ করে, তখন কেবলই মনে হয় পৃথিবী বুঝি আজও নীহারিকার কক্ষজাতই আছে।

উঠতে একটু দেরী হয়ে যায় সীমাচলমের। সর্দার আগেই উঠেছে। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে সীমাচলম। কোণের করবী ঝাড়ের ফাঁকে চেয়েই হেসে ফেলে। সর্দার আর রাংগাম্মা বসে আছে মুখোমুখি। সারা রাতের অদর্শনে তুজনেই ব্যাকুল। এগিয়ে যায় সীমাচলম। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে থাকিন মিয়া। উত্তেজিত মনে হয় তাকে। সামনে কয়েকটি লোককে কি বোঝাচ্ছে হাত নেড়ে। চোখোচোখি হতেই চোখের ইঙ্গিতে সীমাচলমকে অপেক্ষা করতে বলে। তারপর লোকদের যেতে বলে এগিয়ে আসে ওর দিকে।

'কালকেই এসেছেন না?'

'হ্যাঁ, আপনিই তো বলেছিলেন।'

'ভালোই করেছেন। আজ থেকেই কাজে লাগতে হবে আপনাকে।'

'কি কাজ বলুন?'

'তুপুরের দিকে বলবো। আমার সঙ্গে দেখা করবেন।'

খুব ব্যস্ত মনে হয় থাকিন মিয়াকে। হাত তুটো পিছনে রেখে পায়চারী করে কয়েকবার। আবার সীমাচলমের সামনে দাঁড়ায়।

'আচ্ছা, আপনার সঙ্গে শুধু সর্দারটিকে দেখছি, তার দলবল কোথায়?'

'তাদের রাখতে পারিনি আটকে।'

'বুঝিয়েছিলেন তাদের?'

'হ্যাঁ বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু থাকতে চাইলো না তারা।'

'অথচ অন্য দেশে এই মজুরদের ওপরে কত আস্থা রাখা হয়। ও-দেশে বোমাবর্ষণের মধ্যে ঠিক কারখানার কাজ চালু রাখছে তারা।'

মাথা নিচু করে অনেকক্ষণ কি ভাবে থাকিন মিয়া। চটি দিয়ে বাঁশের ডগাগুলো মাড়ায়। তারপর হঠাৎ রাস্তা ধরে ফটকের ওপারে চলে যায়।

ফিরে আসে সীমাচলম। রাংগাম্মা আর সর্দার উঠে দাঁড়িয়েছে। ওকে দেখেই হাসে দুজনে।

'কি খবর? বাপ-বেটিতে কি মতলব হচ্ছে ভোর বেলা?'

রাংগাম্মা মুচকি হেসে বাপের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায়। সর্দার বলে, 'কাল রাতে রাংগাম্মা বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছে একটা। আমি নাকি হারিয়ে গেছি, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।' সশব্দে হাসতে চেষ্টা করে সর্দার, কিন্তু আটকে যায় হাসি।

'সর্বনাশ, এক রাতের অদর্শনেই এত কাণ্ড!'

তিনজনেই ঘরে এসে ঢোকে।

আয়নার সামনে বসে দাড়ি কামায় সীমাচলম। বাইরে রকে বসে থাকে সর্দার। ঝালার সঙ্গে গল্পগুজব করে। রাংগাম্মা বোধ হয় মেয়েমহলে তদারক করে রান্নাবান্নার। এমন সময় সাইরেনের বাঁশী বেজে ওঠে। সর্দারকে ডেকে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে সীমাচলম। সামনের মাঠে অগভীর আঁকাবাঁকা ট্রেঞ্চ আছে কতকগুলো। কিন্তু ওখানে ঢুকে মুখ গুঁজে মাটির বুকে মৃত্যুর অপেক্ষা করা পোষায় না। তার চেয়ে যাই হোক, ভদ্রভাবে মরাই তো ভালো। সর্দার কিন্তু ব্যাকুল হয়ে ওঠে, 'রাংগাম্মা, রাংগাম্মা এই সময়ে কোথায় রইলো? আমি দেখে আসি একবার।'

দু'একবার বোঝাবার চেষ্টা করে সীমাচলম, কিন্তু বোঝানো যায় না সর্দারকে। অগত্যা দরজা খুলে বাইরে যাবার চেষ্টা করতেই বাধা পায়।

হুইসিল হাতে একটি ছোকরা দরজা আগলে দাঁড়ায়। ধমকের সুরে বলে, 'কোথায় বেরোচ্ছেন আপনি? যান, ভেতরে যান।'

'আমাদের মেয়ে বাইরে রয়েছে। তাকে নিয়ে আসতে হবে।'

'কোন দরকার নেই। তিনি মেয়েমহলে ঠিক আছেন, যান ভেতরে যান।'

কোণের দিকে হাঁটুর মধ্যে মাথা গুজে চুপচাপ বসে থাকে সর্দার, একবার শুধু মাথা তুলে বলে, 'রাংগাম্মা!'

'রাংগাম্মা মেয়েমহলে ভালোই আছে। তাকে এখানে নিয়ে আসার চেষ্টা করা ঠিক হবে না। খোলা জায়গায় এখন না বেরুনোই ভালো।'

শিউরে ওঠে সর্দার, 'না, না, ঠিক আছে, ঠিক আছে। যেখানেই থাক ভালো থাক সে।'

অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপচাপ। হুইসিলের শব্দও বন্ধ হয়ে যায়। আকাশে বাতাসে মন্থর নিস্তব্ধতা। ভীষণ একটা কিছুর অপেক্ষায় নিঃসাড় হয়ে পড়ে থাকে সবকিছু।

হঠাৎ নীল আলোর ঝলক আকাশে। সঙ্গে সঙ্গে বিকট আওয়াজে সমস্ত পৃথিবী চিড় খেয়ে ফেটে যায়। দু'হাতে প্রাণপণে কান দুটো চেপে ধরে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে সীমাচলম। বুকের স্পন্দন দ্রুততর। বাড়ির দেওয়ালগুলো থর থর করে কেঁপে ওঠে। আশেপাশে নারীর ভয়ার্ত চিৎকার। সবকিছু মিলে অসহ্য আবহাওয়া। প্রায় আধঘণ্টা ধরে চলে বীভৎস নাটকের পালা। বোমার গর্জনের ফাঁকে ফাঁকে বিমান-বিধ্বংসী কামানের আর্তনাদ।

অনেকক্ষণ পরে থেমে যায় সব। আস্তে আস্তে উঠে পড়ে সীমাচলম। সর্দার তখনও বসে আছে চুপ করে। ঘোলাটে উদাস দৃষ্টি, 'সর্দার, সর্দার!' হাত দিয়ে ঝাঁকুনি দেয় সীমাচলম।

'উঃ কি আওয়াজ। কান ফেটে যাবার যোগাড়।' লাফিয়ে দাঁড়িয়ে

ওঠে সর্দার। দরজার কাছে যেতেই তার হাতটা ধরে ফেলে সীমাচলম, 'ও কি, বাইরে বেরিয়ো না এখন। অল্ ক্লিয়ারের হুইসিল দিক আগে।'

'বাবু, আমার রাংগাম্মা।'

'ভয় নেই। কাছেই তো রয়েছে, তার জন্য ভয় কিসের?'

অল্ ক্লিয়ারের সঙ্গে সঙ্গে হৈ-চৈ শুরু হয়। সামনের ছাউনি থেকে দলে দলে সৈন্যরা মোটর সাইকেলে চড়ে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে। এতদিন যা শুধু সম্ভাবনা মাত্র ছিলো, আজ তা বাস্তবে পরিণত হয়।

দরজার সামনেই দেখা হয়ে যায় রাংগাম্মার সঙ্গে। রক্তাভ সারা মুখ, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ছুটতে ছুটতে এসেছে সারা পথ। উন্মত্তের মতন তাকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে সর্দার।

সমস্ত দিনটা একটানা হৈ-চৈয়ের মধ্যে দিয়ে কাটে। ঘরের মধ্যে রাংগাম্মাকে বুকে জড়িয়ে চুপচাপ বসে থাকে সর্দার। জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে সীমাচলম।

দরজায় মৃদু টোকার শব্দ হয়। সীমাচলম বাইরে আসে। ঠিক দরজার গোড়াতেই দাঁড়িয়ে আছে থাকিন মিয়া। চোখ দুটি জবাফুলের চেয়েও লাল। মুখের চেহারা দেখে মনে হয় সারাটা দিন বুঝি পথে পথে কেটেছে।

'একটু বাইরে আসবেন?'

দ্বিরুক্তি করে না সীমাচলম। থাকিন মিয়ার পাশে পাশে চলতে শুরু করে।

'লোকদের কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। পিঁপড়ের মত লাইন দিয়েছে সবাই।'

'এরা এখন ভয় পেয়েছে। কোন যুক্তিতর্ক কিছুই শুনবে না। কি বলে ঠেকিয়ে রাখবেন এদের?'

'আমাদের দলের লোকেরা ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তায়। যতটা সম্ভব লোকদের বুঝিয়ে শুনিয়ে সরিয়ে আনবার চেষ্টা করবে। আপনার ঐ সর্দারটিকে কাজে লাগাতে হবে।'

'কি কাজ বলুন ?'

'ডকে আর অন্যান্য ফ্যাক্টরীতে হাজার হাজার তেলেগু কুলি কাজ করে। সর্দার গোছের কোন লোকের আমার দরকার। কুলিদের বোঝাতে হবে যে, সমস্ত কাজ যেন বন্ধ করে দেয় তারা। ওদের মালপত্তর ওঠানো, কারখানা চালানো কিছু চলবে না। উপরন্তু ঠিক সময়ে কলকব্জা খুলে নিয়ে সরে আসতে হবে সবাইকে। ভেতর থেকে ওদের পঙ্গু করে দিতে হবে।'

'কিন্তু এত কুলি যাবে কোথায় তাহলে ? এদের পেটের ভাত জোগাবে কে ? পরনের কাপড় জুটবে কোথা থেকে ?'

'সে সব বন্দোবস্ত ঠিক আছে। মিঃ লিয়ং মস্ত বড়ো ইঞ্জিনিয়ার। ওর তাঁবে লোকও আছে অনেক। ইংরাজরা হটে গেলেই আমরা আবার কলকব্জা সব কিছু বসাতে পারবো।'

'যে পর্যন্ত সে সময় না আসে কে ভরণ-পোষণের ভার নেবে কুলিদের ?'

'তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু দেরী করা চলবে না। কাজ শুরু হয়ে গেছে। হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। আপনি আলাপ করে দেখবেন একটু সর্দারের সঙ্গে। তার মতটা আজ বিকেলেই জানিয়ে দেবেন আমাকে।'

জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে ছিলো সর্দার। সামনে প্রসারিত পিচঢালা প্রোম রোড। রোদে তেতে আগুন হয়ে উঠেছে। কিন্তু লোক চলাচলের বিরাম নেই। মোট ঘাড়ে করে বৃদ্ধ যুবা নারী শিশু সব চলেছে কাতার দিয়ে। মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে দু'একজন।

পথের কষ্টে বোধ হয়, কিম্বা হয়ত কেউ মারা গেছে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে।

সর্দারের পিছনে এসে দাঁড়ায় সীমাচলম। কাঁধে আলতো হাতটা রাখতেই চমকে ওঠে। তারপর বলে, 'ও আপনি!'

'কি দেখছো?'

উত্তর দেয় না সর্দার। আঙুল দিয়ে চলমান অবিচ্ছিন্ন জনতার দিকে দেখিয়ে দেয়।

'কিন্তু এরা পালিয়ে কোথায় যাবে বলো তো? আজ যে খেলার শুরু হলো আজকেই তো তার শেষ নয়। আক্রমণই যদি জাপানীদের উদ্দেশ্য হয়, তবে শহরে শহরে হানা দেবে তারা। ব্যাপকভাবে বোমা চালাবে।'

'অনেক লোক যে মারা যাবে বাবু। অনেক পরিবার ধ্বংস হয়ে যাবে।'

হয়ত যাবে, কিন্তু উপায় কি? বিরাট একটা ওলটপালটে কত প্রাণ তছনছ হয়ে যায়! বিপুল ধ্বংসযজ্ঞে কি আর দাম কয়েক লক্ষ জীবনের? কিন্তু এ সব কথা বলা চলে না সর্দারকে। পৃথিবীর ভাঙাগড়ার ইতিহাসে নরমেধের সংখ্যা নেই।

'এ সব থেমে যাবে সর্দার। জান তো আকাশে মেঘ জমে পৃথিবীতে বৃষ্টি দেবার জন্যই। আজ থেকে আমাদেরও কাজ শুরু হবে। তুমি তোমার কাজের ভার নেবে, আমি আমার কাজ আরম্ভ করবো।'

'আমাকে কি করতে হবে?'

'ডক আর কারখানার কুলিদের হাত করতে হবে তোমাকে। তাদের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি করতে হবে। ছলছুতো করে ধর্মঘটের ভয় দেখাতে হবে। যে রকম করেই হোক কাজের ব্যাঘাত করতে হবে। কলকব্জা তৈরী জিনিস সব কিছু গুঁড়িয়ে দিতে হবে।'

'তাতে লাভ কি হবে বাবু, এরকম করে একজনের গড়া জিনিস ভেঙে দিয়ে?'

'একজনের জমিতে আরেকজন বাড়ি তুললে এই হয় সর্দার। তার স্বত্বহীন ইমারত গুঁড়িয়ে ধূলো করে দেওয়া ছাড়া আর পথ নেই।' ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে থাকিন মিয়া। দু'চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক।

ফিরে দাঁড়ায় সীমাচলম আর সর্দার।

'তোমাদের রক্তে আর ঘামে তৈরী জিনিসে ওদের গুদাম তো অনেক ভরিয়েছো, আর কেন? ওদের কোন চিহ্ন থাকবে না আমাদের দেশে। আবার নতুন করে শুরু হবে সব কিছুর। তোমরা সেখানে মজুর নয়, তোমরা মালিক।'

সর্দারের চোখে রংয়ের ঘোর লাগে কিনা বোঝা যায় না। এরকম কথা অনেকবারই শুনেছে সে। এত আওয়াজ আর হট্টগোলের মধ্যে দিয়ে ভালো কিছু আসতে পারে এ যেন বুঝতে চায় না ওর মন। তবু আপত্তি করে না সর্দার। আস্তে আস্তে বলে, 'যদি আমার দ্বারা দেশের সামান্য উপকারও হয়, তবে দয়া করে বলুন, আমি যতটুকু সাধ্য করবো।'

উৎফুল্ল হয়ে ওঠে থাকিন মিয়া। সোল্লাসে বলে, 'বাঃ, এই তো মানুষের মতন কথা। কাল থেকেই কাজে লাগতে হবে তোমাকে।'

'বলুন কি কাজ?' গম্ভীর আওয়াজ সর্দারের।

'তুমি নদীর ধারের কাঠের মিলগুলোতে যাবে কাল থেকে। সঙ্গে আরও দু'একজন লোক থাকবে। মিলের মধ্যেও লোক আছে আমাদের। তুমি সর্দার, অনেক কুলি-মজুর খেটেছে তোমার তাঁবে। তাদের কিভাবে হাত করতে হয় ভালোই জানো তুমি। কাল গিয়েই তাদের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি করবে। মাইনে না বাড়ালে কেউ ছোঁবে না মেশিন। ধর্মঘট করবে একযোগে। দেখবে মালিকরা ঠিক বাড়িয়ে দেবে মাইনে। তারপর আর একটা ছুতো খুঁজে আবার গোলমাল শুরু করবে। আর একদল লোহা-লক্কড়ের কারখানায় গিয়ে হানা দেবে।

মোট কথা হচ্ছে, এদেশে ওদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলতে হবে।'

ঘাড় নাড়ে সর্দার। চৌকাঠ বরাবর গিয়ে ফিরে দাঁড়ায় থাকিন মিয়া। সীমাচলমকে একান্তে ডেকে বলে, 'আজ রাত আটটার সময় দেখা করবেন আমার সঙ্গে একবার। আমার ঘরেই চলে যাবেন, না থাক, আমিই ডেকে নিয়ে যাবো আপনাকে।'

থাকিন মিয়া বেরিয়ে যাবার পরে মুখোমুখি দাঁড়ায় সর্দার আর সীমাচলম, 'সর্দার, কাল থেকেই কাজ শুরু হবে তোমার। এতদিন আমরা জন্তুর মতন জীবনযাপন করেছি। খেয়েছি, শুয়েছি আর প্রভুর পায়ের তলায় ল্যাজ নেড়েছি। সারাজীবনের এই পাঁক গা থেকে ধুয়ে ফেলতে হবে সর্দার। মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে আমাদের।'

'সত্যি সত্যি মজুরদের অবস্থা ভালো হবে বাবু?' আশায় চক চক করে ওঠে সর্দারের চোখ।

'নিশ্চয় তাতে আর সন্দেহ আছে!'

'আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, সব কথা বুঝে উঠতে পারি না, কিন্তু যে কাজ আপনারা বলবেন, প্রাণ দিয়ে তা করবো।'

সর্দারের কাঁধে হাত রাখে সীমাচলম, 'তা জানি সর্দার।'

রাত আটটা বাজতেই সীমাচলমের দরজায় এসে দাঁড়ায় থাকিন মিয়া। ঘুটঘুটে অন্ধকার। থাকিন মিয়ার হাতের টর্চের আলোয় ফটক পার হয়ে রাস্তা থেকে নেমে ঢালু জমির পাড় বেয়ে আগাছার জঙ্গলে ঢোকে দুজনে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকে, দু'একটা কুকুরের চিৎকার আসে।

সামনে প্রকাণ্ড পোড়ো বাড়ি একটা। এক সময়ে বোধ হয় কোন ধনী ব্যক্তির বাগানবাড়ি ছিল। ফুল গাছের চিহ্ন রয়েছে দু-এক জায়গায়। আশেপাশে বুনো গাছের ঝোপ। কোথাও বোধ হয় চাঁপা ফুটেছে ধারে কাছে। উগ্র একটা গন্ধ ভেসে আসে।

বাগান পার হয়ে কোণের একতলা একটা ঘরের সামনে দাঁড়ায় দু'জনে। বোধ হয় চাকর খানসামার ঘর ছিলো এটা। চারদিকে পাকুড় আর অশ্বত্থের ডালে আরও যেন অন্ধকার এদিকটা। নিচু হয়ে তালাটা খুলে ফেলে থাকিন মিয়া। অন্ধকার ঘর। টর্চের আলোয় এগিয়ে যায় সীমাচলম। ভেতরে ঢুকে একটা মোমবাতি জ্বালায় থাকিন মিয়া। অপরিসর ঘর। মাকড়সার জালে সমস্ত দেয়াল আচ্ছন্ন। কোণে কোণে চামচিকা ঝোলে কয়েকটা।

নিচু কয়েকটা কাঠের টুল পাতা। মনে হয় মাঝে মাঝে দু'একজনের সমাগম এখানে হয়। থাকিন মিয়ার নির্দেশে একটা টুলে বসে পড়ে সীমাচলম। সামনাসামনি আর একটা টুল পেতে বসে থাকিন মিয়া। সীমাচলমের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বলে, 'আপনি টাউনজীতে ছিলেন কিছুদিন ?'

চমকে ওঠে সীমাচলম। এ যে ঠিক প্রশ্ন নয় সেটুকু বুঝতে পারে।

'আকিয়াবেও ছিলেন, কেমন না ?'

'হ্যাঁ, কাজের জন্য বর্মার নানা জায়গায় ঘুরতে হয়েছে আমাকে।'

'কিন্তু ভেতরে অন্য একটা জিনিস রয়েছে আপনার, যেটা মাঝে মাঝে আপনার সমস্ত সঙ্কল্প উদ্যম ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে। দোটানার মধ্যে পড়েই মুশকিল হয়েছে আপনার।'

সীমাচলমের সম্বন্ধে এর চেয়ে নিখুঁত বিশ্লেষণ বোধ হয় সম্ভব নয়। ওর আগুন মাঝে মাঝে স্তিমিত হয়ে আসে অন্য কিছুর তাগিদে। ঘর বাঁধার হাতছানি ঘর ভাঙার মন্ত্র ভুলিয়ে দেয়।

'কিন্তু সবকিছু দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলেছি এবার। এই পথই আমার পথ।'

'তা জানি। টাউনজী থেকে চিঠি পেয়েছি। আপনার অনেক খবর তাতে আছে, অবশ্য এর আগেও কিছু কিছু জানতাম।'

চুপ করে বসে থাকে সীমাচলম। দূরে কোথাও তক্ষক ডাকছে। একটানা কর্কশ আওয়াজ।

'আমাকে আপনারা সম্পূর্ণভাবে আপনাদের দলে নিন। এবারে আর পিছিয়ে আসার কারণ ঘটবে না। যাকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলাম, সে-ই সরে গেছে আপনা থেকে।' কাতরোক্তির মতন শোনায় সীমাচলমের গলা।

'তাই হয়। আমরা ভুলে যাই আমরা শেওলা, স্থায়ী বাসা বাঁধার স্বপ্ন দেখাও আমাদের পাপ। স্রোতের ধাক্কায় শুধু ঘুরে বেড়ানোই আমাদের কাজ। যাক, আপনাকে এখানে আনার উদ্দেশ্য আপনাকে বলি। আজ মেমিও থেকে আমাদের দলের নেতা এসে পৌঁছবেন। আনতে লোক গিয়েছে তাঁকে। আজকের গুপ্ত সমিতিতে বর্তমান অবস্থায় আমাদের কর্তব্য স্থির করা হবে। আপনাকেও নতুন করে শপথ গ্রহণ করতে হবে। নতুন করেই শুরু হোক আবার, কি বলেন?'

ঘাড় নাড়ে সীমাচলম।

মোটরের আওয়াজ। দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ। কারা শুকনো পাতা মাড়িয়ে এগিয়ে আসে। থাকিন মিয়া ফুঁ দিয়ে বাতিটা নিভিয়ে দেয়। জমাট অন্ধকারে ভরে যায় ঘরটা।

দরজায় মৃদু কয়েকটা টোকা। দরজা খুলে দেয় থাকিন মিয়া। তিনজন ভিতরে এসে ঢোকে। টর্চের আলোয় ভালো করে দেখা যায় না তাদের। বাতিটা আবার জ্বালে। সীমাচলম চেয়ে দেখে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত থর থর করে কেঁপে ওঠে। দেয়ালে হেলান দিয়ে টাল সামলে নেয়।

আপাদমস্তক মিলিটারী পোশাকে ঢাকা। কিন্তু আ ঠুনকে চিনতে মোটেই দেরী হয় না সীমাচলমের। এগিয়ে গিয়ে আ ঠুনের হাত জড়িয়ে ধরে। আবেগে তাকে বুকে টেনে নেয় আ ঠুন। কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর

ছেড়ে দিয়ে বলে, 'তুমি ফিরে আসবে আমি জানতাম। এ আগুনে ঝাঁপ দিলে আর নিস্তার নেই। সারাজীবন পুড়তে হবে।'

টুলের ওপর বসে পড়ে আ ঠুন। পাশে সামরিক পোশাকে আর দুটি ভদ্রলোক। প্রথমে শপথ গ্রহণ শুরু হয়। আ ঠুনের হাতের ওপর হাত রাখে সীমাচলম। চোখ বন্ধ করে দেশমাতৃকার ঐশ্বর্যময়ী রূপ কল্পনা করতে হয়। তারপর আত্মনিবেদন। নিজের সমস্ত সত্তাকে বিলিয়ে দিতে হয় দেশের পায়ে।

খুব আস্তে বলতে শুরু করে আ ঠুন, 'আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। এই বয়সে ছুটোছুটি করে বেড়াতে আমার খুবই কষ্ট হয়। তা ছাড়া গোলমাল শুরু হওয়ার সঙ্গেই যাতায়াতেরও অসুবিধা হবে প্রচুর। রেল শীঘ্রই বন্ধ হয়ে যাবে। পথঘাটও আমাদের মতন লোকের পক্ষে বেশীদিন খোলা থাকবে না। কাজেই আমার মনে হয় দক্ষিণ বর্মার কাজকর্ম তোমাদেরই চালাতে হবে। অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া আমার হয়ত আসা সম্ভব হবে না। কিছুদিন পরে পুলিশের ধরপাকড় শুরু হবে। খুব সাবধানে গা ঢাকা দিয়ে কাজকর্ম চালাতে হবে। লাসিওতে ওদের অনেক মালমশলা আমাদের হাতে এসেছে। তাই নিয়ে জোর হৈ-চৈ আরম্ভ হবে। আমাদের মধ্যে যারা জাপানীদের সঙ্গে রয়েছে, তাদের খোঁজ-খবর পাচ্ছি। ভালোই আছে তারা। আকিয়াব আর বেসিনে লোক পাঠিয়েছি। তারাও ভেতরে ভেতরে কাজ চালাবে।'

কাছাকাছি একটা বোমা ফাটার শব্দ হয়। কিন্তু না, ভয়ের কিছু নেই। গুঁড়ি মেরে বাইরে দেখে আসে একজন। মিলিটারী গাড়ীর টায়ার ফেটেছে তারই আওয়াজ।

'আর কয়েকদিনের মধ্যেই আসল কাজ শুরু হবে। আমার নির্দেশ ঠিক সময়ে পাবে তোমরা। তার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। উঠি আজ।'

বাইরে বেরিয়ে আসে অা ঠুন। রাস্তার ওপরেই কালো রংয়ের বিরাট গাড়ি অপেক্ষা করছে। একপাশে মিলিটারী লরী মেরামত হচ্ছে। গাড়িতে ওঠবার আগে এগিয়ে যায় অা ঠুন। নিখুঁত ফিরিঙ্গী ঢঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, 'What's up ?'

গাড়ির পাশ থেকে দুজন সৈন্য দাঁড়িয়ে ওঠে সোজা হয়ে। সশব্দে সেলাম ঠোকে। আড়চোখে চেয়ে দেখে মেজরের পোশাকের দিকে। এত রাত্রে অবশ্য বাইরে বেরোবার নিয়ম নেই। কিন্তু একটু এদিক-সেদিক না যেতে পারলে ভালো লাগে না একঘেয়ে জীবন! চুরুট জ্বালিয়ে গম্ভীর মুখে গাড়িতে গিয়ে ওঠে অা ঠুন। যাক, অস্ত্রের ওপর দিয়ে মিটে যায় ব্যাপারটা। দুজনেই পকেট থেকে চ্যাপ্টা বোতল বের করে মুখে ঢেলে দেয়। আঃ এই না হলে জীবন। ঠিক হ্যায়।

ঝোপের পাশে সীমাচলমের হাতটা শক্ত করে ধরে থাকিন মিয়া। ফিস ফিস করে বলে, 'উঃ, ভাবা যায় এইসব পশুরা শাসন করছে আমাদের!'

এধার দিয়ে বেরোয় না ওরা। ঘুরে ঘুরে বাড়ির পিছন দিকের মরিয়ম বাগানের মধ্যে ঢোকে। কাঁটাগাছের ঝোপ। সাবধানে পা ফেলতে হয়। দূরে সাদা সাদা কি দেখা যায়। আঙুল দিয়ে দেখায় সীমাচলম, 'ওগুলো কি বলুন তো? এবড়ো-খেবড়ো জমির ওপর সাদা সাদা কি সব দেখা যাচ্ছে।'

'কবরস্থান। আসুন, এপাশে রাস্তা।'

মেটে রাস্তা ধরে সেবাকেন্দ্রের পাশে এসে দাঁড়ায় দুজনে। বাতাবিনেবুর ঝাড়ের নিচে কারা বসে আছে। কাছে যেতেই স্পষ্ট দেখা যায়। সর্দারের কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে রাংগাম্মা। চোখ দুটো বন্ধ। ঘুমোয় কিনা বোঝা যায় না। গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে গুন গুন করে গান গায় সর্দার। ঘুমপাড়ানী গান বোধ হয়। ওরা কাছে আসতেও চোখ চায় না কেউ।

সীমাচলমের যখন ঘুম ভাঙে, তখন সর্দারের পোশাকপরা শেষ হয়ে গিয়েছে। তার সাজপোশাকের আড়ম্বর দেখে অবাক হয়ে যায় সীমাচলম। হলদে কোঁচকানো পাগড়ি মাথায়। বড় ঘড়িটা রূপোর চেন দিয়ে ঝোলানো বুকে। গোঁফের প্রান্ত দুটো অনেক কসরৎ করে করে ছুঁচের মতন করে তুলেছে। মুখের ভাবও যথাসম্ভব গম্ভীর।

'আজ কিন্তু সত্যিই তোমাকে দেখাচ্ছে আসল সর্দারের মতন।' একটু লজ্জিত হয়ে পড়ে সর্দার। খুব আস্তে বলে, 'আজ্ঞে মজুরদের কাছে এ বেশে না গেলে কি মান থাকে! আমি বাবু জন্ম-সর্দার।'

'নিশ্চয়।' উৎসাহিত করে সীমাচলম, 'তুমি সত্যিকারের সর্দার। সকলের মাথার ওপর উঁচু হয়ে থাকবে তোমার মাথা। অনেকদূর থেকে দেখা যাবে তোমার পাগড়ীর ঝালর।'

বাইরে বেরিয়ে যায় সর্দার। দু'চারজন বাইরে অপেক্ষা করছে ওর জন্য। অনেকবার ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে চায়। এত সকালে কি আর উঠেছে রাংগাম্মা? তবু আশা ছাড়ে না। অনেকদূর পর্যন্ত চেয়ে চেয়ে দেখে।

একটু বেলা হ'তেই থাকিন মিয়া এসে দাঁড়ায়, 'আসুন। বাইরে যেতে হবে একটু।'

রাংগাম্মাকে যুদ্ধের গল্প বলছিলো সীমাচলম। এ যুদ্ধ নয়। যে যুদ্ধ রথে চড়ে তীর-ধনুক নিয়ে হতো। পুরনারীরা নিজের হাতে সাজিয়ে দিতো পুরুষদের। প্রয়োজন হলে মাথার চুল কেটে ধনুকের ছিলা তৈরী করে দিতো, নিজেরাও ঘোড়া ছুটিয়ে আসতো ভয়ঙ্কর লড়াইয়ের মাঝখানে। চোখ দুটো বড় বড় করে শোনে রাংগাম্মা। চোখের পলক পড়ে না।

'তোমার এইরকম যুদ্ধে যেতে ইচ্ছা হয় না রাংগাম্মা, সাদা তেজী ঘোড়ার পিঠে চড়ে, হাতে ঝকঝকে বল্লম নিয়ে?'

ফ্যাকাশে হয়ে আসে রাংগাম্মার মুখ। কুঁকড়ে যেন ছোট হয়ে যায়। মাথাটা নাড়ে এদিক থেকে ওদিক, আস্তে আস্তে বলে, 'না, না, ওসব ভাল লাগে না আমার। হৈ-চৈ আমার মোটেই ভাল লাগে না। তার চেয়ে সবাই সুখে থাকুক, শান্তিতে থাকুক এই আমি যাই। দিনরাত ঘুরে ঘুরে সংসারের খুঁটিনাটি কাজ করবো, অনেকদূরের নদী থেকে পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে জল আনবো রোজ। এই আমার বেশ ভাল লাগে।'

একদৃষ্টে রাংগাম্মার দিকে চেয়ে থাকে সীমাচলম। চোখ ভরে দেখে ওর কল্যাণী মূর্তি। এই পরিবেশে ওর শান্ত নিরুত্তেজ কথাগুলোয় যেন নেশা লাগে।

থাকিন মিয়ার ডাকের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আবেশ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। বাইরে বেরিয়ে আসে সীমাচলম।

রাস্তার ওপরেই ছোট মোটর একখানা। দরজা খুলে উঠে পড়ে থাকিন মিয়া। নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করে সীমাচলম। পিচঢালা রাস্তা পার হ'য়ে পায়ে চলা কাঁচা পথ ধরে মোটর। বড় বড় রবার আর কৃষ্ণচূড়া গাছের সার। কিছুদূর এসে থেমে যায় গাড়ি। দু'জনেই নেমে পড়ে। পথ নেই আর। কচি ঘাস আর লজ্জাবতী লতা মাড়িয়ে চলা শুরু। সামনে নিচু পাহাড়। আরাকান ইয়মারই বিচ্ছিন্ন একটা অংশ। কালো কালো পাথরের ঢিপি আর ইঁটের চূর্ণ স্তূপ। দেখে মনে হয় অনেকদিনের পরিত্যক্ত কেল্লার ভগ্নাবশেষ।

একটু এগোতেই ছোকরা গোছের বর্মী এগিয়ে আসে। অভিবাদন করে লোহার কপাটটা খুলে দেয়। জীর্ণ কপাট, মনে হয় জোরে একটা ধাক্কা দিলেই খুলে পড়ে যাবে। কিন্তু কাছে গিয়ে তার দৃঢ়তা উপলব্ধি করে সীমাচলম। আগাগোড়া নিরেট লোহায় তৈরী। অপরিসর সুড়ঙ্গ। দেয়াল ধরে ধরে সাবধানে নামে দুজনে। একটু এগিয়েই ফাঁকা জায়গা। শুকনো

কুয়ো বলে মনে হয়। বিরাট আয়তন। টর্চের আলোয় নিচু হয়ে দেখে সীমাচলম। বন্দুক, পিস্তল আর বারুদ গাদা করা। ঠাস বোঝাই মুখ পর্যন্ত। বিরাট এক অস্ত্রাগার।

মুখ তুলে চাইতেই হাসে থাকিন মিয়া, 'আমাদের বহু বছরের সঞ্চিত সম্পত্তি। অনেক কষ্টের জিনিস। ভারতবর্ষ, চীন আর বিদেশ থেকে আহরিত হয়েছে সমস্ত। কয়েক পুরুষ ধরে এই আহরণ চলে এসেছে। চীন সীমান্ত থেকে আপনার পাঠানো জিনিসও গচ্ছিত আছে এইখানে। থারাওয়াডি বিদ্রোহের সময় চমকে গিয়েছিল ইংরাজেরা বন্দুকের আমদানী দেখে। সমস্ত এখান থেকেই জোগানো হয়েছিল। আপনাকে এ অস্ত্রাগার দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধু এইটুকু যে প্রাণ দিয়েও এ জিনিস আপনি রক্ষা করবেন।'

'আপনি?'

ম্লান হাসে থাকিন মিয়া, 'আমার কথা কি বলা যায়! আজ বাইরে আছি, কালই হয়ত প্রভুদের নজরে পড়ে যাবো। যাই কিছু হোক না কেন আমার, এ জিনিসের ভার আপনাকেই নিতে হবে। আমার নিজের একটা অদ্ভুত বিশ্বাস যে, ভারতীয়েরাই এ কাজের সবচেয়ে উপযুক্ত। আপনাদের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ব্যাপার আমার একেবারে অজানা নয়। দু'একজন দলের লোক ছুটকে-ছাটকে এখানেও কাটিয়ে গেছেন কয়েকবছর।'

'কিন্তু এত সব অস্ত্র কিভাবে রক্ষা করবো বলুন তো?'

'লোক আছে আমার, লরীও অছে। সময়ে সবই পাবেন। আপনি শুধু এইটুকু দেখবেন বে-হাতে না গিয়ে পড়ে এসব। তাহলেই সর্বনাশ। সমস্ত সাধনা, শুধু আপনার আমার নয়, বহু পুরুষের সাধনা ব্যর্থ হয়ে যাবে। যে রকম করেই হোক শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবেন এসব।

কথা দিন আপনি।' সীমাচলমের একটা হাত জড়িয়ে ধরে থাকিন মিয়া।

থাকিন মিয়াকে এত বিচলিত হতে কোনদিন দেখেনি সীমাচলম। ওর হাতটা চেপে ধরে আস্তে উত্তর দেয়, 'নিশ্চিন্ত থাকুন আপনি। আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব আমি করবো।'

চোখ দুটো বুজে আসে থাকিন মিয়ার। বিড় বিড় করে বলে, 'আমরা জয়ী হবো। মন বলছে নিশ্চয় জয়ী হবো আমরা। আর দেরী নেই।'

নতুন কাজে আনন্দ পায় সর্দার। রোজই ভোরের দিকে বেরিয়ে পড়ে সেজেগুজে, ফিরে আসতে মাঝে মাঝে বেশ রাতও হয়। থাকিন মিয়া আর সীমাচলমের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে সলা-পরামর্শ হয় রাত পর্যন্ত। কুলিদের ব্যারাকে ব্যারাকে ঘুরছে সর্দার।

প্রথম প্রথম অনেকেই আমল দেয়নি, কিন্তু একটু একটু করে তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছে কয়েকজন। সত্যিই যদি অবস্থা ফিরে যায় তো মন্দ কি? কি সম্পর্ক ওদের ইংরাজদের সঙ্গে? আলো নেই, বাতাস নেই, এই তো খুপরি ঘর। প্রাণান্ত পরিশ্রম। দুবেলার রুটিরও সংস্থান হয় না। তার চেয়ে নিজের রাজ হোক না। ফিরিয়ে দিক ওদের অবস্থা। দু'হাত তুলে জয়ধ্বনি করবে তাদের।

কয়েকজন কিন্তু বেঁকে দাঁড়িয়েছে। তাদের পিছনে লোক আছে একদল। তারা দল বেঁধে আসে নিশান নিয়ে। বলে, 'এই যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধ, মজুরদের যুদ্ধ, সহজ মানুষের যুদ্ধ। এই যুদ্ধ চালানোয় ক্ষতি হয়, এমন কোন কাজ করা উচিত নয়। যুদ্ধজয়ের পরে অবস্থা ফিরে যাবে সবাইয়ের। ইংরাজ রাশিয়া এক হয়ে জার্মানী আর জাপানকে ছিন্নভিন্ন করে দেবে। মজদুর ভাই এক হও।'

কিন্তু সবাই বিশ্বাস করেনি এদের কথায়। এই দলের দু'একটা চাঁইকে মিলের সাহেব মালিকের ঘরে বসে অনেকক্ষণ আলাপ করতে দেখেছে মজুরেরা। পিঠ চাপড়ে হেসে হেসে কিসের কথা এত? ওদের কোন কথা শুনব না। মাইনে বাড়াতেই হবে। একে তো বোমাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্ধেক কারখানা খালি হয়ে গেছে, ডবল কাজ করতে হচ্ছে সবাইকে। তার ওপর জিনিসপত্রের দাম যেন আগুন।

মুখ টিপে টিপে হাসে সর্দার। বলে, 'আজ্ঞে, ওদের মধ্যে বড় হলুম, ওদের চরিয়ে খেলুম জীবনের এতটা সময়, আর কিসে ওরা ভোলে তা আর জানবো না? দেখবেন আপনি দিনকয়েকের মধ্যে ক্ষেপে উঠবে ওরা। দুবার বোমা পড়েছে, আর কয়েকবার পড়লেই, ব্যস, আর দেখতে হবে না।' আত্মবিশ্বাসে উজ্জ্বল দেখায় সর্দারের চোখ। দ্বিতীয় দিন বোমাপড়ার সময় কারখানায় ছিল সর্দার। হুড়মুড় করে সবাই শেল্টারে ঢুকেছিল। ছোটসাহেব, বড়সাহেব আরো অনেকে। বড়সাহেবের একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল সর্দার। যারা ভয় দেখায় তারা ভয় পেলে ভারি ভাল লাগে।

সেদিন খবরের কাগজটা সামনে প্রসারিত করে চুপচাপ বসে ছিল সীমাচলম। সত্যি খবর একটাও ছাপায় না এরা। হংকং ছেড়ে দিতে হয়েছে, মালয়ের ইপেও হাতছাড়া হয়েছে, বোমাবর্ষণ চলেছে সিংগাপুরে, ম্যানিলাও ওদের হাতে, মাগুই অঞ্চলে ঢুকে পড়েছে জাপানী সৈন্য—এসব কোন খবর নেই। কেবল প্রচুর আশ্বাসবাণী আর খসড়া অনুযায়ী সামরিক পশ্চাদপসরণের ঘৃণ্য কাহিনী। আসল খবর পাওয়া যায় রাত্রে থাকিন মিয়া আর লিয়ংয়ের কাছে। কোথা থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে আনে ওরা। নির্ভুল সংবাদ।

ইরাবতী

হঠাৎ সাইরেনের আর্তনাদ। অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে এসেছে সীমাচলম। তবুও বুকের মধ্যে কেমন করে ওঠে। অশরীরী ভয়াতুর চিৎকার। এবারে অনেকক্ষণ ধরে চলে বোমাবর্ষণ। জানলা খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পায় জাপানীদের রুপোলী ছোট ছোট প্লেনগুলো। প্রথমে চিলের মত পাক খায় আকাশে, তারপর ঘুরতে ঘুরতে এক সময়ে চোঁ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকারের ওপর। নীল বিদ্যুৎ ঝিলিক। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ-ফাটানো গর্জন।

প্রায় এক যুগ বলে মনে হয়। তারপর অল ক্লিয়ার। লোকজনের কোলাহল। দ্রুতবেগে সৈন্যবোঝাই জীপ গাড়িগুলো এদিকে-ওদিকে ছোটাছুটি করে। আলোচনা চলে সেবাকেন্দ্রে। খুঁজে খুঁজে রাংগাম্মাকে বের করে সীমাচলম। ঘামে ভিজে গেছে সমস্ত কপাল। ঠোঁট দুটো কাঁপে থর থর করে।

'আজ অনেকক্ষণ ধরে হয়েছে।'

'হ্যাঁ, ভয় করছে তোমার?'

কোন উত্তর দেয় না রাগাম্মা। নীল হয়ে যায় সারা মুখ। বিবর্ণমুখে আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বলে, 'বাবা বাইরে রয়েছে।'

'ভয় কি, তোমার বাবা নিশ্চয় শেল্টারে চলে গেছে। সেখানে ভয় নেই।'

ছোট সাদা গাড়ি একটা ফটকে এসে দাঁড়ায়। থাকিন মিয়া নেমে আসে গাড়ি থেকে। গেটের কাছে দাঁড়িয়েই ডাকে সীমাচলমকে, 'একটু চলুন তো আমার সঙ্গে।' গাড়িতে উঠে বসে সীমাচলম। নিজে স্টিয়ারিংয়ে বসে থাকিন মিয়া, 'আলোনে বোমা পড়েছে আজ। কাঠের মিলগুলোয় আগুন লেগে গেছে। ওই দেখুন।'

পিছনের দিকে চেয়ে দেখে সীমাচলম। ওদিকের আকাশটা লাল

হয়ে উঠেছে। অনেকগুলো মিলে আগুন ধরে গেছে বোধ হয়। ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠেছে। মাঝে মাঝে আগুনের লকলকে শিখাগুলোও দেখা যায়। জঞ্জাল পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, বিদেশী আবর্জনা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। খুশি হয়ে ওঠে সীমাচলম, তারপরেই বিবর্ণ হয়ে আসে ওর মুখ। সর্দার আর অন্য লোকগুলোর কি হয়েছে কে জানে! ওই মিলগুলোর কাছাকাছিই তো থাকবার কথা তাদের। কথাটা থাকিন মিয়াকেও বলে সীমাচলম। থাকিন মিয়াকেও খুব চিন্তিত মনে হয়, 'সেইজন্যই ডাকলুম আপনাকে। আমাদের প্রায় জন পনেরো লোককে ওই সব জায়গাতেই পাঠানো হয়েছে।'

আর কোন কথা হয় না। কমে আসে গাড়ির গতি। সরীসৃপের মত আঁকাবাঁকা গতিতে অবিশ্রান্ত চলে জনতার স্রোত। শহর ছেড়ে সবাই চলে যেতে চায়। মোটর, গরুরগাড়ি নানা রকমের যানবাহনে ঠাস বোঝাই।

শহরের রাস্তায় গাড়ি চালানো অসম্ভব। গিসগিস করে লোক। মোড় ঘুরিয়ে সরু রাস্তায় গাড়ি ঘোরায়। সামনে কাঠের মিলে তখনও আগুন জ্বলছে, তবে অনেকটা নিস্তেজ। দমকলের লোক আর পুলিশের লোক ঘিরে ফেলেছে জায়গা। গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে একটু এগিয়ে যেতেই দেখা মেলে সর্দারের।

ঠিক মিলের দরজাতেই। মাথায় কুঁচি দেওয়া প্রকাণ্ড পাগড়ী। নীল রংয়ের জামা আর সাদা ধবধবে ধুতি পরনে। প্রসারিত দুটি হাত। ডান হাতে দৃঢ়ভাবে একটা কাগজ ধরা। পরনের পোশাকের জায়গায় জায়গায় রক্তের দাগ। কপালের পাশে ছোট একটি ফুটো। রক্তের স্রোত গালের পাশ দিয়ে পিচঢালা পথের ওপর গড়িয়ে পড়ে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে থাকিন মিয়া। রাস্তার ওপরেই বসে পড়ে

সীমাচলম। মাথা ঝিমঝিম করে, সামনের সবকিছু কালো তুলির টানে কে যেন মুছে দেয়।

পুলিশের কাছ থেকে লাস পাওয়া যায় না। মর্গে চালান করে দেওয়া হবে। সেখান থেকে প্রমাণ দিয়ে ছাড়িয়ে নিতে হবে লাস।

সীটে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে থাকে সীমাচলম। সর্দারের মৃত্যুর জন্য একমাত্র ও-ই দায়ী, একথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গেই গলার মধ্যে কান্না তালগোল পাকিয়ে ওঠে। কি করে দাঁড়াবে রাংগাম্মার সামনে? কি বলবে তাকে? উত্তর খুঁজে পায় না সীমাচলম। দেবার মত কৈফিয়ৎ কিছু নেই। রুমালটা মুখে গুঁজে দেয় সীমাচলম। সমস্ত ব্যাপারটা ঘোলাটে দুঃস্বপ্নের মত মনে হয়।

মর্গ থেকে লাস বের করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। দু'একজন চেনা ডাক্তার জুটে যায়, তারাই বন্দোবস্ত করে দেয়। বেঞ্চে বসে বসে ভাবে সীমাচলম। কালকের সর্দার, আজকের লাস। মুঠোর মধ্যে যে কাগজটা ধরা ছিলো সর্দারের, ডাক্তার ফেরত দেয় সেটা। খুলে দেখে থাকিন মিয়া। ঝুঁকে পড়ে সীমাচলমও চোখ বুলায়। ধর্মঘটের খসড়া। মজুরদের কতকগুলো দাবী। মজুরদের দাবী মানতে হবে। যাদের বুকের জোরে ঘোরে মিলের চাকা, তাদের কথা শুনতেই হবে। দাবী পেশ করতে পারেনি সর্দার। তার আগেই ডাক এসে গেছে তার অন্য জগতে।

রাজী হয় না সীমাচলম। মৃদু গলায় বলে, 'আমাকে মাপ করবেন, আমি বরং লাস আগলে বসে আছি। আপনি খবর দিন রাংগাম্মাকে। আমি তার সামনে দাঁড়াতে পারবো না।'

অনেকক্ষণ কাটে। অন্ততঃ সীমাচলমের তাই মনে হয়। বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। নিশ্চুপ প্রাণহীন শহর। ছোট ছোট ছেলেরাও মাঝে মাঝে পাংশুমুখ তুলে চায় আকাশের দিকে। হাসপাতালের মধ্য থেকে কাতরোক্তি

ভেসে আসে। এত দেরী করছে কেন থাকিন মিয়া? সীমাচলম সিঁড়ি দিয়ে বাগানের দিকে নেমে আসে। খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে চায়।

সামনে ডাক্তার আর নার্সদের কোয়ার্টার। প্রকাণ্ড একটা বাদাম গাছের তলায় অনেকখানি জুড়ে ছায়ার আঁচড়। সেখানে বসে সীমাচলম। এখান থেকে ফটকের দিকে দৃষ্টি রাখা চলবে।

একটু বসেই কিন্তু খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে সীমাচলম। সামনের কোয়ার্টারের অপ্রশস্ত লনে ঘুরে বেড়ায় একটি মেয়ে। গাছের নিচু ডালে ঝোলানো জামাকাপড়গুলো তোলে একটা একটা করে। হাত দিয়ে দিয়ে দেখে। ভিজে থাকলে রোদের দিকে টেনে দেয়। বেড়ার ধারে আসতেই ঝুঁকে পড়ে সীমাচলম। আস্তে আস্তে ডাকে, 'হামিদা, হামিদা।'

থমকে দাঁড়ায় হামিদা। হাতের কাপড়গুলো পড়ে যায় মাটিতে। নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করে, কিন্তু কি ভেবে আবার ফিরে দাঁড়ায়।

অনেক কৃশ হয়ে গেছে। দুটি চোখে অবসাদের ভাব। কিন্তু তেমনি মিষ্টি হাসি। চমৎকার দুটি টোল দুটি গালে।

'কেমন আছো? ইস্ কি চেহারা হয়েছে!' গলা কাঁপে হামিদার। হেসে ফেলে সীমাচলম।

'চেহারা? বেঁচে আছি এইটাই মস্ত বড়ো কথা। চারদিকে যা শুরু হয়েছে!'

'আমাকে কেন ছেড়ে এলে হামিদা?'

মুখ নিচু করে পায়ের নখ খোঁটে হামিদা। আস্তে আস্তে বলে, 'তুমি কত বড় হবে সীমাচলম। স্বাধীন বর্মার লোকেরা কত ভক্তিতে তোমার নাম উচ্চারণ করবে। তুমি দেবতার সামিল হবে তাদের চোখে। দেশের জয়যাত্রার তুমি হবে অগ্রদূত।'

কিন্তু সীমাচলম জোর পায় না মনের মধ্যে। সর্দার কেন মারা যাবে জাপানীদের গুলিতে? এই নাকি পুরস্কার স্বাধীনতার সৈনিকের? সব কথা বলে হামিদাকে। প্রথম থেকে শুরু করে সমস্ত ঘটনা। সর্দার আর রাংগাম্মার কথা। সেবাকেন্দ্রের কথা।

'কিন্তু এত অল্পতেই টলবে তুমি? আশেপাশের কত লোক মারা যাবে, ঠিক আছে তার? তুমি ভারতবর্ষের লোক, তোমাকে আর বেশী কি বোঝাবো? দেশের দেবতার মত একচোখো দেবতা আর নেই। সব ঢেলে দিলে তবে তাঁর দয়া পাওয়া যায়, জানো তো? কত হাজার সর্দার তলিয়ে যাবে। তুমি আমি কেউই হয়ত থাকবো না। তবু যারা থাকবে, যত মুষ্টিমেয়ই হোক, মানুষের মতন মাথা উঁচু করে থাকবে।

অনেকক্ষণ কোন কথা হয় না। বোঝে সীমাচলম। হামিদাকে ফিরে পাওয়া যাবে না আর। ওর পাশে এসে দাঁড়ানো সম্পূর্ণ অসম্ভব। ধূসর যাযাবর জীবনযাত্রার পরিবেশের মধ্যে কোথায় আসবে হামিদা?

'বেশ। তোমাকে পাশে ডাকবার চেষ্টা আমি করবো না, কারণ যে অপরিসর পথের ওপর দিয়ে আমি ছুটে চলেছি, সেখানে তোমার পা রাখবার জায়গা হবে না। মাঝে মাঝে তোমার সঙ্গে দেখা করার আশাও কি আমি করতে পারি না?'

ম্লান হাসে হামিদা, 'আমি এখানে ডাক্তার হলের ছোট ছেলের দেখা-শোনা করি। এক কথায় ঝি। সব সময়ে দেখাশোনার সুবিধা নাও হ'তে পারে। তবে এই সময়ে একটু অবসর পাই। খুব প্রয়োজন থাকলে এই সময়ে আসতে পারো।'

খুব প্রয়োজন থাকলে? কথাটা মনে মনে বার বার উচ্চারণ করে সীমাচলম। হামিদা কি পাথরের তৈরী? বুকের স্পন্দন নেই ওর? সহজ মানুষের মত ব্যথা-বেদনা, সুখ-দুঃখ কিছুই কি ছোঁয় না ওকে?

'তোমার গয়নার বাক্সটা রয়েছে আমার কাছে। কাল এই সময় দিয়ে যাবো।'

হাসে হামিদা, 'নিয়ে আসবার হ'লে আমিই তো নিয়ে আসতে পারতাম সঙ্গে করে। ওটা থাক তোমার কাছে। সময়ে অসময়ে দরকার লাগতে পারে।'

'যার জিনিস সে রইলো দূরে, তার জিনিস ছোঁবো আমি কি অধিকারে বলতে পারো ?'

এগিয়ে আসে হামিদা। আরক্তিম দুটি গাল। একটা সলজ্জ ভাব সারা মুখে, 'তোমার কাছ থেকে আমি দূরে নেই সীমাচলম : আমি শুধু তোমার পথ থেকে সরে এসেছি। তোমার কাজের বাধা আমি হতে চাইনি। প্রতি অনু-পরমাণুতে আমি মিশে আছি তোমার সঙ্গে। দেখা তোমার সঙ্গে আমার হবেই, সেদিন কেউ সরাতে পারবে না আমাদের। তোমার কাচ থেকে সরে থাকতে আমার কষ্ট হয় না ?'

উত্তর দিতে গিয়েই থেমে যায় সীমাচলম। গেটের ভিতরে ঢোকে থাকিন মিয়া, পিছনে রাংগাম্মাকে নিয়ে আর কয়েকটি মেয়ে।

'চলি হামিদা, পারি তো কাল আসবো।'

এগিয়ে যায় সীমাচলম। চাইতে পারে না রাংগাম্মার দিকে। কান খাড়া করে শুধু শুনতে চেষ্টা করে তার উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন কিম্বা গুমরে গুমরে বুকফাটা আর্তনাদ। কিন্তু আশ্চর্যভাবে শান্ত হয়ে থাকে রাংগাম্মা। চাপা কান্না তো নয়ই, সামান্য ফোঁপানি পর্যন্ত নয়। চোখ দুটো শুধু জ্বলে ঝকঝক করে। সে আগুনেই বুঝি শুকিয়ে যায় চোখের সমস্ত জল।

পরের দিন থাকিন মিয়াই তোলে কথাটা, 'ওই মেয়েটিই বুঝি হামিদা বানু ?'

একটু থতমত খায় সীমাচলম। তারপর আস্তে আস্তে বলে, 'হ্যাঁ, অনেকদিন পরে দেখা হ'লো।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে থাকিন মিয়া। মুখ ফিরিয়ে এক সময়ে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি মাঝে মাঝে দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসেননি তো ?'

চমকে ওঠে সীমাচলম। শুনেছে নাকি সব কথা ? লুকোচুরি করার কি দরকার ? সত্যি কথাই বলে, 'হ্যাঁ, আজ একবার যাবো কথা দিয়েছি। আজই যাবো, আর যাবো না। ওর গয়নার বাক্সটা দিয়ে আসতে হবে।'

'আমি যাবো আপনার সঙ্গে।' দৃঢ় গলার স্বর থাকিন মিয়ার।

'আপনি ?' বিস্মিত হয় সীমাচলম। রুষ্টও যে একটু হয়, তা ওর গলার ঝাঁজেই বোঝা যায়।

'হ্যাঁ, আমার মনে হয় রাংগাম্মাকে ওঁর কাছে রেখে আসাই ঠিক হবে। শীঘ্রই হয়ত আমাদের পাততাড়ি গুটিয়ে এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে পড়তে হবে। এ সময়ে মেয়েছেলে সঙ্গে থাকলে ভারি অসুবিধা। আপনার পক্ষে হয়ত তাঁকে এ অনুরোধ করা ঠিক হবে না, কাজেই আমি নিজে যাবো।'

'কিন্তু হামিদা তো নিজেই ডাক্তার হলের কাছে পরিচারিকা হিসাবে থাকে, আবার আর একজনের বোঝা তার ঘাড়ে চাপানো কি ঠিক হবে ?'

'দেখি ওঁর সঙ্গে আলাপ করে। যদি ওঁর বিশেষ অসুবিধা হয় তো অন্য বন্দোবস্ত করতে হবে।'

উপায়ান্তর নেই সীমাচলমের। পরের দিন গয়নার বাক্স হাতে নিয়ে থাকিন মিয়ার পিছন পিছন গাড়ীতে গিয়ে ওঠে।

বেড়ার কাছেই দেখা মেলে হামিদার। সীমাচলমের সঙ্গে থাকিন মিয়াকে দেখে থমকে যায় একটু। হাঁটু মুড়ে বসে প্রণাম করে। অঙ্গে গৈরিকবাস থাকিন মিয়ার। এ সম্মান তার প্রাপ্য। উঠে দাঁড়িয়ে সীমাচলমকে বলে, 'হাতে ওটা কি তোমার ?'

গয়নার বাক্সটা হামিদার হাতে তুলে দেয় সীমাচলম, 'তোমার হাতেই তুলে দিলাম।'

হাসে হামিদা, 'একেবারে সাক্ষীসাবুদ জোগাড় করে এনেছো বুঝি, পাছে কোনদিন ফিরিয়ে না দেওয়ার অভিযোগ করি!' আড় নজরে থাকিন মিয়ার দিকে চায়। বিব্রত হয়ে পড়ে সীমাচলম। স্থান-কাল-পাত্র কিছুই কি মানবে না হামিদা ?

ব্যাপারটা তরল করে আনে থাকিন মিয়া, 'খুব দামী জিনিস তৃতীয় ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখে দেবার নজির আমাদের সমাজে অনেককাল ধরেই চলে আসছে।'

মুশকিলে পড়ে যায় সীমাচলম। কিন্তু কথাটা এড়িয়ে যায় হামিদা, 'আপনাদের সেবাকেন্দ্রের সব কথা আমি শুনেছি এঁর কাছে। প্রার্থনা করি আপনারা জয়যুক্ত হন। আপনাদের কোন কাজেই কি আমি লাগতে পারি না ?'

ভ্রূ দুটো কুঞ্চিত হয়ে আসে থাকিন মিয়ার। গলার স্বর তীক্ষ্ণ, 'বর্তমান অবস্থায় মেয়েদের সঙ্গে রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করছি না। যেভাবে জীবন যাপন করতে হবে আমাদের, তা আপনাদের পক্ষে খুব হয়ত সহজ হবে না।'

'আমরা মোটেই কষ্টসহিষ্ণু নই, এই কি আপনাদের ধারণা ?'

'মাপ করবেন, ঠিক এই দিকটা ভাববার সময় পাইনি।' থাকিন মিয়া এড়িয়ে যেতে চায় তর্ক। অযথা নষ্ট করার মত সময় নেই তার হাতে।

'কিন্তু মেয়েদের কাছ থেকে কোন সাহায্য নিতেও কি আপনাদের আপত্তি ? দেশের কাজে যদি আমি কিছু দিই ?'

'মোটেই না। দেশের লোকের কাছে ভিক্ষাপাত্র মেলে ধরেছি আমি। আপনাদের আনুকূল্যই আমাদের সম্বল।'

'তবে দয়া করে সামান্য জিনিসগুলো গ্রহণ করে আমায় কৃতার্থ করুন।'

গয়নার বাক্সটা থাকিন মিয়ার হাতে তুলে দেয় হামিদা। আশ্চর্য হয়ে যায় সীমাচলম। এ কি করলো হামিদা! অন্ততঃ হাজার পাঁচ-ছয় টাকার অলঙ্কার, সমস্ত দিয়ে দিলো থাকিন মিয়াকে! এভাবে কেন রিক্ত করলো নিজেকে? সারাটা জীবন পড়ে রয়েছে সামনে। বলা যায়? অন্ধকার ভবিষ্যতে কত প্রয়োজন হতে পারে অর্থের? এ কি করলো হামিদা?

'আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আমি সীমাচলমকেই অছি নিযুক্ত করলাম। এ সমস্ত অলঙ্কার তাঁর কাছেই থাকবে। সেবাকেন্দ্রের প্রয়োজনে আমি চেয়ে নেবো মাঝে মাঝে।'

হাঁটু মুড়ে আবার প্রণাম করে হামিদা। গয়নার বাক্স হাতে নিয়ে অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে থাকে সীমাচলম। গয়নার বাক্স যে এভাবে ফিরে আসবে ওর হাতে ও এ ধারণা করতে পারেনি।

থাকিন মিয়া বলে, 'এবারে আপনার কাছে একটা অনুরোধ আছে আমাদের।' অবাক হয়ে যায় হামিদা, 'আমার কাছে কি অনুরোধ থাকতে পারে আপনাদের?'

সমস্ত খুলে বলে থাকিন মিয়া। রাংগাম্মার কথা আর তাদের অনির্দিষ্ট জীবনযাত্রার কথা। সবচেয়ে বড় কথা এতগুলো পুরুষ কর্মীর মাঝখানে রাংগাম্মার থাকাটা মোটেই বাঞ্ছনীয় হবে না।

'বুদ্ধের সঙ্ঘে নারী প্রবেশ করে সমস্ত নষ্ট করে দিয়েছিলো, না?' হাসে হামিদা, 'বেশ তো রাংগাম্মা আমার কাছেই থাকবে। তবে কষ্ট স্বীকার করে থাকতে হবে আমার এখানে, ডাক্তার হলের পরিচারিকা হয়ে।'

'আরামে থাকা আর কারুরই চলবে না। ভীষণ দুর্যোগ শুরু হয়েছে, কে কোথায় ছিটকে পড়ে ঠিক আছে? আপনার কথা শুনে নিশ্চিন্ত হলাম। তাহলে কাল এমনি সময়ে নিয়ে আসবো তাকে।'

ঘাড় নেড়ে উত্তর দেয় হামিদা, 'কাল এমনি সময়ে এখানেই সে থাকবে।'

'একটু অপেক্ষা করুন আপনারা। আমি হাসপাতালে কয়েকজনের খোঁজ নিয়ে আসি।' হাসপাতালের দিকে চলে যায় থাকিন মিয়া।

মুচকি হাসে হামিদা, 'তোমার এই বিদ্রোহী সন্ন্যাসীটি কিন্তু লোক খুব ভাল।'

'কেন বলো তো?'

'দেখলে না কেমন একটা ছুতো করে সরে গেলেন এখান থেকে। আমাদের কথা বলবার সুযোগ দিয়ে গেলেন।'

ঘাসের ওপর বসে পড়ে হামিদা। ইঙ্গিতে সীমাচলমকেও বসতে বলে পাশে, 'আবার কবে দেখা হবে জানিনা। তোমার কাজ শুরু হয়ে গেলে হয়ত আমার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হবে না তোমার। কিন্তু যেখানেই তুমি থাকো, নিশ্চয় জেনো আমার সমস্ত কিছু তোমাকে ঘিরে থাকবে। প্রথম সুযোগেই আমি তোমার সঙ্গে মিলিত হবো।'

'সে সুযোগ কবে আসবে হামিদা?'

'কি জানি? তবে আসবে একদিন। দুর্যোগ চিরদিনের নয় সীমাচলম।'

'কিন্তু তোমার দেখা পাবো কি করে হামিদা? কে কোথায় ছিট্‌কে পড়বো ঠিক আছে?'

'কাব্য করে বলবো?' খিল্ খিল্ করে হাসে হামিদা, 'সত্যি যদি মনের মানুষ হই তো পৃথিবী খুঁজে বের করবে আমাকে।'

থাকিন মিয়াকে দেখা যেতেই থেমে যায় হামিদা। সরে বসে সীমাচলম।

'চলুন যাওয়া যাক।'

উঠে পড়ে সীমাচলম। থাকিন মিয়ার অলক্ষিতে তার হাতে মৃদু একটা চাপ দেয় হামিদা। স্পর্শে একটা মাদকতা। রক্তকণিকায় ঝড়ের স্বাদ।

খুব দ্রুত পরিবর্তিত হয় প্রাচ্যের পরিস্থিতি। এত দ্রুত যে তাল রাখতে

হাঁপিয়ে ওঠে সীমাচলম। ট্যাভয় ছেড়ে চলে আসে বৃটিশ। জাপানীরা রাবাউল, নিউগিনি আর সলোমন দ্বীপে নেমে আসে প্যারাস্যুটের সাহায্যে। মাণ্ডু ইও হাতছাড়া হয়ে যায়। বৃটিশ রণতরী একত্রিশ হাজার টন 'বারহাম' ডোবার সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ মর্যাদাও তলিয়ে যায় অতল সমুদ্রে। সৈন্যদের মুখচোখের চেহারাও বদলে যায়। কাছে কোথাও আওয়াজ হলেই চমকে ওঠে। বেড়ায় হেলান দিয়ে চেয়ে থাকে আকাশের দিকে। অনেক দিনের গড়া সাম্রাজ্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না কি ওই খুদে খুদে পীত-বর্বরদের হাতে!

থাকিন মিয়ার ডাকে খবরের কাগজ থেকে মুখ তোলে সীমাচলম।

'এখানকার পালা শেষ হলো এবার। দু'একদিনের মধ্যে এখানকার বাস তুলতে হবে।'

'হঠাৎ?'

'হঠাৎ ঠিক নয়, শুনছি নাকি দেবতাদের সুনজর পড়েছে সেবাকেন্দ্রের ওপর। ধর-পাকড়ের একটা চেষ্টা চলবে। সে সুযোগটা ওদের তো না দেওয়াই ভালো, কি বলেন?'

'কিন্তু যাওয়া যাবে কোথায়? আপনাদের গোপন অস্ত্রাগারেরও বন্দোবস্ত করতে হয় একটা।'

'যাওয়ার ভাবনা নেই বিশেষ। পলাতকদের দৌলতে খালি বাড়ির অভাব নেই। অস্ত্রাগার সরাবার কাজ আজ রাত থেকেই শুরু হবে। বন্দোবস্ত ঠিক আছে, আমাদের গিয়ে দাঁড়াতে হবে একবার।'

সেবাকেন্দ্রের অনেকেই চলে গিয়েছে। জন দশেক শুধু ঘোরাঘুরি করে এদিক-ওদিক। তাদের মধ্যে তিনজন লোক এসে বসে থাকিন মিয়ার কাছে। ফিস ফিস করে কি সব বলে। তারপর থাকিন মিয়াকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তা পার হয়ে জঙ্গলের দিকে চলে যায়।

দেয়ালে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে থাকে সীমাচলম। সামনে প্রসারিত

খবরের কাগজের ওপর মাঝে মাঝে চোখ বোলায়, কিন্তু ছাপার হরফগুলো যেন তালগোল পাকিয়ে ঘোরে চোখের সামনে।

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে নেয় সবাই। বেশ একটু ব্যস্ত ভাব। আজ রাত্রেই তাঁবু গোটাতে হবে। খাওয়া সেরেই থাকিন মিয়ার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে সীমাচলম। পিচঢালা রাস্তা পার হয়ে কাঁচা সড়ক দিয়ে অস্ত্রাগারের সামনে গিয়ে উপস্থিত হয়। অন্ধকার রাত। কোলের মানুষকেও দেখা যায় না। গা ছম ছম করে সীমাচলমের। ঘাসের ওপরে খস খস করে শব্দ হতেই লাফিয়ে চলে আসে থাকিন মিয়ার পাশে।

'কি ব্যাপার ?'

'কি জানি সাপ-টাপ বোধ হয়।'

'ভয় নেই, স্বদেশী সাপ। অনিষ্ট না করলে কামড়াবার রীতি নেই ওদের মধ্যে। ওরা কিন্তু এদের চেয়ে ভালো। এরা ছোবল মারে, বিষ ঢালে, আবার রক্তও শুষে নেয় নিঃশেষে।'

টর্চের আলোয় হাতড়ে হাতড়ে ভগ্নস্তূপের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। বর্মী যুবকটি অভিবাদন করে নিঃশব্দে দরজা খুলে দেয়। অনেকগুলো কালো কালো ছায়া অন্ধকারে। বেঁটে সবল চেহারার জন পাঁচেক লোক।

অস্ত্রাগারের কাছে দাঁড়ায় থাকিন মিয়া। তার নির্দেশে বাইরে এসে দাঁড়ায় সীমাচলম। ঢাকা মোটর দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমে মিলিটারী গাড়ি বলে মনে হয়, কিন্তু কাছে গিয়ে ভাল করে দেখে রেডক্রশের গাড়ি। নিশানও উড়ছে রেডক্রশের। এ গাড়িতেই লোকের চোখে ধূলো দিয়ে জিনিসপত্র সরানো হবে এখান থেকে।

সব শেষ হতে প্রায় ঘণ্টা তিনেক লাগে। তালা দিয়ে বর্মী যুবকটি চাবিটা থাকিন মিয়ার হাতে তুলে দেয়। গাড়িটা অন্ধকারে মিশে যাবার

সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে দাঁড়ায় থাকিন মিয়া, 'যাক মস্ত বড় কাজটা শেষ হলো আজ। আসুন আমরা ফিরি।'

পিচের রাস্তার ওপরেই ছোট মোটর একখানা। চড়ে বসে দু'জনে। কিন্তু গাড়িটা চলতে আরম্ভ করতেই বিস্মিত হয় সীমাচলম, 'এ কি, কোথায় চলেছি আমরা ?'

'ভাগ্যদেবতা যেখানে নিয়ে যাবে।'

'সেবাকেন্দ্রে ফিরবো না আর ?'

'অদৃষ্টে থাকলে ফিরবো একদিন। আর তা যদি না হয়, তবে অনেক বছর পরে সেবাকেন্দ্রের ভাঙা বাড়িগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলাবলি করবে পথচল্‌তি লোকেরা, এইখানে একদল ছন্নছাড়া হতভাগা লোক থাকতো যারা দেশকে শৃঙ্খলমুক্ত করার মন্ত্র নিয়েছিল।'

'কিন্তু আমার জিনিসপত্র যে রয়ে গিয়েছে সেখানে।'

'জিনিসপত্রের মধ্যে গয়নার বাক্স তো ?' মুচকে হাসে থাকিন মিয়া।

'আমার নিজের জিনিস হলে কিছু ছিল না। কিন্তু আপনি তো জানেন, ওসব অন্য লোকের জিনিস। ওগুলো আগলাবার ভার ছিল আমার ওপরে।'

'সে কি, সব ভুলে গেলেন এর মধ্যে ? জিনিসের মালিক সমস্ত কিছু দান করেছেন সেবাকেন্দ্রে। এই সেবাকেন্দ্রের ট্রাস্টি হিসেবে ওগুলো শুধু দেখবার ভার ছিলো আপনার ওপরে।'

'কিন্তু তা বলে অত টাকার জিনিসগুলো ফেলে আসা কি ঠিক হবে ?'

এইবার জোরে হেসে ফেলে থাকিন মিয়া, 'ঠিক আছে, ব্যস্ত হবেন না। আমাদের সঙ্গেই চলেছে জিনিসগুলো। আমরা ঠিক থাকি তো ওগুলোও ঠিক থাকবে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সীমাচলম। ওই অলঙ্কারগুলোর মধ্যে সুপ্ত রয়েছে হামিদা বানুর উত্তপ্ত পরশ, তার অঙ্গের সুরভি।

খুব আস্তে চলে গাড়ি। শামুকের মত গতি। স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে চুপচাপ বসে থাকে থাকিন মিয়া। মাঝে মাঝে টর্চের আলোয় মোটরের ঘড়িটা দেখে। বারোটা বেজে কুড়ি। দুধারে শিরিষ আর দেওদারের সার। নিশাচর বাদুড়েরা কালো পাখা বিছিয়ে দলে দলে উড়ে চলে। চোখ বুজে সীটে হেলান দিয়ে বসে থাকে সীমাচলম। পথের সঙ্গে যেন মিতালি হয়ে গেছে ওর। পথ আর প্রান্তর এরাই ওর সত্যিকারের সঙ্গী। যতবারই খড় আর কুটো দিয়ে ঘর বাঁধবার চেষ্টা করেছে ততবারই দমকা হাওয়ার ঝাপটায় ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে সবকিছু। আবার সেই পথ আর অনুর্বর প্রান্তর।

হঠাৎ একটা ঝাঁকুনিতে চমকে চোখ খুলে দেখে রাস্তা ছেড়ে পাশের ঢালু জমিতে নেমেছে গাড়ি। প্রকাণ্ড একটা রবার গাছের কাছে গাড়ি এসে থেমে যায়।

'কি ব্যাপার ?'

চেয়ে দেখে সীমাচলম, টর্চের আলো ফেলে থাকিন মিয়া একদৃষ্টে চেয়ে আছে ঘড়ির দিকে। পাথরের মূর্তির মত নিস্পন্দ, নিথর। অনেকক্ষণ পলক পড়ে না থাকিন মিয়ার, শুধু অন্ধকারে তার দ্রুত নিঃশ্বাসের শব্দ ভেসে আসে।

আচমকা বিকট আওয়াজে মাটি আর আকাশ চিড় খেয়ে যায়। মোটর থেকে লাফিয়ে মাটির ওপর নেমে পড়ে সীমাচলম। উপুড় হয়ে সটান শুয়ে পড়ে ঘাসের ওপরে। মনে হয় বিরাট রবার গাছের গুঁড়িটাও দুলে ওঠে।

আবার বোমাবর্ষণ শুরু হয়েছে বুঝি। কিন্তু অনেকক্ষণ আর কোন শব্দ হয় না। উঠে বসে সীমাচলম। অস্পষ্ট দেখা যায় থাকিন মিয়ার মূর্তি। বাতাসে ইতস্তত: ওড়ে গৈরিক অঙ্গবাস। দুটি হাত কোমরে সংবদ্ধ।

'উঠে আসুন। রওনা হবো এবার।'

যন্ত্রচালিতের মত গাড়িতে উঠে আসে সীমাচলম। তখনও বুকের মধ্যে দুর দুর করে। কানের পাশে অসংখ্য ঝিঁঝিঁর ডাক।

আস্তে আস্তে কথা ফোটে সীমাচলমের, 'কিসের আওয়াজ বলুন তো? বোমার কি? কিন্তু একবার মাত্র আওয়াজ হলো যে?'

বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চলে গাড়ি। দুপাশের গাছগুলো নক্ষত্রবেগে মিলিয়ে যায়। সরীসৃপের মত পিচঢালা চকচকে পথ চাকার দুরন্ত আবর্তনে সরু ফিতার মত পড়ে থাকে পিছনে।

'বোমা নয়, ডিনামাইট। সেবাকেন্দ্রের পাশে সৈন্যদের ছাউনিটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এতক্ষণে।'

'তাই নাকি? কে করলে এ কাজ?'

হাসে থাকিন মিয়া, 'কি জানি? কতকগুলো লক্ষ্মীছাড়া লোকের কাজ বোধ হয়, যারা দেশকে রাক্ষসের মতন ভালোবাসে, আর কাউকে তার ভাগ দিতে কিছুতেই রাজী হয় না।'

অসম্ভব গতিতে ছোটে মোটর। স্টিয়ারিংয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে থাকিন মিয়া।

ঠাণ্ডা জোলো হাওয়া গায়ে লাগতে জেগে ওঠে সীমাচলম। সীটে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। অন্ধকার ফিকে হয়ে আসে। দু' একটা কাকের ডাক। গাছপালার ওপারে আকাশে মেটে রং। ভোর হ'তে বুঝি দেরী নেই।

পাশের দিকে চেয়ে দেখে সীমাচলম। ঠিক তেমনিভাবে কঠিন হাতে স্টিয়ারিং ধরে আছে থাকিন মিয়া। সারারাতের অনিদ্রায় লাল দুটি চোখ।

'কি ঘুম ভাঙলো?'

লজ্জায় পড়ে সীমাচলম। একটা লোক পাশে বসে সারাটা রাত

মোটর চালিয়ে চলেছে, আর কেমন করে ঘুমাতে পারলো সে নিশ্চিন্ত হ'য়ে এতক্ষণ ধরে? হাত দিয়ে চোখদুটো রগড়ায়, 'হঠাৎ ঘুমটা এসে গিয়েছিলো। আপনার তো সারারাত ভারি কষ্ট হয়েছে?'

কোন উত্তর দেয় না থাকিন মিয়া। আস্তে মোটরের গতি স্তিমিত হয়ে আসে। আর যাবার পথ নেই। সামনে বিস্তীর্ণ ইরাবতী। শীত-কাল হলেও জল নেহাৎ কম নয়। ওপারের ম্লান গাছপালা নজরে আসে। কতকগুলো লোক বসে আছে নদীর ধারে। আগুন পোহাচ্ছে। মাঝখানে শুকনো পাতা দিয়ে আগুন জ্বালানো হয়েছে। চেহারায় কুলি জাতীয় মনে হয়। মোটরের আওয়াজ পেয়ে এগিয়ে আসে জনদুয়েক। উঁকিঝুঁকি দেয় গাড়ির ভিতরে। বইবার মত মালপত্তর তো কিছু দেখা যায় না।

স্টিয়ারিংয়ে আলতোভাবে হাতটা রেখে জিজ্ঞাসা করে থাকিন মিয়া, 'ওহে এখন জোয়ার না ভাঁটা?'

সামনের লোকটা এগিয়ে আসে মোটরের কাছে। নিচু হ'য়ে প্রণাম করে থাকিন মিয়াকে। এক গাল হেসে বলে, 'আজ্ঞে জোয়ার।'

'ঠিক আছে, মোটরটা ঠেলে রাস্তা থেকে নামিয়ে রাখো তাহলে।'

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে লোকটি চিৎকার করে ডাকে দলের অন্য লোকদের। হৈ-হৈ করে উঠে আসে সবাই। ঠেলে ঠেলে মোটরটা ম্যাংচিতা আর ঘেঁটুবনের মধ্যে নিয়ে যায়। শুকনো নারকোল পাতা জড়ো করে ঢেকে দেয় মোটরটা। কয়েক মিনিটের ব্যাপার, কিন্তু এদিক থেকে দেখাই যায় না মোটর। মনে হয় শুকনো পাতার রাশ জড়ো করে রাখা হয়েছে।

'চলুন নৌকা খোঁজ করি একটা।'

থাকিন মিয়া করিৎকর্মা লোক। জলের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায়। দুটো

হাত মুখের পাশে দিয়ে চিৎকার শুরু করে। একবার, দুবার, তিনবার—কোন সাড়া আসে না। বারপাঁচেক চিৎকারের পর ক্ষীণকণ্ঠে অনেকদূর থেকে যেন সাড়া আসে একটা। ছোট ডিঙ্গির মত দেখা যায়। খুব অস্পষ্ট, কিন্তু বোঝা যায় এগিয়ে আসছে।

প্রায় আধঘণ্টা পরে পাড়ে ভিড়ে ডিঙ্গি। ছোকরা বর্মী একটি দাঁড় বাইছে। বছর ষোলো-সতেরো বয়স। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা, মাংসপেশীগুলো ফুলে ফুলে ওঠে একটানা পরিশ্রমে। হাতটা আড়াআড়িভাবে চোখের ওপর রেখে বলে, 'চলে আসুন। এত ভোরে ডবল ভাড়া না দিলে সোয়ারী নেবো না। আমি এককথার মানুষ। ঝামেলা ভালোবাসি না।'

কাদা ভেঙে সাবধানে এগিয়ে যায় থাকিন মিয়া। পিছনে পিছনে বেশ কয়েকবার আছাড় সামলে চলে সীমাচলম। দু'জনে নৌকায় গিয়ে ওঠে। এলেম আছে ছোকরার। বড় বড় ঢেউ বাঁচিয়ে ঠিক ওপারে নিয়ে যায় ডিঙ্গি। মজবুত হাতে দাঁড়ের ঘায়ে ভেঙে দেয় ঢেউয়ের তেজ।

প্রথমে শীতের পাতলা আস্তরণ ভেদ করে বাবলা আর আতা গাছের সার দেখা যায়। অনেক দূরে কালো পাহাড়ের সার। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট পাতার কুঁড়ে।

নৌকাটা পাড়ের কাছে এনে কাদায় লগি পুঁতে দেয়, তারপর কাঠের তক্তা বের করে পেতে দেয় কাদার ওপরে। তক্তার ওপর দিয়ে সাবধানে পা ফেলে এগিয়ে যায় সীমাচলম, তারপরে কাঠের বাক্স মাথায় করে মাঝি, অবশেষে থাকিন মিয়া।

কোমর থেকে গেঁজে বের করে ভাড়া মিটিয়ে দেয় থাকিন মিয়া, তারপর চেয়ে দেখে এদিক-ওদিক। ধারে কাছে কাউকে দেখা যায় না। এত ভোরে কে আর উঠে বসে থাকবে নদীর ধারে!

'বেশ জায়গাটি না?'

সত্যিই জায়গাটি মন্দ নয়। গণ্ড গ্রাম। গ্রামও ঠিক বলা যায় না, কয়েকটা লোকের বসতি মাত্র। কোলাহল নেই, হৈ-হল্লা নেই। আগ্নেয় পরিবেশ থেকে এসে শান্ত আবহাওয়ায় আরাম পায় সীমাচলম। এখনও বুঝি আগুন ছড়ায়নি এখানে। কিন্তু কতদিন আর? ছোট ছোট স্ফুলিঙ্গ ছিটকে এসে পড়বে এদিকে-ওদিকে। ঘরের চালা আর ফসলের ক্ষেত ধিকি ধিকি করে জ্বলে উঠবে সে আগুনে। এদের শান্ত নিরীহ জীবনযাত্রা পুড়ে হয়ত ছাই হয়ে যাবে। সে দিনও আর দূরে নয়।

ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে লোক চলাচল শুরু হয়। নৌকা অনেকগুলো ঘোরাফেরা করে পাড় ঘেঁষে। থাকিন মিয়াকে দেখে এগিয়ে আসে কয়েকটি মেয়ে আর পুরুষ। হাঁটু মুড়ে প্রণাম করে।

'এখানে কোথায় এসেছেন?'

আঙুল তুলে পাহাড়ের কাছ বরাবর দেখায় থাকিন মিয়া, 'ঐ প্যাগোডার সেবক হয়ে এসেছি।'

'প্যাগোডার?' মুখ চাওয়াচাওয়ি করে সবাই, 'সে তো সাপখোপের আড্ডা হয়ে আছে।'

গম্ভীর গলায় থাকিন মিয়া বলে, 'হুঁ, সংস্কার করে নিতে হবে সমস্ত কিছু। সেইজন্যই আসা। উপস্থিত থাকবার একটা জায়গা খুঁজে নিতে হবে। ভাল কথা, বাহান আছে এখানে?'

'কোন্ বাহান?' কলরব করে ওঠে কয়েকজন।

'বুড়ো বাহান গো আমাদের, হাতকাটা বাহান।' একটি মেয়ে তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে।

'হাতকাটা বাহান? কি জানি আগে যখন দেখেছিলাম, তখন তো দুটো হাতই ছিল?'

'বছরখানেক হলো হাতটা গেছে গো।' সেই মেয়েটির গলা, 'চিনির

মিলের চাকার তলায় থেঁৎলে গিয়েছে। আহা, বুড়ো বয়সে ভারি কষ্ট বেচারীর। মাঝে মাঝে আমরা গিয়ে রান্নাবান্না করে দিয়ে আসি।'

'সেইখানেই আছে তো বাহান?'

'তা নয় যাবে আর কোথায়? বড়লোকদের মতন দশটা বাড়ি আছে নাকি যে বাড়ি বদলে বদলে বেড়াবে?'

মেয়েটির কথার ধরনই এই রকম। মাঠ ধরে এগিয়ে যায় থাকিন মিয়া আর সীমাচলম। লোকগুলো হৈ-হৈ করে নৌকায় গিয়ে ওঠে।

একেবারে পাহাড়ের গা ঘেঁষে ছোট্ট চালাঘর। ঘরের চালে গোলপাতার সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়। সামনের বারান্দাটা ঝুলে পড়েছে পথের ওপরে। সিঁড়ির কয়েকটি মাত্র তক্তা অবশিষ্ট আছে। সিঁড়ির তলায় কঙ্কালসার একটি কুকুর বসে বসে ধোঁকে, বাড়ির সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে যায়। বাড়ির কাছ বরাবর যেতেই চিৎকার করে ওঠে কুকুরটা। বীরত্বব্যঞ্জক কিছু নয়, মৃদু একটা আর্তস্বর। ঝামেলা বরদাস্ত করার ইচ্ছা নেই এমনি একটা ভাব।

একটি প্রৌঢ় বেরিয়ে আসে। জরাজীর্ণ চেহারা। গৃহের উপযুক্ত মালিক। চোখে বোধ হয় ভাল করে দেখতে পায় না লোকটি। অন্ধের মত হাতড়ে হাতড়ে আসে, 'কে?' চোখ কুঁচকে বাইরের দিকে চেয়ে দেখে।

'বাহান, চিনতে পারছো আমায়?'

থাকিন মিয়ার গলার আওয়াজ কানে যেতেই সোজা হয়ে দাঁড়ায় বাহান। ফেলে আসা যৌবন ফিরে আসে তার দেহে। শক্তির জোয়ার। সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে বাহান। এগিয়ে গিয়ে তাকে ধরে ফেলে থাকিন মিয়া। প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে বাহান, 'এত দেরী করে এলেন! আমার যে দেবার মতন কিছুই নেই আজ। শরীর ফোঁপরা হয়ে গেছে—চামড়া-ঢাকা হাড় কখানা পড়ে আছে শুধু।'

ফুলে ফুলে ফোঁপায় বাহান। কাঠামোটা দেখেই বোঝা যায় এক সময়ে কি বিশাল শক্তির অধিকারী ছিল। তার পিঠে আস্তে আস্তে হাত বোলায় থাকিন মিয়া।

'তোমার এখানে আমরা কয়েকদিন থাকতে এসেছি বাহান।'

'আমার এখানে?' অসহায়ের ভঙ্গিতে চেয়ে থাকে বাহান, 'খুব যে কষ্ট হবে আপনাদের। এই ঘর-বাড়ির অবস্থা। রান্নাবান্না করার লোক নেই।'

হাসে থাকিন মিয়া, 'না, তুমি সত্যিই বদলে গেছো বাহান। জীবনের এদিকটা কবে ভেবেছি বলো তো? ঘরদোরের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথা?'

মাথা নিচু করে বাহান। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসে তিনজনে।

সমস্ত সভ্যজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এ এক অদ্ভুত জীবনযাত্রা। একটি মেয়ে এসে রান্না করে দিয়ে যায়। তারপর চুপচাপ বসে থাকা সমস্তদিন ধরে। থাকিন মিয়া বলে, অজ্ঞাতবাস।

দু'একবার বলে ফেলে সীমাচলম, 'কিন্তু কাজের ক্ষতি হবে না, এই সময়ে শহর থেকে দূরে সরে থাকলে?'

'উপায় কি? ওদিকে বর্মার সমস্ত শহর তোলপাড় করে ফেলা হচ্ছে গেরুয়াপরা ফর্সা চেহারার এক ভিক্ষুকে ধরতেই হবে যে করে হোক। সে রাত্রের প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মূলে সে ভদ্রলোকের নাকি হাত আছে। এই সময়ে কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতেই হবে।'

'যুদ্ধের অবস্থার কোন খোঁজ-খবর পাওয়ারও উপায় নেই?'

'আর দু'একদিনের মধ্যেই সব সংবাদ পাব।'

কাজেই ঘুরে ঘুরে জায়গাটা দেখা ছাড়া করবার মত কিছুই নেই। দেখবারই বা কি আছে এখানে? একটানা অনুর্বর জমি। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে উপদ্বীপের মতন অনেকটা। কয়েক ঘর লোকের বাস।

বেশীর ভাগই ওপারে যায় মজুরি খাটতে চিনির কলে। আর বাকী যারা, জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে বিক্রি করে আঁটি বেঁধে বেঁধে। দিনের বেলা এই রূপ। রাত্রিবেলা কিন্তু চেহারা বদলে যায় জায়গাটার। অনেকগুলো মোটর-বোট ভাসে জলে। নানা আকারের নৌকা ওপার থেকে আসে। সন্ধ্যার মুখে এপারেও পশ্চিম কোণের সারি সারি টিনের ঘরগুলোর সামনে কেরোসিনের আলো জ্বলে উঠে। বাতাসে হাল্কা গানের সুর ভাসে। মাঝে মাঝে হৈ-হল্লা। ভোরের আগেই মোটরবোটে আর নৌকায় করে ফিরে যায় সৈন্যরা। সমস্ত চুপচাপ।

পশ্চিম দিকের সঙ্গে এদিকের সম্পর্কও কম। বাঁশের সাঁকো বেয়ে যেতে হয়। যথেষ্ট সাহস না থাকলে পার হওয়া যায় না। বর্ষাকালে তো কথাই নেই; বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় পশ্চিমের অংশটা। অন্য সময়েও আসা-যাওয়া নেই দুদিকের মধ্যে। যেন আলাদা জগতের বাসিন্দা।

ওদিকটায় কোনদিন যায় না সীমাচলম। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে মেটে রাস্তাটা ধরে পায়চারী করে। ভাবে রাংগাম্মার কথা। সেবা-কেন্দ্রের লোকটা ঠিকমত পৌঁছে দিয়েছে তো তাকে হামিদার কাছে? এক এক সময়ে সর্দারের বিশাল দেহটা ভেসে ওঠে চোখের সামনে। ঝালর দেওয়া প্রকাণ্ড হলদে পাগড়ী, রূপোর চেনশুদ্ধ ঘড়ি, তাজা রক্তের স্রোত সমস্ত শরীরে।

একদিন ভোরের দিকে থাকিন মিয়া ডেকে তোলে সীমাচলমকে, 'চলুন কাজ করি একটু। এরকমভাবে বসে থাকলে গায়ে শেওলা পড়ে যাবে। শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে আঁটি বেঁধে হাটে চালান দেওয়া যাক। পরিশ্রমও হবে, পয়সা উপায়ও করা যাবে কিছু।'

সীমাচলম বোঝে এ একটা অছিলা মাত্র। গভীর কিছু একটা বলবে থাকিন মিয়া।

কিছুক্ষণ চলার পর গভীর জঙ্গল শুরু হয়। পথ চলা দুষ্কর। মোটা মোটা লতা গাছের ডাল থেকে ঝুলে পড়েছে, ভিতরে ঢোকা দুঃসাধ্য। অনেক কষ্টে জঙ্গল পার হ'য়ে পাহাড়ের এপাশে পৌঁছে অবাক হয়ে যায় সীমাচলম। ঝকঝকে তকতকে পরিষ্কার মাঠ। ছোট বাবলার চারা দু-একটা। মাঝে মাঝে টোপাকুলের ঝোপ। পায়ে চলা আঁকাবাঁকা রাস্তা, পাহাড়ের পাশ দিয়ে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামের দিকে চলে গেছে। একটা বাঁক ঘুরেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সীমাচলম। রেডক্রশের নিশান আঁটা সেই মোটর দাঁড়িয়ে আছে। জনদুয়েক লোক গাড়ির কাছে ঘাসের ওপর বসে বসে কফি খাচ্ছে। থাকিন মিয়াকে দেখেই ছুটে আসে।

'কি খবর? সব ভালো তো?'

'খুব ভালো নয়। পথে কয়েকদিন ইচ্ছা করেই দেরী করেছি। জোর খানাতল্লাসী চলেছে। রাস্তায় প্রত্যেক মোটর দাঁড় করিয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়েছে। আপনার ছবিও থানায় থানায় লটকে দিয়েছে। কিছু মাল পথে দু'নম্বর ডিপোতে নামিয়ে রেখেছি। দামী জিনিসগুলো নিয়ে এসেছি এখানে। আপনার কথামত ভাঙা প্যাগোডার ভিতরে রেখে দিয়েছি।'

'ভালোই করেছ।' খুব চিন্তিত মনে হয় থাকিন মিয়াকে, 'এ জায়গা কেমন মনে করো? কিছুদিন এখানে থাকবো, না গা ঢাকা দেবো এখান থেকে?'

'এতদিন তো এ জায়গাটা ভালোই ছিলো। পুলিশের নজর এড়িয়ে থাকবার মত এরকম জায়গা তো আর ছিলোই না। কিন্তু জাপানীদের তাড়া খেয়ে গ্রামের ভেতরেও ঢুকেছে ইংরাজ সৈন্যরা। নদীর ওপারে তাঁবু ফেলেছে। এ পারেও নাকি যাওয়া-আসা করছে। কাজেই চট করে নজরে পড়ে গেলে মুশকিলের কথা।'

'তাহলে অন্ততঃ কিছুদিন এখান থেকে গা ঢাকা দেওয়া প্রয়োজন। শান স্টেটের কেন্দ্রগুলো একবার দেখা দরকার, কি বলো?'

আমাদেরও মনে হয় অন্ততঃ কয়েকদিনের জন্য আপনার সরে যাওয়াই উচিত।'

'বেশ। সরে যাবো। তুমি সমিতির অন্য সভ্যদের খবর দিয়ে দিও।'

লোক দুজন মোটরে গিয়ে ওঠে। গর্জন করে ওঠে গাড়িটা। ভোরের কুয়াশার আড়াল দিয়ে ফিরে যায়।

'আপনি চলে যাবেন তাহলে? আমি একেবারে একলা পড়ে যাবো।' হতাশা মাখানো কণ্ঠস্বর সীমাচলমের।

'হ্যাঁ, কিছুদিনের জন্য একটু সরে থাকা দরকার, কি বলেন? ঠিক এ সময়ে ওদের হাতে পড়াটা ঠিক হবে না।'

'নিশ্চয় নয়। আপনি সরে যান। আমিও যাবো আপনার সঙ্গে।'

'আপনার গেলে তো চলবে না। অস্ত্রাগারের ভার আপনার ওপর, মনে আছে তো সে কথা? তা ছাড়া এবার আপনার আসল কাজ শুরু হবে।'

চারদিকে এত ধরপাকড়, খানাতল্লাসী, কড়া নজর, এই সময়ে দায়িত্ব যত কম বাড়ে ততই মঙ্গল। কিন্তু এ পথের প্রবেশদ্বার আছে, নির্গমনের কোন ছিদ্র নেই। আর এ প্রশ্ন এখন নিরর্থক অবান্তর। আগুন জ্বলে উঠেছে দিকে দিকে। পিছিয়ে আসার কথা এখন নয়।

'কি কাজ বলুন?'

'শুনুন।' কালো পাথরের ঢিপির ওপর পা মুড়ে বসে থাকিন মিয়া। সীমাচলমও বসে পড়ে পাশে, 'আমার খবর আপনি মাঝে মাঝে পাবেন। আমার যে খবরই পান না কেন, নিজে অবিচল থাকবেন। লুকোচুরি করে লাভ নেই, হয়ত ওদের গুলিতে নিহত হয়েছি এ খবরও আসতে পারে

আপনার কাছে, কিন্তু কিছু ভাববার প্রয়োজন নেই। আমাদের সমিতিতে যথেষ্ট লোক আছে যারা ঠিক চালিয়ে নিয়ে যাবে সবকিছু। আপনার কাজ আপনি ভুলবেন না। যদি আমরা পরাজিত হই, শ্বেতশক্তি আবার শিকড় গেড়ে বসে, তবে জানবেন পরলোকেও আমার আত্মা শান্তি পাবে না।'

মুখ নিচু করে চুপচাপ বসে থাকে সীমাচলম। সর্দারের মৃত্যুর পর থেকেই একটা ছায়া যেন অবিরত অনুসরণ করে ওকে। মৃত্যুর কঠিন নগ্নরূপ উদ্‌ঘাটিত হয় চোখের সামনে। এই সব মৃত্যু পার হয়ে আসবে দেশের স্বাধীনতা? অবসাদ আসে সীমাচলমের মনে।

'কি চুপ করে রইলেন যে?'

'না, ভাবছি, আপনি পাশে না থাকলে কি করবো আমি?'

হেসে ফেলে থাকিন মিয়া, 'অবলম্বন ছাড়া বাঁচা অভ্যাস নেই বুঝি? যাক শুনুন। পশ্চিম দিকের চালাঘরগুলো লক্ষ্য করেছেন তো?'

ঘাড় নাড়ে সীমাচলম। অনেকদূর থেকে লক্ষ্য করেছে। কিন্তু ও তো নিষিদ্ধ জায়গা।

'ও পাড়ায় যাওয়া-আসা শুরু করতে হবে।'

'সে কি?' আচমকা সাপের গায়ে যেন হাত ঠেকে যায় সীমাচলমের।

'ভয় পাবেন না। আপনাকে কুপথে নামাবার চেষ্টা করছি না। জানেন তো ওপার থেকে অনেক জাঁদরেল চাঁইদের আগমন হয় এ পাড়ায়? নেশার মুখে আর ফুর্তির চোটে অনেক সময় বেফাঁস কথা বের হয়ে যায় ওদের মুখ থেকে। অনেক গোপন প্ল্যানের খবর হুইস্কির তোড়ে বেরিয়ে আসে। এই খবরগুলো শুধু সংগ্রহ করতে হবে আপনাকে।

'আমাকে? তাহলে তো রীতিমত যাতায়াত করতে হবে ওদের পাড়ায়। ভাব জমাতে হবে।' বিশ্রী মনে হয় সীমাচলমের।

'ক্ষতি কি? বলেছি তো আপনার আমার জীবন আমাদের নয়। দেশের কাছে উৎসর্গীকৃত এ জীবনের ওপর অধিকার নেই আমাদের। দরকার হলে পাঁক-কাদায় আকণ্ঠ ডুবে থাকতে হবে, কুষ্ঠ রোগীর সঙ্গে একচালায় শুয়ে থাকতে হবে পাশাপাশি।'

আপত্তি করে না সীমাচলম। বেশ তাই হবে। কিন্তু কি করে খেলা আরম্ভ করবে? ঐ বিষয়ে অভিজ্ঞতা ওর মোটেই নেই।

হাসে থাকিন মিয়া, 'আমারই কি আর আছে? তবে, মনে হয়, কাপ্তেন সেজে যাবেন, নয়ত যাবেন খুব দীনবেশে। দুটোর একটায় ঠিক কাজ হয়ে। টাকা ছড়ানো প্রয়োজন হতে পারে। দুদিন অন্তর আমাদের লোক ভোরের দিকে এইখানে আসবে। টাকার দরকার থাকলে বলবেন তাকে, আর দেবার মত কোন খবর সংগ্রহ করলে তার মারফৎ আমাদের জানাবেন।'

ফিরে আসে দুজনে। আসার পথে জীর্ণ প্যাগোডার সামনে দাঁড়ায় একটু। এক সময়ে খুবই বিরাট ছিলো মন্দিরটি, কালের ঝড় ঝাপটায় জীর্ণ হয়ে এসেছে। পাঁজর বেরিয়ে পড়েছে ইটের। ভগ্নস্তূপে ঢোকবার মুখটা প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে। বাইরে থেকে ভগ্নপ্রায় বুদ্ধমূর্তির কিছুটা দেখা যায়।

'ওই মূর্তির পিছনে রইলো আপনার জিনিসগুলো। মাঝে মাঝে খোঁজ নেবেন। ভূত আর সাপের ভয়ে এখানকার লোক কোনদিন আসবে না এদিকে। আমার লোকের হাতে সাঙ্কেতিক চিহ্ন দিয়ে চিঠি পাঠাবো, যা প্রয়োজন তার হাতে পাঠিয়ে দেবেন।'

মাটির ওপর হাঁটু মুড়ে বসে প্রণাম করে থাকিন মিয়া। সীমাচলমও বসে তার পাশে। একদৃষ্টে চেয়ে থাকে থাকিন মিয়া। মনে হয় ওই বুদ্ধ মূর্তিতেই নিবদ্ধ নয় ওর দৃষ্টি, মূর্তি পার হয়ে এ দেশের গাছ-পালা,

পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী সব কিছুকে দৃষ্টির প্রদীপ দিয়ে আরতি করে। বন্দনা করে দেশের রূপ।

সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বেরিয়ে পড়ে সীমাচলম। থাকিন মিয়া চলে যাবার পর দুদিন চুপচাপ বসেছিলো। উঠানের ওপর উবু হয়ে বসে বাহানের সঙ্গে কথা বলেছে, শুনেছে ওর সুখ-দুঃখের কথা। কোলের মেয়েটা কি ভাবে মারা গিয়েছে। অজন্মার বছরে চিড় খেয়ে খেয়ে ফেটে গিয়েছিলো ধানের ক্ষেত। একফোঁটা জল পড়েনি আকাশ থেকে। ঘরের বৌ বিপদ বুঝে সরে পড়েছিলো কার হাত ধরে। ভালোই করেছিলো, কিন্তু মেয়েটাকেও নিয়ে যেতে পারতো সঙ্গে করে। কিন্তু নিয়ে যায়নি। ওসব কথা ভুলতে চায় বাহান, কিন্তু সবকিছু ঠেলে চোখের সামনে ভেসে আসে পুরানো দিনের ছবিগুলো।

উঠে পড়ে সীমাচলম, 'উঠি বাহান, একটা জরুরী কাজ রয়েছে। ফিরতে রাত হতে পারে, ভেবোনা। বারান্দায় বিছানা রেখো।'

রাস্তায় নেমে পড়ে সীমাচলম। পিস্তলটা আছে তো ঠিক? সঙ্গে থাকা ভালো। মাতাল মিলিটারীর সঙ্গে কোলাকুলি হয়ে যায় যদি এটা কাজে লাগবে। সাবধানে বাঁশের সাঁকো পার হয়। কিছুটা এগিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ে। আসর শুরু হয়নি এখনও ভালো করে। দু'একটা নৌকা এসে জুটেছে। বাবলা গাছের আড়ালে বসে পড়ে সীমাচলম। বসে বসে ভাবে। কি ভাবে ঢুকবে ওখানে, আর বলবেই বা কি? মিলিটারী ছেড়ে ওকেই বা পাত্তা দেবে কেন মেয়েরা?

সাহসে ভর করে এগিয়ে যায়। দূর থেকে যেমন ঘেঁষাঘেঁষি মনে হয়, তেমনি ঘেঁষাঘেষি কিন্তু নয় চালাঘরের সার। একেবারে কোণে একটি চালায় টিম টিম করে জ্বলে মোমবাতি। অপেক্ষাকৃত হীন অবস্থা। মেয়েটির

রূপের জলুস নেই বোধ হয় বিশেষ। দমকা হাওয়ায় নিভে যায় ঘরের বাতিটা। ঘরের মধ্যে থেকে তীক্ষ্ণ গলার আওয়াজ ভেসে আসে, 'মর, মর, সবাই মর তোরা একজোট হয়ে।'

কৃত্রিম কাসির শব্দ করে সীমাচলম বেড়ার এপাশে দাঁড়িয়ে। ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে মেয়েটি। অন্ধকারে দেখা যায় না ভালো করে, কিন্তু মিষ্ট সুরভি একটা ভেসে আসে, বোধ হয় অঙ্গরাগের। এদিক-ওদিক দেখে চেয়ে চেয়ে, 'কে, কে কাসলে ওখানে?'

ছোট্ট করে বলে সীমাচলম, 'আমি।'

'মরণ তোমার! আমি তো, দাঁড়িয়ে আছো কেন ওখানে? এগিয়ে আসতে জানো না?'

অদৃষ্টে অনেক দুঃখ ভোগ আছে সেটা বোঝে সীমাচলম। এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় ঘরের দাওয়ায়।

'দাঁড়াও, বাতিটা জ্বালি আগে। হুট করে ঢুকে পড়ো না ঘরে। চোর কি ছ্যাঁচড় ঠিক আছে তার।'

মোমবাতিটা জেলে সীমাচলমকে ঘরের ভিতরে ডাকে। একটু ইতস্ততঃ করে ঢুকে পড়ে সীমাচলম। মোমবাতি হাতে করে এগিয়ে আসে মেয়েটি। বলে, 'দাঁড়াও তোমার মুখখানা দেখি ভালো করে।'

কাছে আসতেই চিৎকার করে ওঠে সীমাচলম, 'তুমি, তুমি, চিনতে পারছো না আমাকে?'

'কে বলো তো? ঠাওর করতে পারছি না তো? পুরানো দিনের কেউ বুঝি?'

এবারে এগিয়ে আসার পালা সীমাচলমের। বলে, 'আমি, আমি সীমাচলম। সেই যে রেঙ্গুনের গ্রেট চায়না হোটেল, আলিম আর তুমি?'

চোখ কুঁচকে মেয়েটি একটা একটা করে ওলটায় মনের পাতা।

তারপর হেসে ওঠে, 'আরে তুমি! আমার পুরানো নাগর! তুমি কোত্থেকে? আমি ভাবলুম ঘরের ছেলে সুড় সুড় করে ঘরেই ফিরে গেছো বোধ হয়।'

'মা পান, তুমি এলে কি করে এখানে তাই বলো? উঃ, তোমায় কি কম খুঁজেছি আমি!' সীমাচলমের মুখের ভাব দেখে সত্যিই মনে হয় যেন মা পানের জন্য বর্মার পথে-বিপথে ঘুরে বেড়িয়েছে, অশেষ দুঃখ আর যন্ত্রণা সহ্য করেছে।

'বোসো, বোসো।' নিচু একটা কাঠের টুল বের করে দেয় মা পান, 'কতদিন পরে দেখা. একটু চায়ের বন্দোবস্ত করি আগে।'

চায়ের আয়োজন করে মা পান, আর সেই ফাঁকে চোখ বুলিয়ে তাকে দেখে সীমাচলম। যৌবনের সামান্য কিছুও অবশিষ্ট নেই সারা দেহে। প্রৌঢ়ত্বের আস্তরণ পড়েছে দেহের কাঠামোয়। কুঁচকে এসেছে মুখ আর চোখ। মাথার চুল উঠে সাদা হয়ে গেছে সামনের দিক। দু-একটা দাঁতও পড়ে গিয়েছে। আকর্ষণ করার মত কিছুই নেই ওর দেহে। পুরানো দিনের কুৎসিত কঙ্কাল।

চায়ের পেয়ালা সামনে নিয়ে বসে মা পান। নিজের পেয়ালায় কি একটা টুপ করে ফেলে দিয়ে হাসে একগাল, 'ওই একটু করে না খেলে কবে মরে যেতুম। আমার তিরিশ বছরের অভ্যাস।'

'কি কোকেন বুঝি?' উত্তর দেয় না মা পান। যৌবনের সলজ্জ হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে, কিন্তু বীভৎস দন্তহীন মাড়িগুলো চকচক করে ওঠে মোমবাতির আলোয়।

'বলো তোমার কথা।' দর্মার দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসবার চেষ্টা করে সীমাচলম। বলতে বলতে মাঝে মাঝে হাঁফ ধরে মা পানের। আলিম মারা যাওয়ার পরে আরেকজনের হাত ধরে নৌকা ভাসিয়েছিলো। কিছুদিন

পায়ে সেও হাওয়া। সাত ঘাটের জল খেয়ে ঘুরে বেড়িয়েছিলো। শরীরটাও ভেঙে পড়েছে কয়েক বছর। নানান রোগে ধরেছে। ব্যবসা মন্দা। কি যে পোড়ার লড়াই লাগলো দেশে! সৈন্যতে ছেয়ে গেলো সারা দেশ। কড়া নজর চারদিকে, লুকিয়ে-চুরিয়ে কানা কড়িটি পর্যন্ত কোথাও চালান দেবার উপায় রইলো না। কিছুদিন হলো বেসিনে গিয়ে নাম লিখিয়েছিলো খাতায়, যুদ্ধের হিড়িকে মেয়ের দলের সঙ্গে উঠে এসেছে এখানে।

'তোমার কাকার খবর কি?' অজ্ঞতার ভান করে সীমাচলম।

'সাত পুরুষের কাকা।' মুখ ঝামটা দেয় মা পান, 'কে জানে কোন্ চুলোয়!'

আর বেশী কথা হয় না। এক সময়ে শুধু সীমাচলম জিজ্ঞাসা করে, 'লোকজন আসে তোমার এখানে? চলে কি করে তোমার?'

ঠোঁটটা উল্টে কপালে হাত ঠেকায় মা পান, 'কই আর চলছে? এইভাবে ক'দিন চলবে কে জানে? মাছে মাঝে শনিবার শনিবার বুড়ো মেজর আসে একজন। বোধ হয় দেশের বুড়ীর কথা মনে পড়ে, তাই এখানে এসে রাত কাটিয়ে যায়।'

কিছুক্ষণ বসে থেকে সীমাচলম বলে, 'আচ্ছা উঠি এবারে!'

'সে কি, এর মধ্যে? বসবে না একটু?'

'না, আজ আর বসবো না। আসবো মাঝে মাঝে।'

উঠানে নেমে পকেট থেকে দশ টাকার একটা নোট বের করে। তুলে দেয় মা পানের হাতে, 'নাও, রেখে দাও।'

নোটটা উল্টেপাল্টে দেখে মা পান, বলে, 'আজকাল ভালো চাকরি-বাকরি করছো বুঝি? না মিলিটারীকে মাল জোগাচ্ছো?'

চলতে চলতে উত্তর দেয় সীমাচলম, 'মাল জোগাচ্ছি মিলিটারীকে।'

কিছুদূর গিয়ে পিছনে চেয়ে দেখে। কপাটে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে মা পান।

সেদিনের খবরে সীমাচলম মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে মাঠের ওপরে। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে লোকটার দিকে। আবার জিজ্ঞাসা করে কথাটা। লোকটি কিন্তু অবিচল। আস্তে আস্তে বলে, 'নিজেদের লোক ধরিয়ে দিলে আর উপায় কি? নৌকা নিয়ে সোজা একেবারে চরে গিয়ে উঠলো লোকটা। তামাক খাবার নাম করে থানায় খবর দিয়ে এলো। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে দু-দুটো মোটর বোট ঘিরে ফেললো নৌকা। বন্দুক উঁচিয়ে ধরে জলপুলিশ হাতকড়ি লাগিয়ে দিলো দুটি হাতে।'

পুলিশের হাতে শেষে ধরা পড়লো থাকিন মিয়া? কতদিন জেলে আটকে রাখবে কে জানে? বিনা বিচারে কিম্বা বিচারের ভান করে ফাঁসিতে লটকে দেবে হয়ত। আর ভাবতে পারে না সীমাচলম। লোকটাকে বলে, 'আমাদের কাজ কেমন চলছে?'

'ভালোই। মালয় আর শানস্টেটে আমাদের লোকেরা আক্রমণ করেছে ওদের। বোমা দিয়ে ওদের বিমানঘাঁটি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন হবে এইবার। আপনার অনুমতি পেলে গাড়ি নিয়ে এসে কিছু জিনিসপত্তর নিয়ে যাবো আমি।'

ঘাড় নাড়ে সীমাচলম। ভোরের দিকে গাড়ি নিয়ে এলেই চলবে। লোকটা চলে যেতেই ফিরে আসে সীমাচলম। বাঁশের সাঁকো পার হয়ে পশ্চিমের চালাঘরগুলোর দিকে রওনা হয়। একলা থাকতে সাহস হয় না। বিশ্রী সব ভাবনা এসে জড়ো হয় মাথায়। তার চেয়ে মা পানের সঙ্গে গল্পগুজবে কিছুটা সময় তবু কাটবে।

মা পানের ঘরের কাছ বরাবর আসতেই দেখা হয়ে যায় তার সঙ্গে

বিমর্ষ মুখের ভাব। বালতি করে জল বয়ে আনছে নদীর ঘাট থেকে।

'কি খবর? দিন-দুপুরে এদিকে কি মনে করে?'

'এমনি আসলাম বেড়াতে বেড়াতে।'

'এখানকার পালা চুকলো, এবার আবার সরে যেতে হবে।'

'সেকি, যাবে কোথায়?'

হাতের বালতিটা নামিয়ে রাখে মা পান। মাজায় হাত দিয়ে বেঁকে-চুরে শরীরটা ধাতস্থ করে নেয়। ঠোঁটের ওপর হাত রেখে আস্তে আস্তে বলে, 'চুপ, পাঁচ-কান করো না। কাল শুনলুম মেজর সাহেবের মুখে, সিংগাপুর কেড়ে নিয়েছে জাপানীরা। লড়াইটা বিশেষ সুবিধের হচ্ছে না। সব পেছিয়ে আসবে। রেঙ্গুন, পেগু, প্রোম সব যাবে। শেষ চেষ্টা একবার ওরা করবে মাণ্ডেলেতে। কিন্তু ভাবগতিক যা দেখলুম, দাঁড়িয়ে লড়বার মতন মনের জোর ওদের মোটেই নেই।'

সত্যিই তাহলে বর্মা ছেড়ে পালাবে ইংরাজেরা? এত বছরের গড়া সংসার ফেলে পালাবে জাপানীদের ভয়ে?

'তুমি থাকবে না কি এখানে?'

'তা ছাড়া আর যাবো কোথায়?'

'যাবে তো এই বেলা পালাও, যা শুনছি এরপর আর পৌছুতে হবে না দেশে।'

'কেন?'

'ভালো রাস্তা যেটা শহরের মধ্যে দিয়ে সেটা ব্যবহার করবে ইংরাজরা, সেই রাস্তায় আর কাউকে যেতে দেওয়া হবে না। কালা আদমীদের জন্য পাহাড়ে রাস্তা ঠিক করা হয়েছে, জল নেই, আশ্রয় নেই, কিছু নেই সেখানে। কালকে মেজর সাহেব একেবারে মাতাল হয়ে পড়েছিলো। চিৎকার করে বললো, আমরা তো গেছিই, ওদের মারবো পিঁপড়ের মত

টিপে টিপে। একটি লোককেও বর্মা পার হয়ে যেতে হবে না।'

মুখপোড়ার শোন কথা।'

কথাগুলো ভালো করে কানে যায় না সীমাচলমের। অনেকদিন আগের এক ছবি ভেসে আসে মনে। মাদ্রাজের শহরতলীর এক গির্জায় সে ঢুকে পড়েছিলো একদিন। সাদা পোশাক-পরা পাদ্রী সাহেব, হাত ছুটি বুকের ওপর জোড় করা, তার কথাগুলো মনে পড়ে সীমাচলমের, 'ভগবান যীশুর রাজ্য প্রেমের রাজ্য। এ রাজ্যে মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ নেই।' এতদিনে বোধ হয় সে পাদ্রী কোন পত্রবহুল গাছের নিচে মাটির তলায় নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। তার আত্মার শান্তি হোক। মিথ্যা প্রচারের পাপ তাকে স্পর্শ না করে।

'তোমরা সবাই চলে যাবে বুঝি?' সীমাচলম প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ, গোছগাছ শুরু হয়েছে। আরো উত্তরে চলে যাবো আমরা। আজ দুপুরেই যাবো। তুমিও চলো না আমাদের সঙ্গে?'

'তল্পীদার হয়ে?'

'না-মা, ঠাট্টা নয়। চলো না, একসঙ্গে থাকবো দুজনে অন্য কোথাও। সত্যি এ জীবন আমার ভালো লাগছে না আর। আমাকে নিয়ে যাবে তোমাদের দেশে?' কথাটা বলেই একটু অপ্রস্তুত হয়ে যায়। হাতের চুড়িটা খুঁটতে খুঁটতে বলে, 'আর কয়েক বছর আগে একথা বললে মানাতো বোধ হয়, না?' দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে বুক কাঁপিয়ে।

'না-না, সে সব কিছুই নয়। মিলিটারীকে রসদ জোগাবার কাজ আমার। এ জায়গা ছাড়লে তো আমার চলবে না।'

উঠে দাঁড়ায় মা পান। বালতি সাবধানে তুলে বাড়ির দিকে পা চালায়।

শুধু সিংগাপুর নয়, মার্তাবান চলে গেছে। দক্ষিণ সুমাত্রা, পালাম্বাং

আর বলীদ্বীপ ওদের কবলে। এবার আর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াই নয়। একদল এগিয়ে আসে আর একদল নিজের হাতে সবকিছু চুরমার করে পিছিয়ে পড়ে।

মা পান চলে গিয়েছে। যাবার সময় দেখা হয়েছিলো মা পানের সঙ্গে। তারপর একটানা বিবর্ণ অনেকগুলো দিন।

একদিন হৈ-হৈ করতে করতে ফিরে আসে মজুরের দল ওপার থেকে। মিল বন্ধ। মিলের মালিক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক মিল বন্ধ করে সরে পড়েছে। কতকগুলো মজুর হাঁউমাউ করে কাঁদে। বাকী কতকগুলো অশ্লীল গালাগাল দিতে শুরু করে ভারতীয়দের। খেঁকশেয়ালের জাত। ভয়ের সামান্য সম্ভাবনাতেই ল্যাজ গুটিয়ে সরে পড়ার চেষ্টা করে। কিছুক্ষণ জটলা করে, তারপর সবাই মিলে ওপারে চলে যায়। হঠাৎ রাত্রে ওপারের আকাশ লাল হয়ে ওঠে। মিলের টিনগুলো আওয়াজ করে ছিটকে পড়ে চারদিকে। মেসিনগুলো তেতে লাল হয়ে ওঠে, তারপর এক সময়ে দুমড়ে বেঁকে খুলে খুলে পড়ে। অসহ্য উত্তাপ। এপারের হাওয়াও গরম হয়ে ওঠে। অনেকগুলো পোড়া চিনির বস্তা কাঁধে করে মজুররা এপারে চলে আসে।

কথাটা বাহানই চুপি চুপি বলে সীমাচলমকে, 'আপনি এখান থেকে চলে যান বাবুজী। ওরা ক্ষেপে গেছে ভারতীয়দের ওপরে। হয়ত বিপদ হতে পারে আপনার। আমি দুর্বল, অথর্ব, কোন কাজেই লাগবো না।

চুপ করে শুয়ে থাকে সীমাচলম। রাত্রে মাঝে মাঝে চিৎকার করে ওঠে কারা। বোধ হয় পচাই মদের আসরে জটলা চলে ওদের। তারপর দল বেঁধে হয়ত ছুটে আসবে, হুড়মুড় করে ঝাঁপ ঠেলে ঢুকে পড়বে ভিতরে। অনেকগুলো ঝকঝকে সড়কির ফলা আর এখানে-ওখানে রক্তের ছিটে। আর ভাবতে পারে না। কপালে ঘাম জমে ওঠে। সারারাত এপাশ-ওপাশ

করে। মাঝে মাঝে চোখ খুলে দেখে কালো একটা ছায়া ওর বিছানার পাশে। হাতে ধারালো রামদা।

ভোরের দিকে প্যাগোডার কাছাকাছি লোকটির সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। ব্যাপারটা তাকে খুলে বলে সীমাচলম। এখানে থাকাটা বোধ হয় ঠিক হবে না আর।

'না, এখানে থাকবার আর দরকার নেই আপনার। আপনি আমার সঙ্গেই চলুন।

'কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রগুলো।'

'কিছু কিছু তো আমি নিয়েই গেছি। বাকী যা আছে, আজ নিয়ে যাবার চেষ্টা করবো। আপনার সেদিনের খবরটা খুব কাজে লেগে গেছে। ইংরাজদের পালাবার রাস্তার দুধারে আমাদের লোক তৈরী হয়ে আছে। একটিকেও প্রাণ নিয়ে পালাতে দেবো না।'

'আর ভারতীয়দের কি হবে অবস্থা ?'

'তাদের জন্য রাস্তার পাশে জায়গায় জায়গায় সেবাকেন্দ্রের তাঁবু ফেলেছি আমরা। ওষুধ-পথ্যও কিছু রেখেছি। কিন্তু ওরা কড়া নজর রেখেছে ও রাস্তায়। মিলিটারী অনেকবার আমাদের সেবাকেন্দ্রের তাঁবু আক্রমণ করেছে। আমাদের লোকের সঙ্গে হাতাহাতিও হয়েছে অনেকবার। আর দেরী করবো না। মালমশলাগুলো তুলতে শুরু করি।'

এবারেও রেডক্রসের গাড়ি, তবে বড় সাইজের। জনতিনেক লোক মিলে বোঝাই করে লরী। সীমাচলম আর দলের লোকটি পাথরের আড়ালে বসে থাকে চুপচাপ খোলা পিস্তলে হাত রেখে।

উঁচু পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে পিচঢালা রাস্তা। বিদ্যুৎগতিতে চলে গাড়ি। জনমানবের সাড়াশব্দ নেই। একধারে বিরাট খাদ। অনেক নিচে সরু রুপালী তারের মত ছোট পাহাড়ী নদী দেখা যায়। মাঝে মাঝে

পাহাড়কাটা পথ ; সুড়ঙ্গ আর পাইনের জঙ্গল। কিছুদূর গিয়ে থেমে যায় গাড়ি। সকলে নেমে পড়ে। ঘন চাপ অরণ্য। দিনের বেলাতেও আলোর চিহ্নমাত্র নেই। অবিশ্রান্ত ঝিঁঝিঁর ডাক। দূরে কাঠঠোকরার ঠক ঠক শব্দ।

কালো পাথর আঁকড়ে আঁকড়ে ওপরে ওঠে সবাই। জীর্ণপ্রায় কাঠের এক বাংলো। অনেক আগে বন বিভাগের কোন সাহেবের জন্য তৈরী হয়েছিল। উপস্থিত এটাই আস্তানা হবে ওদের। সঙ্গের লোকটি এপাশে এসে পাহাড়ের তলায় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। নিচে সরীসৃপগতিতে এঁকেবেঁকে চলেছে পিচঢালা কালো রাস্তা। এই পথে পিছিয়ে আসবে ইংরাজরা। কয়েক মাইল অন্তর তাদের সুখ-সুবিধার জন্য ঘাঁটি করা হয়েছে। হাজার হোক রাজার জাত তো, অবস্থা বিপর্যয়েই না হয় মুশাফির হয়েছে।

'কিন্তু', জ্বলে ওঠে সঙ্গের লোকদুটির চোখ, 'একটিকেও প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে দেবো না আমরা। এই পথের দুপাশে অনেক মাইল জুড়ে আমরাও ছাউনি ফেলেছি। দুপাশ থেকে আক্রমণ চালাবো। ওদের রক্তে উর্বর করবো আমাদের জমি।'

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সীমাচলম। পাইনের জঙ্গল থেকে নীল রঙের একটা পাখী উড়ে এসে বসে সামনের গাছের ডালে। মিষ্টি সুর ভাঁজে। আর একটি পাখী উড়ে এসে বসে সেই ডালে। বাঁকানো ঠোঁটে খড় আর কুটো। নিরালায় বাসা বাঁধতে চায় বোধ হয়।

আক্রমণের আয়োজন চলে। কালো কালো ভারি পাথর এনে সাজায় পাহাড়ের কোণ ঘেঁষে। ঠিক সময়ে গড়িয়ে দিতে পারলে অনেক কাজ হবে। পাথরের আড়ালে বন্দুক আর দু'একটা মেসিনগান। দু'একদিন মহড়াও চলে। এইরকম বন্দোবস্ত হয়েছে অনেক মাইল

জুড়ে। আরাকান পর্যন্ত কয়েক হাজার লোক ওঁৎ পেতে আছে এমনিভাবে। এ রাস্তা ধরে ইংরাজদের অপসরণ শুরু হলেই হত্যার তাণ্ডবলীলা আরম্ভ হবে। পিস্তলটা নাড়াচাড়া করে সীমাচলম। মাঝে মাঝে নিচের রাস্তার দিকে তাগ করে। কিন্তু সময় হলে ছুঁড়তে পারবে তো পিস্তল? একটু আগুনের হল্কা, প্রচণ্ড আওয়াজ, নিচে থেকে কাতর আর্তনাদ। ব্যস, শেষ হয়ে গেলো একটা মানুষ। ভাবতেও শরীরের মধ্যে কেমন করে ওঠে সীমাচলমের।

বাইরের খবর আবছা ভেসে আসে কানে। আরও নাকি এগিয়ে এসেছে জাপসৈন্য। সিটাং নদী পার হয়ে পেগুর কাছাকাছি এসে পড়েছে। রেঙ্গুন আর কয়েক মাইলের ব্যাপার। অপসরণের ব্যবস্থাও আরম্ভ হয়ে গেছে। গোটা দুই জীপগাড়ী চলাচল করে নিচের রাস্তায়। খুব নিচে দিয়ে বিমান উড়তেও দেখা যায়। ঘুরে ঘুরে দেখে সীমাচলম। আশেপাশের গ্রাম থেকে অনেকগুলো লোক জড়ো হয় পাহাড়ের তলায়, মেয়েরা পর্যন্ত। তাদের মধ্যে সড়কি আর বর্শা বিলি করা হয়, মোড়ল-গোছের দু'একজনের হাতে পিস্তল। তৈরী থাকে যেন সকলে। একটি সাদা চামড়াও যেতে না পারে এদিক দিয়ে। এদেশের অনেক ফসল লুটেছে, কাজেই তাদের কবরগুলোও এদেশের মাটিতেই হওয়া উচিত।

হাতের হাতিয়ারগুলো উঁচুতে তুলে চিৎকার করে ওঠে লোকেরা। মেয়েরাও ছড়া বলে সুর করে, ইংরাজ তাড়ানো ছড়া।

সেরাত্রে জোর একটা আওয়াজে ধড়মড় করে উঠে পড়ে সীমাচলম। শুধু আওয়াজ নয়, অনেকগুলো লোকের মিলিত চিৎকার। সাবধানে পা ফেলে ফেলে বাইরে আসে। অন্ধকারে কালো কালো ছায়া কতকগুলো। ফিসফাস শব্দ, 'দেখে পা ফেলবেন।' একজন এগিয়ে এসে হাত ধরে সীমাচলমের।

'কি ব্যাপার ?'

'দুটো গাড়ি আক্রমণ করেছে ওরা। বোধ হয় টহলদার সৈন্যরা এসেছিল।' চোখ কুঁচকে নিচের দিকে চায় সীমাচলম। জমাট অন্ধকার। কোলাহলও অনেকটা ক্ষীণ। পাথরে হেলান দিয়ে বসে থাকে ওরা কয়েকজন। কিছুক্ষণ পরে ঘাস আর শুকনো পাতার ওপরে খসখস শব্দ হয়। কে আসছে এদিকে।

'ডোবামা।'

দলের একজন উত্তর দেয়, 'ডোবামা।' লোকটি এগিয়ে এসে বসে ওদের কাছে। বলে, 'একটু আগুন পেলে হতো। হাত-পা একেবারে জমে আসছে।' মার্চের প্রথমদিকে এত শীত হবার অবশ্য কথা নয়, কিন্তু শীত বেশ পড়েছে এ বছর। তা ছাড়া খোলা জায়গায় পাহাড়ে শীত, হাড়ের ভিতর পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়।

'সর্বনাশ, আগুন জ্বালা সম্ভব নয়। এখনই ওদের নিশানা হয়ে পড়বো। চলো বাড়ির ভেতরে যাই। খবর শোনা যাবে।'

সকলে ঘরের মধ্যে চলে আসে। শুকনো পাতা জড়ো করে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। লোকটি হাঁটু মুড়ে বসে আগুনের কাছে। হাত দুটো তাতিয়ে নিয়ে দুটো গালে ঠেকায়। আস্তে আস্তে বলে, 'গোলমাল খুব জোর শুরু হয়েছে। সবদিক থেকে হটে আসছে এরা। মৌলমিনে বর্মীরা জাপনীদের সঙ্গে মিলে তাড়া করেছে এদের। মাণ্ডেলের ঘাঁটি এরা খুব শক্ত করছে, রেঙ্গুন যাবার বোধ হয় আর দেরী নেই।'

'কিন্তু নিচের আওয়াজটা কিসের বলো তো ?'

'মোটর-সাইকেলে গোটা চারেক সাদা চামড়া বোধ হয় রাস্তা দেখতে বেরিয়েছিল, রাস্তার পাশ থেকে কারা হাতবোমা ছুঁড়ে নিকেশ করে

দিয়েছে তাদের। আসবার সময় দেখলুম তাদের রিভলবারগুলো বেমালুম খুলে নিচ্ছে লোকেরা।'

'সর্বনাশ! লাসগুলো পড়ে আছে নাকি রাস্তার ওপরে?'

'কি জানি? আছে বোধ হয়, খেয়াল করিনি অতটা। গাড়ি দুটো তো দেখলুম রাস্তার পাশে পড়ে রয়েছে।'

'আমি উঠি। সমস্ত সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।' দলের লোকটি উঠে বাইরে অন্ধকারে মিশে যায়।

'থাকিন মিয়ার কোন খবর জানেন নাকি?' সীমাচলম বলে।

মুখ ফেরায় লোকটি। কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে, তারপর মাথা নাড়ে আস্তে আস্তে, 'না, কোন খবর নেই। রেঙ্গুন জেলেই আটকে রেখেছে ওঁকে। মনে হয় শীঘ্রই সরিয়ে ফেলবে অন্য জায়গায়।'

আর কোন কথা হয় না। একটি লোক বাইরে পাহারা দেবার জন্য উঠে যায়। বাকী সকলে বিছানা পেতে শোয়ার আয়োজন করে। শুকনো পাতার আগুন নিভে আসে। বেশ কনকনে ঠাণ্ডা। চোখ দুটো বন্ধ করে কুঁকড়ে শুয়ে থাকে সীমাচলম।

ক্রমে এ-ও গা-সওয়া হয়ে আসে। প্রায় প্রতি রাত্রেই নিচে হৈ-চৈ আওয়াজ। বোমা ফাটার শব্দ, গুলির আদান-প্রদান, কাতর আর্তনাদ। দলের লোকেরা নিচে নেমে যায়। পিস্তল খুলে ওপরে পায়চারী করে সীমাচলম। অস্ত্রাগার পাহারা দেয়। অনেকগুলো নক্ষত্র জ্বল জ্বল করে আকাশে। মুখ তুলে দেখে সীমাচলম। এক সময়ে অনেকগুলো নক্ষত্রের নাম সে বলতে পারতো, আজকাল ভুলে গেছে সবকিছু।

গুঁড়ি মেরে লোকগুলো ফিরে আসে। ঝর্ণার ধারে গিয়ে ঘসে ঘসে মুছে ফেলে রক্তের দাগ। নতুন যোগাড় করা রাইফেল আর পিস্তলগুলো সীমাচলমের হাতে তুলে দেয়। কোনদিন বা পাঁজাকোলা করে দলের

দু'একজনকে নিয়ে আসে। পাল্টা আক্রমণে আহত কেউ, কেউ বা শেষই হয়ে গেছে একেবারে। পায়চারী করতে করতে অন্যদিকে চলে যায় সীমাচলম। সমস্ত শরীরটা গুলিয়ে ওঠে। পাথরের আড়ালে বসে হাঁটু মুড়ে, চোখ বুজে আস্তে আস্তে বলে, শেষ হোক ভগবান। রক্তের হোলিখেলা শেষ হোক। জীবন দুঃসহ হয়ে ওঠে। পরিত্রাণ নেই, মুক্তি নেই। ডাকে সাড়া দেয় না বধির দেবতা। শুধু অনেক দূরের নক্ষত্রগুলো ঝাপসা হয়ে আসে।

পাহাড়ের আড়াল থেকে ঝুপঝাপ আচমকা এরা লাফিয়ে পড়ে গাড়িগুলোর ওপরে। দু-তিন মিনিটের মধ্যে খুন-জখম লুটপাট, ব্যস্। যে যার সরে পড়ে রবার আর পাইনের ঘন জঙ্গলের ভিতরে। তারপর সব কিছু থেমে গেলে চুপচাপ এসে লাস আর ভাঙা গাড়ি সরানোর বন্দোবস্ত আরম্ভ হয়। আজকাল অবশ্য ওদের সঙ্গে সশস্ত্র পাহারার বন্দোবস্ত হয়েছে, কাজেই দু'পক্ষের মধ্যে কিছুক্ষণ গুলি-গোলার ঝাঁক চলে। কিন্তু এদের সুবিধা অনেক। পাথরের আড়ালে থেকে সমানে আক্রমণ চালায়। তাতেও ফল না হ'লে বড় বড় পাথরের চাঙড়গুলো গড়িয়ে দিলেই চলে। কোন অসুবিধা নেই। গাড়ি আর লোকের চিহ্নমাত্রও থাকবে না।

কিন্তু আজ যেন গোলমালটা বেশী বলে মনে হয়। অনেকক্ষণ ধরে গুলির আওয়াজ, অনেক বেশী লোকের উন্মত্ত চিৎকার। সীমাচলমের সঙ্গে আরও দুজন লোক ছিল। দুজনেই আহত। তারাও একটু চিন্তিত হয়ে পড়ে। কি ব্যাপার, এত গোলমাল কিসের? সীমাচলমও রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। ধরা পড়লো নাকি নিচের সবাই? পিস্তলটা ভিজে যায় ঘামে। ঘাসের ওপর হাতটা ঘসে নেয়।

সঙ্গের লোকটি কিন্তু অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। একটি পায়ে সাঙ্ঘাতিক

চোট লেগেছে। ভাল করে দাঁড়াতেও পারে না, কিন্তু কোন বাধা মানতে সে রাজী নয়। নিচে গিয়ে ব্যাপারটা একবার দেখে আসবেই। সীমাচলমকে বলতেই সে শিউরে ওঠে। মাথা খারাপ নাকি? এই অবস্থায় ওই খাড়া পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে নামতে গেলে আর জান নিয়ে নিচে পৌছুতে হবে না। লোকটি কিন্তু নাছোড়বান্দা। দলের সবাই হয়ত বিপদে পড়েছে। এই অবস্থায় কিছুতেই নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে সে পারবে না।

মুশকিলে পড়ে যায় সীমাচলম। তাকে একলা পাঠানোর মানে মরণের মুখে ঠেলে দেওয়া। অথচ অস্ত্রাগার ফেলে তার পক্ষে যাওয়াও অসম্ভব। কিন্তু অন্ধকারে ইতিমধ্যেই নামতে শুরু করে লোকটি। হাতড়াতে হাতড়াতে নেমে আসে সীমাচলম। আন্দাজে ঠাওর করে লোকটির হাত জড়িয়ে ধরে, 'পাগল নাকি তুমি? মারা যাবে যে! আমার শরীরের ওপর ভর দাও।'

লোকটি সীমাচলমের কোমর জড়িয়ে ধরে। সাবধানে পা ফেলে নামে দুজনে। ঝোপের পাশ দিয়ে রাস্তায় নেমেই দাঁড়িয়ে পড়ে সীমাচলম। গরুর গাড়ি পড়ে আছে একটা। গাড়িটা কাৎ হয়ে রয়েছে, খুলে গিয়েছে একটা চাকা। সেই গাড়ির চারপাশ ঘিরে উত্তেজিত জনতা। মশালের আলোয় দা আর সড়কির ফলাগুলো চক চক করে ওঠে।

এগিয়ে আসে সীমাচলম। সঙ্গের লোকটি পাথরে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়, তারপর চিৎকার করে ওঠে, 'ভোবামা। কি ব্যাপার? কিসের ভিড় এত? সাদা চামড়ার বুলেটে পাঁজর ঝাঁঝরা করার সাধ হয়েছে বুঝি? তাই বোকার মতন ভিড় করেছ এখানে?'

লোকগুলো ফিরে দাঁড়ায়। সবাই মিলে এক সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে। সব মিলে আবার একটা হৈ-চৈ।

'আঃ, থামো তোমরা সবাই। একজনে কথা বলো। প্যাগোডার দোহাই, কি হয়েছে সংক্ষেপে বলো একজন।' দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে থাকে লোকটি। অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হয়েছে পায়ের। ব্যাণ্ডেজ খুলে রক্ত পড়তে শুরু করেছে।

একটি লোক এগিয়ে আসে। লম্বা চেহারা। এ জাতের মধ্যে এ রকম দীর্ঘকায় চেহারা দেখা যায় না বিশেষ। বোধ হয় লোকটা আরাকানী। হাতের রিভলবার কোমরে গুঁজে সামনে এসে দাঁড়ায়।

একটু আগে ছইঢাকা গাড়িটাকে আক্রমণ করা হয়েছিল। বুড়ো সাহেবটার খুলি ফুটো করে দেওয়া হয়েছে। সঙ্গের একজন সাহেব লাফিয়ে পালিয়েছে অন্ধকারে। তাকে খুঁজতে লোক গেছে। গাড়ির মধ্যে দুটি মেয়েছেলে আর একটা বাচ্চা। টেনে তাদের বের করতেই রুখে দাঁড়িয়েছে বড় মেয়েছেলেটি। সাহেবের কোমর থেকে রিভলবার খুলে নিয়ে বলেছে, যে এগোবে তাকে নিকেশ করে দেবে। লোকরা ক্ষেপে উঠেছে। থাকিন মিয়ার হুকুম কোন মেয়েছেলে বা শিশুর গায়ে যেন হাত দেওয়া না হয়, কিন্তু কিছুতেই এদের থামিয়ে রাখা যাচ্ছে না।

আশ্চর্য্য হয় সীমাচলম। সাহস বলতে হবে মেয়েটির। এতগুলো লোকের সামনে দাঁড়িয়ে ঠিক রিভলবার ঘুরিয়ে চলেছে।

সীমাচলম আর আরাকানী লোকটি পাঁজাকোলা করে তুলে নেয় আহত লোকটিকে। বয়ে এনে গরুর গাড়ির ওপর দাঁড় করিয়ে দেয়। দু'জনে ওর দু'পাশে এসে দাঁড়ায়। চিৎকার করে লোকটি, 'থাকিন মিয়ার আদেশ, কোন শিশু বা মেয়েছেলের উপর যেন কোনরকম অত্যাচার না হয়। তারা আমাদের শত্রু নয়। তোমাদেরই জন্য আজ থাকিন মিয়া জেলে আবদ্ধ। তোমাদের চিরকালের সুখ-সুবিধা কায়েম করার জন্যই তাঁর এই আত্মনিগ্রহ। তোমরা কি তাঁর আদেশ এমনি ক'রে দু-পায়ে

মাড়িয়ে ফেলবে? লজ্জা করে না তোমাদের? সাধারণ চোর-ডাকাত-খুনীর সঙ্গে তাহলে তোমাদের প্রভেদ কোথায়?

কিছু কাজ হয়। উত্তেজনা কমে আসে। দু'একজন ফিস ফিস করে, তারপর একজনের গলা শোনা যায়, 'ওদেশের মেয়ে হ'লে কথা ছিল না। আমাদের দেশের মেয়ে আমাদেরই চোখ রাঙাবে?

'আমাদের দেশের মেয়ে?'

সীমাচলম আর আরাকানী লাফিয়ে পড়ে গাড়ি থেকে। ভিড় ঠেলে এগিয়ে যায়। কিছু এগিয়েই চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ে সীমাচলম। পাশের লোকটি ধরে না ফেললে হয়ত পড়েই যেতো।

রাস্তার পাশে বুড়ো সাহেব পড়ে আছে উপুড় হয়ে। সাদা চুলগুলো রক্তে লাল। সমস্ত জায়গাটা রক্তে আর কাদায় বিশ্রী হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেদিকে বেশীক্ষণ দৃষ্টি রাখে না সীমাচলম। শবদেহের ওপাশে একটি শিশুকে বুকে আঁকড়ে দাঁড়িয়ে আছে হামিদা। এক হাতে রিভলবার উঁচিয়ে রয়েছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপছে রাংগাম্মা। দু-এক মিনিটের স্তব্ধতা, তারপরেই চিৎকার করে ওঠে সীমাচলম, 'হামিদা! হামিদা!'

চোখ তুলে চায় হামিদা। ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে সীমাচলমের বুকে। মুখটা গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। অনেকদিনের জমানো অশ্রু উজাড় করে দেয়। তার চুলে আলতো হাত বোলায় সীমাচলম। নিবিড় করে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে। সামনের সবকিছু মুছে যায়।

অনেকক্ষণ পরে যখন খেয়াল হয় সীমাচলমের, তখন দেখে রীতিমত ভিড় জমে গেছে ওদের ঘিরে। অনেকগুলো চোখে উদগ্র কৌতূহল।

সামলে নেয় সীমাচলম। ধরা গলায় বলে, 'ভাই সব, তোমরা ভুল করেছ। এ মেয়েছেলেটি সাহেবের কেউ নয়, আমাদের শত্রুও নয়। এ

আমাদের গুপ্তচর। অনেক সংবাদ এর মারফৎ আমরা পাই। থাকিন মিয়া এর পরিচয় জানতেন। আমাকে তোমরা অবিশ্বাস করো না।'

কিছুক্ষণ আলোড়ন চলে দলের মধ্যে, তারপর সব থেমে যায়। ভিড় কমে আসে। হামিদা আর রাংগাম্মার হাত ধরে এগিয়ে যায় সীমাচলম। আহত লোকটি হেলান দিয়ে পড়ে আছে গাড়ির ওপরে। ব্যাণ্ডেজ খুলে রক্তের স্রোত বয়ে চলেছে। লোকেরা ধরাধরি করে তাকে নামিয়ে আনে। হামিদা লোকটির মাথা কোলে তুলে নেয়। পায়ের ব্যাণ্ডেজটা শক্ত হাতে বেঁধে দেয় কয়েকজন। কিন্তু নাকের তলায় হাত দিয়ে নিরাশ হয় সীমাচলম। মারা গেছে লোকটি। অতিরিক্ত রক্তস্রাবে কাহিল হয়ে পড়েছিল।

একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে থাকে সীমাচলম। বার বার মনে হয়, ওরই জন্য প্রাণ দিল লোকটি। চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসে। বিড় বিড় করে বলে, 'ভগবান, এর আত্মাকে শান্তি দাও। আমার সব কিছু নিয়ে এর পরলোকের জীবন শুভ করো দেবতা।'

পাহাড়ের ওপরে উঠে কিছুক্ষণ পরে খেয়াল হয় হামিদার। চেয়ে দেখে এদিক-ওদিক, তারপর বলে, 'টনি কই, টনি?'

'টনি, সে আবার কে?'

'আমার কোলে ছিল টনি। পাহাড়ে ওঠবার সময় কে একজন টেনে নিল আমার কাছ থেকে।' এগিয়ে আসে একটি লোক, 'ব্যস্ত হবেন না। শিশুটি নিরাপদে আছে। তাকে এখানে রাখার সুবিধা হবে না, তাই সরিয়ে রাখা হয়েছে।'

একটু চিন্তিত হয় হামিদা। পাথরে আছাড় মেরে শেষ করে দিল নাকি কচি ছেলেটাকে? না ঢালু পাহাড় থেকে গড়িয়ে দিল নিচে? ওর মুখচোখে বোধ হয় প্রকাশ পায় চিন্তার ছাপ। লোকটি হেসে বলে, 'বিশ্বাস করুন, তাকে শেষ করে ফেলা হয়নি। মেয়েছেলে আর শিশুর

গায়ে হাত দেওয়া আমাদের বারণ। লোক দিয়ে সাদা চামড়ার তাঁবুতে পাঠিয়ে দিয়েছি। আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন।' হামিদা নিশ্চিন্ত হয় কিনা বোঝা যায় না, দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে থাকে চুপচাপ। গুড়িসুড়ি মেরে ঘুমিয়ে পড়ে রাংগাম্মা। বাইরে পাহারা দেয় সীমাচলম।

ভোরের দিকে হামিদাও ঘুমিয়ে পড়ে। খোঁপা খসে চুলগুলো কাঁধে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। দরজার কাছে পায়চারী করতে করতে দাঁড়িয়ে পড়ে সীমাচলম। নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে হামিদার দিকে। ম্লান চাঁদের আলো জানলা দিয়ে আসে ঘরের ভেতরে। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় সব আবছা। সীমাচলমের মনে হয় কাছে এসেও যেন কতদূরে সরে আছে হামিদা। বুঝি ওর নাগালের বাইরে।

পরের দিন সকালে খবরটা পাওয়া যায়। রেঙ্গুন ছেড়ে চলে আসছে ইংরাজ। মিল কলকারখানা পেট্রোলের খনি সবকিছু চুরমার করে দিয়ে এই পথেই ফিরে আসছে তারা। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নানা দিকে ছুটে যায় লোক। সবাইকে তৈরী থাকতে হবে। কোন রাস্তা দিয়ে পিছু হঠে পালাতে না পারে ইংরাজ।

দলের একটি লোক এসে দাঁড়ায় সীমাচলমের কাছে, 'একটা কথা।'

'কি বলো।'

'আমার মনে হয়ে মেয়েদের এই অবস্থায় এখানে না রাখাই ভালো। আপনি বরং এদের নিয়ে সরে যান।'

'কিন্তু অস্ত্রাগারের ভার আমার ওপরে।'

'অস্ত্রশস্ত্র যা আছে আজই সব বিলি করে দিন। এই আমাদের শেষ লড়াই। এসপার নয় ওসপার। এবার যদি খতম না করতে পারি ও জাতকে, তবে মহাবাণ্ডুলা আর মিন ডন মিনের বর্মার নাম মুছে যাবে ম্যাপ থেকে।'

লোকটির দিকে চেয়ে থাকে সীমাচলম। চাষাভুষোর মতন সাজ-পোশাক করলেও আসল লোকটিকে যেন চেনা যায়। সারা বর্মায় এ রকম হাজার হাজার যুবক মরণ পণ করে রুখে দাঁড়িয়েছে। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।

'বেশ তাই হবে। বন্দোবস্ত করে দাও। আমি এদের নিয়ে সরে যাচ্ছি এখান থেকে।'

হঠাৎ চকিত হয়ে ওঠে সীমাচলম। একটা গর্জন ক্রমেই এগিয়ে আসছে। দলের সকলে ছুটে জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করে। সীমাচলমও ছুটে ঘরের ভেতরে চলে আসে।

খুব নিচু দিয়ে একঝাঁক উড়োজাহাজ উড়ে যায়। এত নিচু যে মনে হয় পাইনের ডালে বুঝি আটকে যাবে পাখাগুলো। একটু পরেই বিকট গর্জন শুরু হয়। থর থর করে কেঁপে ওঠে পাথরগুলো। গাছের ডাল থেকে পাখীগুলো চিৎকার করে আকাশে ছড়িয়ে পড়ে।

হামিদার যৌবনপুষ্ট দেহটা বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে সীমাচলম। বার বার মনে হয় অনন্তকাল চলুক এই বোমাবর্ষণ। সমস্ত পৃথিবী টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে ছড়িয়ে পড়ুক আকাশে। হামিদার মাথাটা বুকে চেপে ধরে। আস্তে আস্তে বলে, 'ভয় করছে হামিদা?'

চোখ তোলে হামিদা। মৃদুকণ্ঠে বলে, 'না, তুমি রয়েছ যে কাছে।'

সবকিছু থেমে গেলে বেরিয়ে আসে সবাই। অনেক দূরে আকাশটা লাল হয়ে ওঠে। কাছাকাছি কোথাও পড়েছে বোমা। কিন্তু এত দ্রুত এগিয়ে আসছে জাপানীরা? ইংরাজদের বুঝি একটু নিঃশ্বাস ফেলার সময়ও দেবে না।

সীমাচলম হামিদা আর রাংগাম্মাকে নিয়ে পাহাড়ের গোড়ায় নামতেই দেখা হয়ে যায় একটি লোকের সঙ্গে। কম বয়সী চীনা। বয়স বোধ হয়

বছর পঁচিশের বেশী নয়। অনেকদূর থেকে এসেছে টাট্টু ঘোড়ায় চেপে। ঘোড়ার মুখের দুপাশে পুঞ্জীভূত ফেনা। ঘোড়া থেকে নেমেই ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে ধেঁাকে লোকটি। দলের কয়েকজন জল নিয়ে এসে ছিটোয় তার মুখেচোখে। কেউ কেউ বাতাস করে পাইনের ডাল নেড়ে। কিছুক্ষণ পরে চোখ খোলে লোকটি। সীমাচলমের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হাসে। এইবার মনে পড়ে সীমাচলমের। ওচিনের সেবাকেন্দ্রে থাকিন মিয়ার সঙ্গেই কয়েকবার দেখেছে লোকটিকে।

লোকটি উঠে দাঁড়ায়। তাকে ঘিরে ঘন হয়ে দাঁড়ায় জনতা। লোকটি আস্তে আস্তে বলে, 'সুখবর আছে, সুখবর। পরশু জাপানীরা বোমা মেরে ভেঙে দিয়েছে রেঙ্গুন জেলের গেট। সমস্ত কয়েদী পালিয়েছে সেখান থেকে। থাকিন মিয়াও বেরিয়ে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তিনি বলেছেন, আপনারা পুরোদমে সংগ্রাম চালান। তিনি শীঘ্রই মিলবেন আপনাদের সঙ্গে এসে। বিশেষ করে আপনার কথা বলেছেন।' সীমাচলমের দিকে চায় লোকটি।

জনতা চিৎকার করে ওঠে। বিরাট জয়োল্লাস। সত্যিই যেন থাকিন মিয়া এসে দাঁড়িয়েছে ওদের মধ্যে। বুকের মধ্যে সাহস পায় সীমাচলম। আর ভয় নেই। এদেশের নিপীড়িত আত্মা আজ মুক্ত, কারাপ্রাচীরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। মা ভৈঃ।

আরো একটি খবর দেয় লোকটি। জাপানী বিমান নয়, এইমাত্র বোমাবর্ষণ করে গেলো ইংরাজ বিমান। পথ পরিষ্কার করতে চায় তারা।

খবরটা যে সত্যি একটু এগিয়ে গিয়েই টের পায় সীমাচলম। মোটর থেমে যায় হঠাৎ। ড্রাইভার চিৎকার করে ওঠে। স্তূপাকার মৃতদেহ, রাস্তার ওপরে, আর রাস্তার দুপাশে ছড়ানো। বেশীর ভাগই বর্মী মজুরদের দেহ। মেয়েও রয়েছে কয়েকটা।

সত্যিই পথ পরিষ্কার করতে আরম্ভ করেছে ইংরাজ। পথের যারা বাধা তাদের সরিয়ে দেবে। অপসরণের কোন অসুবিধা না হয়। সাবধানে পাশ কাটিয়ে যায় মোটর।

'এর কি শেষ নেই ?'

'কিসের ?' জিজ্ঞাসা করে সীমাচলম।

'এই হানাহানি আর কাটাকাটির ?'

'শেষ আছে বই কি, কিন্তু কবে তা বুঝতে পারছি না।'

'ইংরাজরা হটে গেলেই কি শেষ হবে এই লড়াই ?' ওরই মনের কথা টেনে বের করে হামিদা।

'কি জানি ? জাপানীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েই কাজ করার কথা।'

'বর্মার অফুরন্ত ঐশ্বর্য চোখ ধাঁধিয়ে দেবে না ওদের ? যে লোভে সাত সাগর পার থেকে বণিকেরা বাসা বেঁধেছিলো এখানে, সেই লোভে ওরাও যে সমস্ত গ্রাস করতে চাইবে না তার কি স্থিরতা আছে ?'

'কোন স্থিরতাই নেই। এদেশের চাল, পেট্রোল, কাঠ, সমস্ত দেশের বুক জুড়ে ছড়ানো ছিটানো অতুল সম্পদ উপেক্ষা করার নয়।' হঠাৎ থাকিন মিয়ার কথা মনে পড়ে যায়। তাই যদি হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধেও বুক ঠুকে দাঁড়াবে বর্মীরা। কিন্তু ওদের সুসজ্জিত বাহিনীর সামনে কতক্ষণ দাঁড়াতে পারবে এরা ? বাঁধভাঙা স্রোতের মুখে ছোট কুটোর মত কোথায় তলিয়ে যাবে ঠিক আছে ?

অনেকদূরে কোথায় প্যাগোডার ঘণ্টা বাজে। থমথমে গম্ভীর আওয়াজ। আকোর ভরাট কণ্ঠস্বর বলে মনে হয়। বাতাসে যেন তারই গলার শব্দ। এ সমস্যা শুধু বর্মীদের সমস্যা নয়। সমস্ত প্রাচ্য মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে অত্যাচারের বিরুদ্ধে। বাইরের কোন শক্তি আর ওদের পদানত করতে পারবে না।

থেমে যায় মোটর। বাঁদিকে কুমীরের পিঠের মত এবড়ো-খেবড়ো মেটে রাস্তা। মোটর যাবার উপায় নেই। তিনজনেই নেমে পড়ে। পথের নির্দেশ বলে দেয় ড্রাইভার। মাইল চারেক দূরে ছোট গাঁ। মোড়লের কাছে খোঁজ করলেই আশ্রয় মিলবে। মাঝে মাঝে লোক এসে খবর নিয়ে যাবে। যদি জরুরী কোন খবর থাকে, তবে হাটে যে মেয়েটি পদ্মফুল নিয়ে বসে, তার কাছে বললেই ঠিক পৌঁছে যাবে খবর।

প্রায় সন্ধ্যার দিকে গ্রামে পৌঁছায় তিনজনে। মোড়লের বাড়ি খুঁজে নিতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। মোড়লের বাড়ির পিছন দিকে ঘর মেলে একটা। অর্ধেকটা জুড়ে শুয়োর আর মুরগীর খোঁয়াড়। বাকীটুকুতে ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকা চলে কোনরকমে।

বিশ্রীভাবে কাটে দিনগুলো। শুধু যে খাওয়া আর থাকার কষ্ট তা নয়, নানাদিকে নানান অসুবিধা. মাঝে মাঝে দেখা হয় লোকটির সঙ্গে। সংবাদ মোটেই আশাপ্রদ নয়। কোন খোঁজ নেই থাকিন মিয়ার। তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে চলে লোকেরা। ইংরাজরা সরে আসছে। জাপানীরা প্রবলবেগে এগিয়ে আসছে উত্তর বর্মার দিকে। কিন্তু থাকিন মিয়াকে না পেলে সব গোলমাল হ'য়ে যাবে। চাষীমজুরেরা ক্ষেপে উঠেছে। সামলানো যাচ্ছে না। ইংরাজদের ওপরে শুধু নয়, ভারতীয় আর ধনী বর্মীদের ওপরেও আক্রমণ চালিয়েছে ওরা। দল বেঁধে এসে লুটপাট করছে। টাকাকড়ি জিনিসপত্তর সব নিয়ে পালাচ্ছে।

'তোমরা বোঝাচ্ছো না কেন ওদের? এভাবে একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টিতে তোমাদের কাজ তো একটুও এগোবে না। তা'ছাড়া এই গোলমালের সুযোগ নিয়ে জাপানীরাও ঠিক ইংরাজের মতনই শাসন কায়েম করতে চাইবে না? দেশ শান্ত না হ'লে কার হাতে রাজ্য তুলে দেবে, এই কথাই তো বলবে এরা।'

'তাতো বলছেই। রেডিও মারফৎ বলছে, দাঙ্গা-লুঠতরাজ-গুণ্ডামি না থামলে কিছুই করতে পারবে না ওরা। কড়া হাতে সব শাসন করতে হবে। লোকদের বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছিলো, কিন্তু তারা রুখে দাঁড়ায়, বলে, দেশ-টেশ অত কথা বুঝি না। ভাত চাই আমরা, কাপড় চাই পরবার। যতদিন এসব না পাবো, সবাই আমাদের শত্রু। যাদের এসব আছে, তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আমরা নেবোই। আরও অসুবিধা হয়েছে ওদের হাতে প্রচুর হাতিয়ার এসে পড়েছে, বেপরোয়া চুরি-ডাকাতি শুরু করেছে ওরা।'

'খাওয়া-পরার একটা বন্দোবস্ত না করে দিলে ওদের তো থামানো যাবে না?'

'কিন্তু অভাব চারদিকে। গুদামভরা চাল বর্মীরা নিজেরা পুড়িয়ে দিয়েছে। কিছু চাল জাপানীরা আটক রেখেছে নিজেদের জন্য। মাঠের ফসল নিজের হাতে জ্বালিয়েছে নিজেরা। তখন খেয়াল হয়নি যে এর পরে নিজেরা খাবে কি। আবার দু'এক জায়গায় ভারতীয়দের সঙ্গে বর্মীদের গোলমাল শুরু হয়েছে।'

'ভারতীয়দের সঙ্গে কেন?'

'এদেশ ছেড়ে কেন পালাবে ভারতীয়েরা? সুখের সময় ফসল লুঠবে, সব রকম সুখ-সুবিধা আকণ্ঠ শুষে নেবে, আর এই বিপদে সরে পড়বে এদেশ থেকে? ওরা বলছে টাকার পোঁটলা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ভারতীয়েরা, তা ওরা দেবে না। এই দুঃসময়ে সাহায্য করতেই হবে ওদের। দেশের ছেলেমেয়েরা না খেয়ে কুঁকড়ে মরবে আর ওরা দিব্বি আরামে পাশ কাটাবে, তা হবে না।'

লোকটি চলে যাবার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে থাকে সীমাচলম। হামিদাকেও বলে কথাগুলো। অভিশপ্ত দেশ। এ

দেশের মাটিতে কালো বেড়ালের হাড় পোতা আছে, কিছু হবে না এ দেশের।

'কিন্তু সত্যিই দোষ তো ভারতবাসীর। এরা এতদিন থেকেছে এখানে, অথচ এদের মাঝখানে কোনদিন এসে দাঁড়ায়নি। নিজেদের কৃষ্টি, নিজেদের সমাজ নিয়ে প্রাচীর তুলেছে নিজেদের ঘিরে। এদের এই চরম বিপদেও যদি এদের মাঝখানে এসে না দাঁড়াবে, তো কি তফাৎ ওদের সঙ্গে বিদেশীদের?' উত্তেজিত হয়ে ওঠে সীমাচলম।

সত্যিই কি কোন উপায় নেই? কিছুই কি করবার নেই? ছটফট করে সীমাচলম। এত বড় একটা বিপ্লবে ওর কি কোন কাজ নেই? চোরের মতন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় আত্মগোপন করা ছাড়া?

অসুবিধা নানাদিকে। এখানকার লোকগুলো ওদের দেখলেই জটলা করে। ফিসফাস করে কি সব বলে। খুদে খুদে চোখগুলো চক-চক করে ওঠে। বলা যায় না, একদিন হয়ত ঝাঁপিয়ে পড়বে ওদের ওপর। রাংগাম্মা আর হামিদাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। কি-ই বা করতে পারে! আত্মীয়পরিজনহীন এই গ্রামে কে এগিয়ে আসবে ওকে সাহায্য করতে?

আরো একটা ব্যাপারে রীতিমত বিচলিত হয় সীমাচলম। বেঁকে দাঁড়ায় হামিদা, 'না, এখানে একদিনও নয়। আজ রাত্রেই সরে যাবো এখান থেকে।'

'কি ব্যাপার?'

সীমাচলম বাইরে গেলেই মোড়ল এসে দাঁড়ায় ওদের কাছে। তারপর অজস্র প্রলোভন, চিরজীবন সুখী রাখার অনন্ত আশ্বাস। প্রয়োজন হ'লেই ওদের সঙ্গের 'ভারতীয়কে' পথ থেকে সরিয়ে দেবে। একবার শুধু মুখের একটা কথা। গাঁয়ের সমস্ত লোক ক্ষেপে রয়েছে। একবার একটু ইসারা পেলেই টুঁটি চেপে ধরবে সীমাচলমের। ও এদেশের মেয়ে, ভারতীয়ের সঙ্গে কেন জড়াবে নিজের জীবন?

কোন উত্তর দেয়নি হামিদা। শুধু পেট-কাপড়ে বাঁধা ডাক্তার হলের রিভলবারটার ওপর হাত বুলিয়েছে। আর এক পা এগোলেই, হামিদার এ ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না।

দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদে হামিদা। এভাবে হামিদাকে কাঁদতে কোনদিন দেখেনি সীমাচলম।

হাটের দিকে পা চালায় সীমাচলম। সেই মেয়েছেলেটিকে দিয়ে খবর দিতে হবে একবার। এখানে থাকা তার পক্ষে আর সম্ভব নয়।

ছোট হাট। পদ্মফুল নিয়ে একপাশে বসে আছে একটি বুড়ি। তার সামনে গিয়ে বসে সীমাচলম। হাত দিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখে দু'একটা ফুল। গম্ভীর হ'য়ে বলে, 'পদ্মফুল তো নয়, এ তো শাপলা।'

দন্তহীন মুখে এক গাল হাসে বুড়ি, 'শাপলারই তো যুগ। পদ্ম ব'লে অনেকেই শাপলা চালাচ্ছে।'

'থাকো কোথায় ?'

'থাকি ?' হাসি থামায় না বুড়ি, 'এই ধারে কাছে কোথাও।' তারপর এদিক-ওদিক চেয়ে ফিসফিস করে বলে, 'কাউকে বলতে হবে নাকি কিছু ?'

'হ্যাঁ, দয়া করে আমার যদি একটু উপকার করো তুমি ? খবর দিও, কেউ যেন আজকালের মধ্যেই দেখা করে আমার সঙ্গে। খুব দরকার।'

ঘাড় নাড়ে বুড়ী। বেছে বেছে লাল শাপলার গোছা তুলে দেয় সীমাচলমের হাতে।

পয়সা দিয়ে চলে আসে সীমাচলম। রাস্তার দু'পাশে জটলা করে ছোকরার দল। বিড়বিড় করে কি সব বলে ওর দিকে চেয়ে, দু'একটা কথা কানে যায়। হামিদা আর রাংগাম্মার কথা বলে, ভারতীয়দের শেষ না করলে দেশের দুঃখ ঘুচবে না, সে কথাটাও বলাবলি করে।

পাশ কাটিয়ে হন হন করে এগিয়ে যায় সীমাচলম। বাড়ীর সামনে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। একটি লোককে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে হামিদা আর রাংগাম্মা। পাশে ছোট একটি টাট্টু ঘোড়া।

'কি ব্যাপার ?'

হামিদা আর রাংগাম্মা সরে দাঁড়ায়। ঘাসের ওপরে উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটি লোক। ঘামে সমস্ত শরীর ভিজে চুপসে গিয়েছে। হাঁটু মুড়ে তার পাশে বসে পড়ে সীমাচলম। অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছে লোকটি। চোখেমুখে জলের ছিটে দিতেই উঠে বসে আস্তে আস্তে। জামার হাতা দিয়ে মুখটা মুছে নেয়, তারপর জামার ভিতর থেকে হলদে রংয়ের একটা কাগজ বের করে সীমাচলমের হাতে দেয়।

ছোট্ট চিঠি। এক লাইন আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাজার ভোল্টের বাতি চোখের সামনে ভেঙে বুঝি চুরমার হ'য়ে যায়। অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারে না সীমাচলম।

'কিগো, খারাপ খবর নাকি কিছু ?' এগিয়ে আসে হামিদা। হামিদার হাতে চিঠিটা তুলে দেয় সীমাচলম। অস্ফুটস্বরে চিঠিটা পড়ে হামিদা।—থাকিন মিয়া মৃত্যুশয্যায়। চলে আসুন।—

এতক্ষণে কথা বলে সীমাচলম। লোকটিকে জিজ্ঞাসা করে, 'কি ব্যাপার, কি হয়েছে ?'

ঘাড় নাড়ে লোকটা। কিছুই জানে না সে। তার ঘাঁটি কুড়ি মাইল দূরে। সেখানে আর একজন দিয়েছে এই চিঠি। ঠিক নির্দেশ দিতে পারেনি। তিনচারটে গাঁ খুঁজে খুঁজে সন্ধান পেয়েছে এখানে। দেরী হ'য়ে গেছে। এখনি রওনা হতে হবে।

দেরী করে না ওরা। তখনি রওনা হ'য়ে পড়ে। খবর পেয়ে মোড়ল এসে দাঁড়ায়। আড় চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে হামিদার দিকে। বলে, 'সে

কি, হঠাৎ চলে যাবেন এমন করে তা কি হয়? বিপদ-আপদ চারদিকে। এই সময়ে বাইরে পা দেওয়া কিছুতেই উচিত নয়।'

এড়িয়ে যায় সীমাচলম, 'না গিয়ে উপায় নেই লুজি। যেতেই হবে আমাদের। তবে তোমার সেবাযত্ন জীবনে ভুলবো না। অতিথিদের ওপর এমন সজাগ নজর দেখা যায় না সচরাচর।'

প্রায় সন্ধ্যার সময়ে তিনজনে নদীর ধারে এসে পৌঁছায়। মজে আসা নদী। জল খুবই কম। লগি ঠেলে ঠেলে পার হয় ডিঙি। এপারে মোটর গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে বিদায় নেয় সঙ্গের লোকটি। চালকের দিকে চেয়ে বলে, 'আমার ডিউটি শেষ হলো। তুমিই নিয়ে যাও এবার।'

সারারাত ছোটে মোটর। দুধারে পোড়া ধান ক্ষেত। এখনও ধোঁয়া উঠছে কোন কোন জায়গায়। মাঠের মাঝখানে বড় বড় গর্ত। হিমে চিক চিক করে পোড়া ঘাসগুলো।

শহরের প্রান্তে এসে থামে গাড়ি। ছোট শহর। আশেপাশে শুধু বিধ্বস্ত বাড়ির সার। সামনের রাস্তা ইঁট আর কাঠের টুকরোতে বোঝাই। রাস্তাঘাটে লোকজন দেখা যায় না। ওরা নেমে পড়ে মোটর থেকে। সাবধানে পা ফেলে রাস্তার ধার দিয়ে এগিয়ে চলে।

কিছুদূর এগোতেই প্রকাণ্ড একটা কাঠের বাংলো। দেখে মনে হয় কোন বিহার। সামনের বারান্দা ঝুঁকে পড়েছে ফটকের ওপরে। জানলাগুলো ফেটে চৌচির। মাথা নিচু করে ভিতরে ঢোকে ওরা। একটু গিয়েই খোলা জায়গা। গোটাকয়েক লোক বসে আছে উবু হয়ে। থমথমে স্তব্ধতা। ওরা কাছে যেতেই উঠে পড়ে লোকগুলো। একজন বলে, 'যান, সোজা ভেতরে চলে যান।'

প্রকাণ্ড হল ঘর। দেয়ালে কাঠের ওপর বুদ্ধের বিভিন্ন বয়সের

প্রতিকৃতি খোদাই করা। মাঝখানে নিচু খাটে শুয়ে আছে থাকিন মিয়া। সারা শরীর গেরুয়া চাদরে আবৃত। নিমীলিত দুটি চোখ। পায়ের কাছে মাথা রেখে বসে আছে একটি মেয়ে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মেয়েটি। ওরা পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই পায়ের আওয়াজে মুখ তোলে। চোখাচোখি হয় সীমাচলমের সঙ্গে। প্যাগোডার ধাপে ফুলের বেসাতি নিয়ে বসা সেই মেয়েটি। চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে। সারারাত বোধ হয় কেঁদেছে মেয়েটি। মোমবাতির আলোয় গালের ওপর চিক্ চিক্ করে জ্বলে ওঠে জলের ধারা।

'ওগো, ওঁরা এসেছেন। চোখ খোলো।' কান্নাভরা আওয়াজে মেয়েটি ডাকে থাকিন মিয়াকে।

আস্তে আস্তে চোখ খোলে থাকিন মিয়া। পাণ্ডুর মুখ, নিস্তেজ। মাথাটা ঘুরিয়ে এদিকে-ওদিকে খোঁজে, তারপর সীমাচলমের দিকে চোখ পড়তেই ম্লান হাসে। ইঙ্গিতে তাকে বিছানার পাশে বসতে বলে। তার একটা হাত নিজের শীর্ণ হাতে তুলে নেয়। অস্পষ্ট আর জড়ানো কণ্ঠস্বরে বলে, 'আমি পারলুম না ভাই। কাজ অসমাপ্ত রেখে যেতে হচ্ছে আমায়। ওদেরই গুলিতে প্রাণ দিলুম। আফসোস নেই আমার, কিন্তু আমার সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো।'

চুপ করে দম নেয় থাকিন মিয়া। খানিকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বলে, 'গুণ্ডামি, রাহাজানি, ডাকাতি এইসব শুরু করেছে এরা। স্বাধীনতার লক্ষ্য দূরে সরে যাচ্ছে। দেশ আমাদের হবে, এর শাসনের ভার আসবে আমাদের হাতে, এ চিন্তা লোকে ক্রমেই ভুলে যাচ্ছে। হাতিয়ার হাতে এসেছে প্রচুর, সেই হাতিয়ার এরা নিজেদের গুণ্ডামির কাজে লাগাচ্ছে। চাল আর চিনি মজুদ রেখে চড়া দামে বিক্রি করছে। সাদা চামড়ার কাছে ঘুষ খেয়ে নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ। মোমবাতিটা ধীরে গলে যায়। ভোর হয়ে আসে। জানলা দিয়ে এক ঝলক রোদ বিছানার ওপরে এসে পড়ে।

চোখ দুটো অনেক কষ্টে খোলে থাকিন মিয়া। প্রথমে কাঁপে ঠোঁট দুটো, তারপর গলার মৃদু স্বর শোনা যায়, 'একটি লোক শুধু পারে সমস্ত কিছু ঘুরিয়ে দিতে। পথভ্রান্ত জনতাকে ঠিক পথে চালাতে। তাঁকে খবর দিতে হবে। কথা দাও এটুকু করবে তুমি?'

ঝুঁকে পড়ে থাকিন মিয়ার একটা হাত নিজের হাতে তুলে নেয় সীমাচলম। ওর চোখ থেকে জলের ফোঁটা টপ টপ করে পড়ে থাকিন মিয়ার হাতে।

'গেরুয়া আমার বাইরের পোশাক নয় সীমাচলম, আমি সত্যই সন্ন্যাসী। তুমি তো জানো এদেশের লোকেদের কবর দেওয়া হয়, কিন্তু শুধু আমাদের পোড়ানো হয়। আমার ছাই নিয়ে তুমি বাবার সঙ্গে দেখা কোরো। বোলো ফাঁকি দিইনি। তাঁর প্রত্যেকটি উপদেশ প্রাণ দিয়ে পালন করেছি, কিন্তু ব্রত আমার অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। আমি পারলুম না। তাঁকে বোলো, বিশৃঙ্খল জনতার মধ্যে তিনি এসে না দাঁড়ালে আর কেউ রক্ষা করতে পারবে না এ দেশকে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ। একদৃষ্টে থাকিন মিয়ার মুখের দিকে চেয়ে থাকে সীমাচলম। ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে থেমে যায়। হাতটাও পড়ে যায় এক পাশে। চিৎকার করে কেঁদে ওঠে মেয়েটি। বাইরে থেকে লোক-গুলো ভিতরে চলে আসে। সীমাচলম হাঁটু মুড়ে বসে থাকিন মিয়ার পায়ের কাছে। দেখাদেখি হামিদা আর রাংগাম্মাও বসে ওর পাশে। মাথা ঠুকে ঠুকে প্রণাম করে তিনজনে। মাথা তুলে দেখে নিভে গেছে মোমবাতি। থাকিন মিয়ার মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখে ম্লান হাসির রেখা। মেয়েটিকে দেখা যায় না ধারে-কাছে কোথাও।

ছোট সাদা মোটরবোটে তিনজনে গিয়ে ওঠে। প্রথমে রাংগাম্মা, তারপর হামিদা, সব শেষে সীমাচলম কাঠের কারুকার্যখচিত ছোট একটি বাক্স বুকে চেপে। জল কেটে কেটে মাঝ নদীতে গিয়ে পড়ে মোটরবোট।

কোনদিন কি ভাবতে পেরেছিলো সীমাচলম যে ছেলের ভস্মরাশি নিয়ে উপহার দিতে হবে তার বাবাকে? আকোর সামনাসামনি এতদিন পরে এই নিয়ে বুঝি সে দাঁড়াবে গিয়ে? বলবে এই আমার গুরুদক্ষিণা।

পিছনদিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। অন্ধকারে মিলিয়ে আসে তটরেখা। চারদিকে শুধু ইরাবতীর অথৈ জল। হাতে একটা স্পর্শ লাগতেই চমকে ওঠে সীমাচলম, 'কে?'

'আমি।' হামিদাবানু এসে বসে পাশে।

'ভাবছি কোন্ কূল ছেড়ে কোথায় চলেছি হামিদা? আরও ভাবছি জাপানীদের এলাকায় তোমরা আমার সঙ্গে না এলেই পারতে। কোথায় কখন কিভাবে বিপদ আসবে তার ঠিক কি?'

'ভয় পেয়ো না। কোন বিপদ তোমার আসতে পারে না। শহীদের আত্মা তোমাকে ঘিরে চলেছে। তুমি চলেছো দেশের পুণ্যব্রতে। আর আমার স্থান কি তোমার পাশে নয় সীমাচলম?'

'তা জানি হামিদা। তুমি আমার সব।' হামিদার হাতটা চেপে ধরে সীমাচলম। মোটরবোটের একটানা গর্জন। জলের আছড়ানি। নক্ষত্রের ছায়াগুলো কেঁপে কেঁপে ওঠে ইরাবতীর জলে।

হঠাৎ তন্দ্রা ভেঙে যায় সীমাচলমের। উঁকি মেরে দেখে লাল হয়ে উঠেছে দূরের আকাশ। ভোর হয়ে আসছে। ঘুমাচ্ছে হামিদা আর রাংগাম্মা। আস্তে পাশ কাটিয়ে উঠে আসে সীমাচলম।

'ভোর হয়ে আসছে, না ভাই?' চালককে জিজ্ঞাসা করে।

'না, আগুন জ্বলছে সিরিয়ামের তেলের ট্যাঙ্কে। আজ সাতদিন ধরে ওমনিই জ্বলছে একটানা।'

ভোরের আলো নয়? ভালো করে দেখে সীমাচলম। তাই তো! মাঝে মাঝে দেখা যায় আগুনের লেলিহান শিখা। নীল বিদ্যুতের তাণ্ডব নর্তন। পুড়ে যাচ্ছে সবকিছু। লাল হয়ে উঠেছে ইরাবতীর জল। বিস্তৃত মোহনায় ধীরে ধীরে ঢোকে মোটরবোট।

পিছন ফিরে দেখে হামিদা আর রাংগাম্মার ঘুমন্ত মুখে আগুনের লাল ছায়া। ঘুমন্ত মানুষেরও নিস্তার নেই বুঝি!

সাবধানে কাঠের বাক্সটা খোলে। খুব সাবধানে, নয়ত এখনই পাগলা হাওয়ায় চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে থাকিন মিয়ার ছাই—এদেশের মাঠে আর জলে। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে যায় সীমাচলম। আগুনের প্রদীপ্ত আলোয় ছাই বলে যেন আর মনেই হয় না। কেবলই মনে হয় যে, সোনার গুঁড়ো জমানো রয়েছে বাক্সটার তলায়। অনেক যুগের নিভৃতে সঞ্চিত করা সোনার ছোট ছোট গুঁড়ো।

—শেষ—